চরিত-সুধা

ষষ্ঠ খণ্ড

পঞ্চম সংস্করণ

শ্রীরামদাস বাবাজী

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

চরিত-সুধা

অর্থাৎ

শ্রীল শ্রীমদ্ রাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহাশয়ের

জীবনচরিত

ষষ্ঠ খণ্ড

পঞ্চম সংস্করণ

চৈতন্যাব্দ—৫০২, সন ১৩৯৪ সাল।

প্রকাশক

শ্রীরামদাস বাবাজী

শ্রীধাম নবদ্বীপ

"শ্রীশ্রীরাধারমণ বাগ"

প্রকাশন ঃ

শ্রীশ্রীগুরু পূর্ণিমা

প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। শ্রীশ্রীরাধারমণ বাগ, সমাজবাড়ী,
শ্রীধাম নবদ্বীপ।

২। শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম, বরাহনগর
কলিকাতা-৩৫

মূল্য ৪০-০০

মুদ্রক ঃ

শ্রী তরুণ কুমার মণ্ডল কর্তৃক মোনালিসা প্রিন্টার্স,
৮৩/৬, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-৩৭ হইতে মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

জয় নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জয় হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েৎ শ্রুতিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্॥
দুর্গমে পথি মেঽন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ।
স্বকৃপাযষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্॥

নিবেদন

পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গদেবের কৃপায় এবং মহানুভব মহাত্মগণের সবিশেষ অনুকম্পায় আজ আমরা পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের পরমপবিত্র **চরিত-সুধার** ষষ্ঠ খণ্ড সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি শ্রীগুরুদেব নানাদিগ্‌দেশ পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক যত যত লীলাখেলা আচরণ করিয়াছেন বা উপদেশামৃত বর্ষণে তাপদগ্ধ কলিহত জীবগণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, তাহা সংগ্রহ করা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। ৺ ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় আশাতীত ভাবে স্বপ্রকাশ লীলা যতটুকু সংগৃহীত হইয়াছিলেন, তাহাও বিস্তারিতরূপে প্রকাশ করিতে গেলে এই গ্রন্থ অতিশয় বৃহৎ আকার ধারণ করেন দেখিয়া বহু বহু সহৃদয় ভক্তগণের জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে অনেক ঘটনা বাদ দিয়া এযাত্রায় **এই ষষ্ঠ খণ্ডেই শ্রীচরিত-সুধা** সমাপ্ত করিতে বাধ্য হইলাম। যদি কখনও

মঙ্গলময় প্রভুর কৃপায় সুযোগ ঘটে, তবে অবশিষ্ট ঘটনাবলী প্রকাশ করিবার আশা রহিল। অবশেষে সহৃদয় ভক্তবৃন্দের নিকটে আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে, যদি কাহারও নিকট শ্রীশ্রীগুরুদেবের আচরিত, প্রচারিত, সংগৃহীত বা উপদিষ্ট কোনও ঘটনা সংগৃহীত থাকে বা সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন, তবে তিনি দয়া করিয়া আমাদের নিকটে পাঠাইয়া দিলে তাহা বিশেষ কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণপূর্ব্বক বারান্তরে গ্রন্থের মধ্যে বা পরিশিষ্টরূপে প্রকাশ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।

সময়াভাব ও ব্যস্ততাবশতঃ বর্ত্তমান সংস্করণেও বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন সম্ভবপর হইল না। অলমিতি—

বিনীত—

প্রকাশক

সূচীপত্র

—: পরিশিষ্ট :—

——:০:——

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

বন্দনা

বন্দে তং পরমাশ্চর্য্যচরিতং করুণার্ণবম্।
যস্য প্রসাদান্মূঢ়োঽপি ভক্তিবর্ত্মনি গচ্ছতি॥

জয় বিশ্বম্ভর করুণাসাগর
রঙ্গিয়া নিতাই মোর।
সহ পরিজন বন্দি অনুক্ষণ
প্রাণযুগলকিশোর॥
জয় জগন্নাথ বলভদ্র সাথ
যত দেবদেবীগণ।
দুই কর জুড়ি ভূমিতলে পড়ি
বন্দি সবার চরণ॥
সহ ভক্তগণ শ্রীরাধারমণ
অশেষ মঙ্গলদাতা।
আচরিয়া নিজে শিখাইলেন জীবে
সাধ্য সাধনের কথা॥
ধামের মাহাত্ম্য মূর্ত্তির নিত্যত্ব
শ্রীগুরু-ভকতি সার।
সেবা অঙ্গীকার পাতকী উদ্ধার
ভকত-বাৎসল্য আর॥

যত যত লীলা তুঁহু আচরিলা
দেশ দেশান্তর ঘুরি।
তার এক কণ করিয়া স্মরণ
এই নিবেদন করি॥
অকিঞ্চন জনে রেখ শ্রীচরণে
শ্রীগুরু করুণাময়।
যেন আমা হ'তে তুয়া শুদ্ধ পথে
কলঙ্ক নাহিক রয়॥
তব লীলাকথা, তব গুণগাথা
থাকে যেন স্মৃতি-পথে।
মনের ভিতর যেন নাহি পারে
আন চিন্তা প্রবেশিতে॥

——:o:——

চরিত-সুধা

—*—

ষষ্ঠ খণ্ড

ধাম-মাহাত্ম্য

আজ পুরীতে আবার নূতন আনন্দ। ঝাঁজপীটা মঠে সর্ব্বদাই ভক্তসমাগম হইতেছে। সকলের সঙ্গেই বাবাজী মহাশয় বৃন্দাবনের লীলাকথা, ভক্তসমাগম, বনমালী বাবুর সেবাপরিপাটি, শ্রীরামহরিদাস বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, মাধবদাস বাবাজী মহাশয়ের প্রীতি, হরিচরণ দাস বাবাজী মহাশয়ের শাস্ত্রচর্চ্চা, শ্যামদাস বাবাজী মহাশয়ের উদারতা প্রভৃতি প্রসঙ্গ লইয়া সর্ব্বদা আনন্দ করিতেছেন। কখনও বা ভক্তগণ-সমভিব্যাহারে শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনে গিয়া জগমোহনে খুব নৃত্যকীর্ত্তন করিতেছেন, কখনও বা গম্ভীরা, সিদ্ধবকুল, গঙ্গামাতা মঠ হইয়া সমুদ্রস্নান, টোটা গোপীনাথ ও হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দর্শনাদি করতঃ পরমানন্দে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। পুরীবাসী আপামর সাধারণ এতই আনন্দ অনুভব করিতেছেন যে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব।

একদিন বাবাজী মহাশয় ভক্তবৃন্দসঙ্গে নানারূপ ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতেছেন, এমন সময় জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ্ঞে! শুনা যায় যে শ্রীজগন্নাথধামে কেহই উপবাসী থাকে না। এটি কি সত্য কথা ?"

বাবাজী। কেন বাবা! যখন শাস্ত্রবাক্য আছে, তখন সত্য না হইবার কারণ কি ? নিশ্চয়ই সত্য।

ভক্ত। আজ্ঞে! আমি সে ভাবে বলি নাই; আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, শাস্ত্রবাক্য আমরা যেরূপভাবে বিশ্বাস করি, এটিও কি সেইরূপ ভাবেরই কথা, না কেহ কখন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ?

বাবাজী। কথাটা প্রত্যক্ষই বটে, তবে আমাদের পক্ষে প্রায় অনুমানসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। লোকপরম্পরায় শুনা বই নিজে কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই এইটি সত্য কথা।

ইত্যাদি নানা কথাবার্ত্তায় অনেকক্ষণ কাটিয়া গেলে ভক্তগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। জানি না ইঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইল—আস্তেব্যস্তে উঠিয়া স্নানাহ্নিকাদি শেষ করতঃ শ্রীজগন্নাথদর্শনে গমন করিবেন, এই সময় সঙ্গিগণ অন্ততঃ একটু মিশ্রির সরবৎ প্রসাদ পাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ইনি কিছুতেই স্বীকৃত না হইয়া একাকী মন্দিরে গমন করিলেন। শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া সে স্থান হইতে একাকী শ্রীলোকনাথ মহাদেবের মন্দিরের দিকে গমন করিলেন। ক্রমে যাইতে যাইতে মনুষ্যের গতাগতিরহিত ঘোর বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটী পুন্নাগ বৃক্ষের মূলে শয়ন করিয়া রহিলেন। মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে—"শ্রীজগন্নাথধামে কেহই উপবাসী থাকে না" এই জনশ্রুতি সত্য কি মিথ্যা—আজ আমি পরীক্ষা করিব। দেখা যাউক, এই বনের মধ্যে আমাকে কে খোঁজ করিয়া মহাপ্রসাদ দেয়!

এদিকে আশ্রমবাসিগণ শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির প্রভৃতি সম্ভাবিত স্থানে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও ইঁহার কোনরূপ তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া বিমনাভাবে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক বেলা প্রায় দুইটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া অনেকেই মহাপ্রসাদ পাইলেন। অপরাহ্ণ অনুমান পাঁচটার সময় একজন জগন্নাথের পাণ্ডা একখানি রজের থালা হাতে করিয়া যে বনের মধ্যে বাবাজী মহাশয় শয়ন করিয়াছিলেন, সেই বনের চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে করিতে ইঁহার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্য লোকের পদশব্দ শুনিবামাত্র ইনি উঠিয়া বসিলেন। তখন সেই পাণ্ডাটি বলিলেন—"বাবা! আমি বহুক্ষণ হইতে আপনাকে খুঁজিতেছিলাম। আপনি এরূপ ঘোর বনের মধ্যে আসিয়া রহিয়াছেন কেন? এতক্ষণ পর্য্যন্ত অনাহারে থাকারই বা প্রয়োজন কি?"

বাবাজী। আমি অনাহারে আছি আপনাকে কে বলিল?

পাণ্ডা। আমি জগন্নাথের মধ্যাহ্নধূপ শেষ করিয়া বাড়ী যাইব এই সময় একটি সধবা স্ত্রীলোক এই থালাখানি আমার হাতে দিয়া বলিল—"দেখ বাবা! লোকনাথের মন্দির ছাড়াইয়া কিছু দূরে একটী বনের মধ্যে একটী পুন্নাগ বৃক্ষের তলায় বড় বাবাজী শয়ন করিয়া আছে, এই মহাপ্রসাদের থালাখানি তাহাকে দিয়া বলিবে যে,—"এই জগন্নাথ-ধামে কেহ কখনও উপবাসী থাকে না। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অতিরিক্ত হট করা উচিত নয়।" এই বলিয়া যাইবার সময় আমার হাতে একটী সিকি দিয়া বলিল—"এই চারি আনা তোমার পারিশ্রমিক স্বরূপ দিলাম। যত সত্বর হয় এই কার্য্যটী তোমাকে সম্পন্ন করিতেই হইবে।" আমি তখন হইতে আপনাকে খুঁজিয়া পাই নাই। আপনি এই মহাপ্রসাদ গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত আমি কিছুতেই যাইব না।

বাবাজী মহাশয় প্রেম-পুলকিত-দেহে পাণ্ডা ঠাকুরকে প্রণাম করতঃ সাদরে মহাপ্রসাদের থালাখানি গ্রহণপূর্ব্বক সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"বাবা! এমন কৃপাদত্ত বস্তু কি কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে? অসময় হইয়াছে, আপনার আর অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই, আপনি বাড়ীতে গমন করুন, আমি মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতেছি।" এইরূপ বাক্যে পাণ্ডাকে বিদায় দিয়া ঠিক বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"আহা মরি! এমন করুণা না হইলে কলির জীব তাঁহাকে ভজিবে কেন? ভজিলাম না তবুও দয়াময়ের এত দয়া, না জানি ভজিলে কি হইত!" ইত্যাদি নানারূপ দৈন্যোক্তি প্রকাশ করতঃ মহাপ্রসাদের থালাখানি হাতে করিয়া একেবারে ঝাঁজপীটা মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আশ্রমবাসিগণ যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইল। ললিতাদাসী ইঁহার হাত হইতে মহাপ্রসাদের থালাখানি লইয়া বিস্মিতভাবে বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে ইনি আমূল বৃত্তান্ত বলিয়া অবশেষে বলিলেন, "শ্রীরাধাকান্তদেবের মহাপ্রসাদের নিকট আমার অপরাধ হইয়াছে, আগে সেই মহাপ্রসাদ কিঞ্চিৎ আমাকে দাও, পরে এ মহাপ্রসাদ পাইব।" তখন ললিতা দাসী শশব্যস্তে যাবতীয় মহাপ্রসাদ আনিয়া উপস্থিত করিলে ইনি ভক্তবৃন্দের নিকট নাম, মহাপ্রসাদ এবং ধামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে করিতে মহাপ্রসাদ সেবা করিতে লাগিলেন।

অপরা দাদার বিবরণ

এই ঘটনাটি সম্বন্ধে অপরা দাদা নিজে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই এইখানে উদ্ধৃত করা হইল। তিনি লিখিয়াছেন:—

আমার নাম অপরাপ্রসাদ পাল। ইংরেজি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে আমি হুগলী কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। আমার পিতাঠাকুর মহাশয় হুগলী কোর্টে মোক্তারী করিতেন। বহুদিন পূর্ব্বেই তিনি নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। আমার আত্মীয়-স্বজনের বিশেষ ইচ্ছা যেন আমি বি, এল, পাশ করিয়া হুগলীতেই ওকালতী করি। আমারও সেই মত হইল; সুতরাং হুগলী কলেজেই আইন পড়িতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু আমার মন সর্ব্বদাই সদ্‌গুরু লাভের জন্য বড় চঞ্চল হইতে লাগিল। আমাদের কুলগুরুর প্রতি আমার তত আস্থা ছিল না। আমার পিতা-ঠাকুর মহাশয় প্রায় সর্ব্বদাই বলিতেন, "শিবই জগদ্‌গুরু, মন্ত্রাদিপ্রাপ্তির জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠা জন্মিলে আশুতোষ স্বপ্নে পর্য্যন্ত মন্ত্র প্রদান করতঃ শিক্ষার জন্য উপযুক্ত লোক প্রেরণ করেন।"

বহুদিন পরে পিতাঠাকুর মহাশয়ের কথা মনে পড়িল। গুরুরূপে মহাদেবের কৃপা পাইবার কামনায় আমি শিবরাত্রির উপবাস করিতে লাগিলাম এবং রাস্তা ঘাটে যেখানে সেখানে সর্ব্বদাই শিবদুর্গা নাম জপ করিতে লাগিলাম। বর্ত্তমানে হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত যদুলাল কাঞ্জিলাল ডি, এল সেই সময় হুগলীতে আইন পড়েন। আমাদের দুইজনে বড়ই প্রীতি ছিল; একদিন ব্যাকুলচিত্তে তাঁহাকে সদ্‌গুরুলাভের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—"দেখ ভাই, ব্যাকুলতাই বস্তু-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়।" যদুবাবুর কথাটি আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। আমি সমস্ত কার্য্য করি বটে; কিন্তু মন্ত্রপ্রাপ্তির জন্য আমার মানসিক ব্যাকুলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এইরূপ তিন বৎসর গত হইল। শিবরাত্রির পর বাবা আশুতোষের কৃপা হইল। স্বপ্নে আমাকে মন্ত্রপ্রদানপূর্ব্বক শিক্ষকতা কার্য্য করিতে

আদেশ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন, "তোমার এই মন্ত্র যিনি অযাচিতভাবে বলিতে পারিবেন তিনিই তোমার গুরু, তাঁহার আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিবে।" আর বি, এল, পরীক্ষা দেওয়া হইল না। হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগর এণ্ট্রান্স স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে কার্য্য করিতে লাগিলাম। সে স্থানে বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত পাঁচ বৎসর শিক্ষকতা করিলাম, যশঃপ্রতিপত্তি লাভও হইল; কিন্তু সাক্ষাৎ গুরুলাভের জন্য আমার মন বড়ই উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিল।

আর পাড়াগাঁ ভাল লাগিল না। কলিকাতা খেলাৎচন্দ্র ইন্‌ষ্টিট্যুএ-সনের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত দেখা করিয়া আমার মনের ভাব প্রকাশ করিবামাত্র তিনি তাঁহার সহকারী শিক্ষকরূপে আমাকে নিযুক্ত করিয়া লইলেন। আমি স্কুলে কার্য্য করিতে লাগিলাম বটে, কিন্তু এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সদ্‌গুরু লাভ না হওয়ার দরুণ আমার মন বড়ই চঞ্চল হইয়া পড়িল। আমি অবকাশমতে শ্রীধাম কাশীতে গমন করিলাম এবং নিজ স্বার্থসিদ্ধির কামনায় অনেক সাধু মহাপুরুষের সঙ্গ করিতে লাগিলাম; কিন্তু কেহই আমার মনপ্রাণ আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। কেবল মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামীজী আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তুমি দেশে যাও, সেইস্থানেই তোমার সদ্‌গুরু মিলিবে।" মহাত্মার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমি কলিকাতায় আসিলাম। আমি একটু অবসর পাইলেই ইংরাজী "Imitation of Christ" নামক বইখানি পড়ি। বইখানি পাঠ করিয়া আমার মনে ধারণা হইয়াছিল যে, প্রেমই ভগবানের স্বরূপ এবং একমাত্র প্রয়োজনীয় পদার্থ।

একদিন বইখানি পড়িতে পড়িতে মনে হইল, আচ্ছা হিন্দুদের শাস্ত্র মধ্যে কি এমন কোন গ্রন্থ নাই, যাহা পাঠ করিয়া এই প্রেম লাভ করিতে পারি এবং যাবতীয় দেবদেবীতে আমার ভক্তিবিশ্বাস স্থায়িরূপে থাকে?

সেইদিন হইতে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। 'সাধু ইচ্ছা যাহার ঈশ্বর সহায় তাহার।' একদিন আমাদের স্কুলের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনীমোহন মিত্র মহাশয় আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার জনৈক বন্ধুর বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ শুনিতে যান। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যখণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদ পাঠ হইতেছিল। পাঠকটীর নাম শ্রীযুক্ত রামদাস পণ্ডিত—শ্রীধাম নবদ্বীপবাসী। পাঠ শুনিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। বহুদিনের পর আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রাপ্ত হইয়া আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। সেইদিন হইতে আমি প্রতিদিন সন্ধ্যার পর নিয়মমত পাঠ শুনিতে লাগিলাম।

একদিন পাঠের শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়া দেখি যে, একটী যুবক বৈষ্ণব কীর্ত্তন করিতেছেন। ঐ বৈষ্ণবটীর নামও রামদাস। কীর্ত্তন শ্রবণে আমি একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলাম। অনেক কীর্ত্তন শুনিয়াছি, কিন্তু এমন মনপ্রাণমাতান কীর্ত্তন আর কখনও শুনি নাই। কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতেই মনে হইল যে, ইঁহারই যখন এতাদৃশী মনোমুগ্ধকারিণী শক্তি, না জানি ইঁহার গুরুদেব কত বড় মহাত্মা। একবার কিরূপে তাঁহার দর্শন পাইব, এই উৎকণ্ঠায় দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলাম।

এই ঘটনার দশ পনের দিন পরে শুনিলাম, রামদাস বাবাজীর গুরু-দেব (পুরীধামের বড় বাবাজী মহাশয়) দর্জ্জিপাড়ায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে আগমন করিয়াছেন। আমি এবং আমার সোদর-প্রতিম কিশোরীলাল হালদার বি, এ, উভয়ে মহাত্মার দর্শনে গমন করিলাম। যাইয়া যাহা দেখিলাম তাহা অতি অনির্ব্বচনীয়—মহাত্মা চারিদিকে ভক্তমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত হইয়া যেন তারকাবেষ্টিত পূর্ণ শশধরের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। সুমধুর বাক্যামৃত বর্ষণে আপামর

সাধারণের হৃদয় পরিপ্লুত করিতেছেন। ইঁহার হাসিমাখা শ্রীমুখের অমৃত-মধুর দুইটী কথা শ্রবণমাত্র আমার তৃষিত মনপ্রাণ শীতল হইয়া গেল। দর্শনমাত্রই আমি চিরজীবনের মত ইঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিলাম। ইঁহার যাবতীয় ব্যবহারগুলিই আমার চিত্তাকর্ষক হইতে লাগিল। অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য দর্শনে নয়ন মুগ্ধ হইয়া গেল। ধীরে ধীরে একটু নিকটে অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিবামাত্র ইনি মৃদু-মধুর হাসিমাখা মুখে সুধাবিনিন্দিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কি বহুবাজারে মাষ্টারী করেন? আপনাদের কি রামদাস পণ্ডিতের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠ ভাল লাগিয়াছে?" আমি বলিলাম—"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁহার পাঠ অতি মধুর; আবার আপনার রামদাসের কীর্ত্তন মধুর হইতেও মধুর।" ইনি "আপনারা পরম ভাগ্যবান্" এই কথাটি বলিয়া আবার পূর্ব্ববৎ ভক্তগণসঙ্গে ভগবৎ-প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। আমরা রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত থাকিয়া সেদিনকার মত বাসায় ফিরিতে বাধ্য হইলাম; কিন্তু মনপ্রাণ যেন সেইস্থানেই রহিল।

পরদিন স্কুলের ছুটি হইবামাত্রই আমি দর্জ্জিপাড়ায় আসিলাম। অপূর্ব্ব কৃপা! আজ আর 'আপনি, মহাশয়' প্রভৃতি ব্যবচ্ছেদক বাক্য নাই। আমাকে দেখিবামাত্রই আগ্রহসহকারে বলিয়া উঠিলেন—"এস ভাই এস! আমি এতক্ষণ তোমার কথাই ভাবিতেছিলাম। আচ্ছা মাষ্টার! তুমি কাল পাঁচ ছয় ঘণ্টা সময় বসিয়া রহিলে, আবার আজ স্কুলের ছুটি হইতে না হইতেই আসিয়াছ কেন বল দেখি? সাধু দেখিতে আসিয়াছ?"

আমি। আজ্ঞে! সাধু বলিয়া আমি আপনাকে দেখিতে আসি নাই।

বাবাজী। তবে কি ভাবে আসিয়াছ?

আমি। আজ্ঞে! আমার মাতাঠাকুরাণীর মুখে শুনিয়াছিলাম যে, আমার জন্মের পূর্ব্বে আমার দুইটি ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিয়া শৈশবেই ইহ-লীলা সম্বরণ করেন। আমার মনের ধারণা যে, তাহারই একজন আপনি।

এই কথা শুনিবামাত্র অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারে ইঁহার শ্রীঅঙ্গ ভূষিত হইল। স্নেহভরে আমাকে আলিঙ্গন প্রদানে কৃতার্থ করতঃ আমার কর্ণে সেই স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রটি বলিয়া দিয়া চিরদিনের মত আমাকে অঙ্গীকার করিলেন। অবশেষে গদগদকণ্ঠে বলিলেন—"দেখ, তোমাকে প্রভুর অন্তরঙ্গ করিবেন বলিয়াই যোগিবর মন্ত্রের মধ্যে "ভগবতে" শব্দটি দেন নাই। আমি উহা প্রাপ্তির উপায় সবিশেষ বলিয়া দিব, কোনই চিন্তা নাই। তুমি আমার ছোট ভাই এইটি সুসত্য কথা। সর্ব্বদার তরে এই ধারণা দৃঢ় রাখিবে।"

আমি মহাপুরুষের শীতল বক্ষ স্পর্শ পাইয়া যেন কেমন একপ্রকার হইয়া গেলাম। সর্ব্বাঙ্গে পুলক প্রকাশ পাইতে লাগিল, মনপ্রাণ যেন অননুভূতপূর্ব্ব অপ্রাকৃত আনন্দরসে নিমগ্ন হইয়া গেল। চিরজীবনের মত ইঁহার শ্রীচরণে বিক্রীত হইয়া রহিলাম। আর আমি অন্য কোন কার্য্যই করিতে পারিলাম না। সর্ব্বদার তরে বাবাজী মহাশয়ের মধুময়-সঙ্গে রহিলাম।

একদিন কাঁঠাল বাগানের হরিদাস দাদার বাড়ীতে সদলে বাবাজী মহাশয় গমন করিয়াছেন। নানারূপ ভাবের কীর্ত্তনানন্দ হইতেছে, আমিও সঙ্গে আছি। হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মাষ্টার! মালা পরিতে সাধ হয়?"

আমি। আজ্ঞে! মালা পরিলে কি হয়?

বাবাজী। মালা পরিলে কি হয় আমি একথার আর কি বলিব? তবে সামান্য কথা ধর, মালা পরিলে ত্রিতাপ জ্বালা দূর হইয়া যায়।

আমি। আজ্ঞে! ত্রিতাপ জ্বালার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া বড়ই দুরূহ। উহা যদি কেবল মালা পরিলেই দূর হইয়া যায়, তবে আপনি একটী মালার বড় কাছি করিয়া আমার গলায় পরাইয়া দিন।

তখন ইনি ঠিক বালকেরন্যায় মৃদু হাসিয়া নিজের গলার এক কণ্ঠি, হরিদাদার গলার এক কণ্ঠি এবং উপস্থিত বৈষ্ণবমণ্ডলীর গলা হইতে আর তিন কণ্ঠি, মোট পাঁচ কণ্ঠি মালা লইয়া আমার গলায় পরাইয়া দিলেন। "মালা পরিলেই ত্রিতাপ জ্বালা দূর হইবে" এই কথাটি গুরুদেব যে ভাবে উচ্চারণ করিলেন, তাহাতে আমার দৃঢ় ধারণা হইল যে, মালা পরিলেই ত্রিতাপজ্বালা দূর হইয়া যাইবে। কোন সাধন ভজন নিষ্প্রয়োজন। গলায় মালা পরা হইয়া গেলে একজনকে বলিলেন, "মাষ্টারকে তিলক করিয়া দাও ত!" শুনিবামাত্র এক মূর্ত্তি বালক বৈষ্ণব আসিয়া গোপীচন্দন দ্বারা আমাকে তিলক পরাইয়া দিলে, করুণাময় প্রভু হরিদাদার সঙ্গে আমাকে নিতাই গৌরাঙ্গ মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। আমি যেন আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া গেলাম।

হঠাৎ আমার ভাবান্তর দেখিয়া আমার কয়েকটি গ্রাজুয়েট বন্ধু কারণ জিজ্ঞাসা করায় আমি বলিলাম—"ভাই! আমি ইহার কিছুই জানি না, একমাত্র শ্রীগুরুদেব জানেন।" তখন তাঁহারা ইঁহার দর্শনে গিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানারূপ প্রশ্ন করতঃ সরল ভাষায় তাহার সদুত্তর পাইয়া আমাকে বলিলেন—"অপরাবাবু! আপনার বাবাজী যে-সে বৈষ্ণব নহেন; সাঙ্খ্য, বেদান্তাদি গুলিয়া খাইয়া তবে বাবাজী হইয়াছেন।"

আমার জনৈক বন্ধু একদিন ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ্ঞে! আপনি এরূপ পরমানন্দ লাভ করিলেন কিরূপে?"

বাবাজী। ভাই! এ আনন্দ চারি পয়সায় পাওয়া যায়।

শুনিয়া সকলে উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলে ইনি আবার বলিলেন—"দেখ, আমি ঠাট্টা করিতেছি না। সত্য সত্যই চারি পয়সায় পরমানন্দ পাওয়া যায়। তোমরা বাজারে গিয়া চারি পয়সা দিয়া একখানি প্রেমানন্দ দাসের মনঃশিক্ষা অথবা নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা আনিয়া পাঠ কর, তাহাতে বিশ্বাস হইলেই পরমানন্দ লাভ হইবে।"

বন্ধু। আজ্ঞে। বিশ্বাস হওয়াই ত কঠিন। আচ্ছা বিশ্বাস কিরূপে জন্মে?

বাবাজী। ভাই! কিছুই কঠিন নহে। কোন একজন বিশ্বাসী লোকের কৃপালাভ করিতে পারিলেই হইবে। বিশ্বাসী লোক বিশ্বাস সঞ্চার করিতে পারেন।

জানি না কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে বাবাজী মহাশয়ের শ্রীমুখ হইতে এই কথাটি বাহির হইয়াছিল। আমার সেই কয়েকটি বন্ধুই ইঁহার কৃপায় পরম ভক্ত ও বিশ্বাসী হইয়া ধর্ম্মজগতের আদর্শস্থানীয় হইয়াছেন।

একবার আমার ভয়ানক কলেরা হয়; শ্রীগুরুদেব তখন শ্রীবৃন্দাবনে। আমার নাড়ী ছিল না। সকলেরই বিশ্বাস—এ যাত্রা আর আমার প্রাণরক্ষা হইবে না। আমি অচৈতন্য অবস্থায় দেখি পরম দয়াল গুরুদেব আমার শিয়রে বসিয়া বলিতেছেন—"হ্যাঁ, ম'লেই হ'ল! এখনও অনেক কর্ম্ম বাকী।

এই অভয় বাণী শ্রবণের পর হইতেই আমার অবস্থা পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। ক্রমেই একটু সুস্থতা লাভ করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে শ্রীগুরুদেব শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে কলিকাতায় শুভাগমন করিলে পুলিন দাদা ইঁহাকে আমার বাসায় লইয়া আসিলেন আমি তখনও শয্যাশায়ী। গুরুদেবের দর্শন পাইবামাত্র ঐ অবস্থায়ই করযোড়ে প্রণাম করিয়া

বলিলাম—"এবার মরিয়া গিয়াছিলাম, আর দেখা হইত না। ইনি পূর্ব্ববৎ একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, ম'লেই হ'ল! এখনও অনেক কর্ম্ম বাকী।" শব্দ কয়েকটি শুনিবামাত্র আমার পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইল। তখন প্রাণে প্রাণে পরম দয়াল গুরুদেবের জয় দিতে লাগিলাম।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে আমার জ্যেষ্ঠ জামাতার কলেরা হইল। সংবাদ পাইবামাত্র আমি অনন্যশরণ হইয়া শ্রীগুরুদেবের চিত্রপটের সম্মুখে গমনপূর্ব্বক জানাইতে লাগিলাম। হঠাৎ যেন চিত্রপটখানি মৃদু হাসিয়া বলিলেন 'সব শিব শিব।' আমি তখনই বুঝিলাম—জামাইটি বাঁচিবে না। তাহাই হইল, তার পর দিবসই তিনি ইহধাম ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে গমন করিলেন। আমার স্ত্রী শোকাকুলা হইলে, আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা হরিমতি বলিল—'মা! শোক করিবার ত কোনই কারণ নাই, যাহার কর্ম্ম শেষ হইল, সে স্থানান্তরিত হইল, ইহাতে দুঃখ করিবার কি আছে? তোমরা না হয় মনে কর—শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় তোমাদের জামাতা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন।

হরিমতির কথা শুনিয়া আমি জানিলাম যে—'এ কেবল সদ্‌গুরুর কৃপা ভিন্ন আর কিছুই নয়।'

এই সময় কৃপাময় গুরুদেব নিজ হস্তে আমাকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখেন,— শিব শিব! তুমি ত প্রায় সর্ব্বদাই মুখে শিব শিব উচ্চারণ করিয়া থাক, এ ঘটনাও জানিও শিব শিব। চিন্তিত বা দুঃখিত হইবার কোনই কারণ নাই, পত্রপাঠ একবার শ্রীধাম পুরী চলিয়া আইস। গুরুদেবের আজ্ঞা পাইয়া গ্রীষ্মাবকাশ পুরীধামে গমন করিলাম। মঙ্গল-স্বরূপ আনন্দময় গুরুদেবের দর্শন মাত্রই সকল তাপ জুড়াইয়া গেল। মধুময় সঙ্গপ্রভাবে সংসারের সকল কথা ভুলিয়া গেলাম। পনের দিনের

কথা বলিয়া গিয়া আট মাস হইয়া গেল—খেয়াল নাই। আমার সর্ব্বদাই মনে হইত—এই ত কয়েক দিন হইল আসিয়াছি।

প্রথমে পুরী উপস্থিত হইয়া প্রায় চারি পাঁচ দিন পর্য্যন্ত জগন্নাথ দর্শন করি নাই; কারণ ইতিপূর্ব্বে আমাদের গ্রামস্থ রামচন্দ্র সূত্রধর নামক এক ব্যক্তি কোনও লোকের পাল্লায় পড়িয়া জগন্নাথ দর্শনে গমন করে। হতভাগা বাড়ী আসিবামাত্রই বলিতে লাগিল—'হায় রে! অসৎসঙ্গে পড়িয়া আমার কতকগুলি টাকা ভূতকে খাওয়াইলাম। যেন নরকভোগ আর কি! কতকগুলি টাকা ব্যয় করিয়া দেখিলাম কি না তিনটা কাঠের কুঁদো!" পাঁচ সাত দিন পরেই হতভাগার ভয়ানক পীড়া হইল এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইল। আমি সেই ভয়েই একাকী দর্শনে যাই নাই, মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছি, যদি শ্রীগুরুদেব আমাকে সঙ্গে করিয়া দর্শন করান তবেই দর্শন করিব। তাহাই হইল, অন্তর্য্যামী গুরুদেব একদিন প্রাতঃকালে বলিলেন—"মাষ্টার! চল, আমার সঙ্গে জগন্নাথ দর্শন করিবে!" আমার মনোবাসনা পূর্ণ হইল—হৃষ্টচিত্তে ইঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক অঙ্গুলিসঙ্কেতে আমাকে দেখাইলেন—"মাষ্টার! ঐ যে দক্ষিণে শ্রীবলদেবজীউ, মধ্যে সুভদ্রাদেবী এবং বামে শ্রীজগন্নাথদেব।" গুরুদেবের কৃপায় দর্শনমাত্র আমার যেন সাক্ষাৎ বলিয়া প্রতীতি হইতে লাগিল। উঁহারা যেন সচল বিগ্রহ। মধুর মূর্ত্তি দর্শনে নয়নমন জুড়াইয়া গেল, যেন চক্ষু ফিরাইতে কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। কত সুন্দর কি যে অপূর্ব্ব দৃশ্য আমি তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহি।

একদিন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আচ্ছা! ভেক না নিলে কি প্রেমভক্তি লাভ হয় না?"

বাবাজী। কেন হইবে না? তোমার নিজের পুত্রকন্যাদিগকে

যেরূপ ভালবাস, সেইরূপ পরের ছেলেমেয়েদিগকে ভালবাসিতে শিখ ; ক্রমে প্রেমভক্তির অবস্থা অনুভব করিতে পারিবে।

আমি। আচ্ছা! বি, এল, পাশ করিয়া উকিল হইলে হয় না কি ? এখনও সময় আছে।

বাবাজী। পাগল আর কি! আপনার বিষয়চিন্তা লইয়া অস্থির, আবার পরের বিষয়চিন্তা ঘাড়ে করিয়া একটা কিম্ভুতকিমাকার হইবার দরকার কি ? তুমি শিক্ষকতা কর। বালকেরাই প্রকৃত সাধু, উহাদের সঙ্গ কর, সহজেই প্রেমভক্তি লাভ হইবে।

ঝাঁজপীটা মঠে একখানি হাতে-লেখা **ভক্তিরত্নাকর** গ্রন্থ ছিল ; একদিন বাবাজী মহাশয় ঐ গ্রন্থখানি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "মাষ্টার! মনোযোগপূর্ব্বক ভক্তিরত্নাকর পাঠ কর, বড়ই সুন্দর গ্রন্থ। কিন্তু যেন মনে থাকে আমি পরীক্ষা করিব।" আমি দশ বার দিনে গ্রন্থ শেষ করিয়া ইঁহাকে বলিলাম—"আজ্ঞে! আমার পড়া শেষ হইয়া গিয়াছে, আপনি পরীক্ষা করুন।"

বাবাজী। আচ্ছা, ভক্তিরত্নাকর হইতে কি সার সংগ্রহ করিয়াছ সংক্ষেপে বল দেখি।

আমি। শ্রীমন্মহাপ্রভু **যৌথিক ভজন** প্রণালী প্রকাশ করিলেন ; অর্থাৎ দলবদ্ধভাবে ভক্তগণ সঙ্গে নিজে নাম প্রেম প্রচার করিলেন এবং অভিন্ন-কলেবর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত প্রভু প্রভৃতির দ্বারা সেইভাবে প্রচার করাইয়া স্বেচ্ছাময় প্রভূ সাঙ্গোপাঙ্গ পার্ষদগণ সহ অপ্রকট লীলা অভিনয় করিলে পর আবার শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, নরোত্তম ঠাকুর এবং শ্যামানন্দ প্রভু ইঁহারাও ঠিক সেইভাবে নাম প্রেম প্রচার করিয়া পূর্ব্ববৎ অপ্রকট লীলা অভিনয় করার পর কিছুদিন পর্য্যন্ত যৌথিকভজন প্রথাটা যেন একটু শিথিল হইয়া যায়। মহাত্মাগণ নিজ নিজ ভাবানুসারে

ভজন করিতেছিলেন। বর্ত্তমানে আপনার কৃপায় আমরা যেন আবার সেই যৌথিকভজন প্রণালীর আভাস পাইতেছি। অন্যান্য অবতারাদি হইতে মহাপ্রভুর লীলাতেই মাধুর্য্যের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। নাম প্রেম বিতরণ মহাপ্রভুর নিজ কার্য্য, আমার বিশ্বাস যে, সপরিকরে শ্রীমন্মহাপ্রভু পরপর অবতীর্ণ হইয়া নিজকার্য্য সমাধান করিয়া থাকেন।

শ্রীগুরুদেব আমার কথা শুনিতেছিলেন আর ইঁহার সর্ব্বাঙ্গে পুলক কম্পাদি সাত্ত্বিক বিকারগণ প্রকাশ পাইতেছিল। আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই প্রেমগদগদকণ্ঠে পদ ধরিলেন :—

"জয় রে জয় রে জয়, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, প্রেম-ভকতি মহারাজ। যাঁক মন্ত্রী, অভিন্ন কলেবর, রামচন্দ্র কবিরাজ ॥ ইত্যাদি।

পদটী গাহিতে গাহিতে আমার পৃষ্ঠদেশে একটী চাপড় মারিয়া বলিলেন—"মাষ্টার খোল বাজাও।" আমি ইতিপূর্ব্বে কখনও খোল বাজাই নাই; কিন্তু ইঁহার আদেশমত খোল বাজাইতে লাগিলাম। আমার বাজনা শুনিয়া আমিই অবাক। এই হইতে যখনই নিজে কীর্ত্তন করিতেন প্রায় তখন আমাকে বাজাইতে বলিতেন; আমি একজন বড় বাবাজীর বড় বায়েন হইলাম।

একদিন বলিলেন—"মাষ্টার! প্রভু আমার পরম দয়ালু, তিনি কলিহত মায়ামুগ্ধ জীবের প্রতি করুণা করিয়া যে যৌথিক ভজন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে জীবের আর চিন্তার বিষয় কিছুই নাই।"

আমি। আজ্ঞে! কিছুই ত হইল না, সাধন ভজনাদি ত কিছুই করিতে পারিলাম না। আমার কি গতি হইবে?

বাবাজী। দেখ মাষ্টার! নিজের ভাবনা নিজের উপর না রাখিয়া কাহারও উপর নির্ভর কর, সকল অভাব মিটিয়া যাইবে।

আমি। আচ্ছা, এ জগতে কৃষ্ণপ্রেম বুঝা যায় কিরূপে?

বাবাজী। কৃষ্ণপ্রেমের দৃষ্টান্তস্থল ত্রিজগতে পাওয়া সুকঠিন, তবে একজনকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসিয়া ফেল, প্রেমের কিঞ্চিৎ আভাস বুঝিতে পারিবে। আমার ভজন কি জান? এই যে সমস্ত বালকগণ সঙ্গে থাকিয়া ভজন সাধন করিতেছে আমি উহাদিগকে স্মরণ করি।

শ্রীগুরুদেবের এই উপদেশের মর্ম্ম আমি বুঝিলাম যে, যৌথ ভজনের এইটিই অপূর্ব্ব রহস্য। আমি যদি ভজনসাধন করিতে নাও পারি, যে সমস্ত গুরুভাই ভগিনীগণ ভজনসাধন করিতেছেন, তাহাদিগকে স্মরণ করাই প্রধান ভজন।

পরম করুণাময় শ্রীগুরুদেবের করুণার কথা এক মুখে বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। অধমের প্রতি এতই কৃপা যে আমার পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, আত্মীয় স্বজনকে—এমন কি আমার ছয়মাসের শিশুসন্তান হরি চরণকে পর্য্যন্ত দীক্ষিত করিয়া সগোষ্ঠী আমাকে চিরজীবনের মত অঙ্গীকার করিলেন। অন্যের কা কথা—আমার ভাগিনেয় শ্রীমান্ অনুকূল চন্দ্র হাজরাকে এতই কৃপা করিয়াছেন যে, তাহার আর পরিসীমা নাই। পূর্ণযৌবনে তাহার স্ত্রীবিয়োগ হয়। কিন্তু সে আর দারান্তর পরিগ্রহ না করিয়া প্রায় বিশ বৎসর কাল বিশুদ্ধ চরিত্রে হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিকট গণেশবাজার গ্রামে ডাক্তারী করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে এবং শ্রীগুরুদেবের কৃপাপ্রভাবে নামপ্রেম প্রচারের সহায়তা করিয়াছে। এরূপ সচ্চরিত্র যুবক প্রায়ই দেখা যায় না। আমি শ্রীগুরুদেবের নিকট থাকিয়া অযাচিতভাবে তাঁহার যে সমস্ত উপদেশামৃত বা কৃপা-সুধা পান করিয়াছি, তাহার এক কণাও প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। কৃপার আভাস মাত্র প্রকাশ করিতে গিয়াও আমি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। সকলে আমায় ক্ষমা করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের দর্শনার্থে উত্তরাখণ্ডে গমন

দেখিতে দেখিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবাজী মহাশয় পরমানন্দে সঙ্গীগণ এবং আগন্তুক বৈষ্ণবগণকে সঙ্গে লইয়া কীর্ত্তনানন্দে স্নানযাত্রা, গুণ্ডিচামার্জ্জন, রথযাত্রা শেষ করিলেন। একদিন ইনি গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন, কোনই কথাবার্ত্তা নাই। প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে জলদগম্ভীরস্বরে "রাধা বিনোদ" বলিয়া ডাকিবামাত্রই রাধাবিনোদ নিকটে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলে ইনি বলিলেন—"যদি তুমি নিজের মঙ্গল কামনা কর, তবে নিতাইচাঁদের আদেশক্রমে অবিলম্বে হাঁটা পথে চারিধাম গমন কর। যতই বিলম্ব করিবে ততই তোমার অনিষ্ট হইবে।" আদেশ শ্রবণে সকলেই মর্ম্মাহত হইলেন। ললিতাদাসী বিশেষ কাতরতার সহিত অনুরোধ করিতে লাগিল, "বালক কখনও কঠোরতা করে নাই, এত কষ্ট কিরূপে সহ্য হইবে? আবার যদি কোন কুসঙ্গে পড়িয়া যায়, তবে একেবারেই জীবনটা নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব আপনি এ যাত্রায় ক্ষমা করুণ।" অন্যান্য সঙ্গীগণ সকলেও এইভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলে ইনি উদাসপ্রাণে বলিলেন—"আচ্ছা তোমাদের ক্ষমতা হয় রাখ, আমার আপত্তি কি?" এই বলিয়া জগন্নাথদর্শনে গমন করিলেন।

একদিন অপরাহ্ন সময় ইনি ললিতাদাসীকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ, বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ আমায় একবার স্থানান্তরে যাইতে হইবে। তোমরা সকলে বিশেষ মনোযোগের সহিত সেবাকার্য্য কর।"

ললিতা। আজ্ঞে! আসিতে কতদিন বিলম্ব হইবে?

বাবাজী। বেশীদিন হইবার ত কথা নহে, তবে নিতাইচাঁদ জানেন।

ললিতা। সঙ্গে কে কে যাইবে?

বাবাজী। কেহই না, আমি একাকী যাইব।

ললিতা। একাকী যাওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অন্ততঃ দুই একজনকে ত সঙ্গে লওয়া চাই।

বাবাজী। একজনকে নিলে অপরের মনে দুঃখ হইবে; সুতরাং কাহাকেও লইবার দরকার নাই।

ললিতা। এই হরিদাস বালক, উহাকে সঙ্গে লইলে কাহারও মনে দুঃখ হইবে না; অতএব উহাকে সঙ্গে লইতে হইবে।

ললিতাদাসীর কথায় ইনি আর কোন আপত্তি না করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ললিতাদাসী "মৌনং সম্মতিলক্ষণং" বুঝিতে পারিয়া হরিদাস যাহাতে সর্ব্বদা যত্নের সহিত ইহার সেবা-শুশ্রূষাদি করিতে সমর্থ হয়, সেই বিষয়ে উপদেশ দিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় পরদিবস প্রাতে জগন্নাথ দর্শন এবং সকলের নিকট কয়েক দিনের জন্য বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক মঠে আগমন করিয়া ললিতাদাসীকে সমস্ত ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। নিজেও স্নান-আহ্নিকাদি শেষ করতঃ মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া ষ্টেশনাভিমুখে রওনা হইলে আশ্রমবাসী এবং অন্যান্য ভক্তবৃন্দ দুঃখিত-চিত্তে ইহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। ট্রেণ ছাড়িবার সময় উপস্থিত হইলে ইনি সকলকে মধুরবাক্যে প্রবোধ দিয়া মেদিনীপুর রওনা হইলেন। মেদিনীপুরের মোক্তার বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে দুইদিন অবস্থান করতঃ "আমি আটদিনে ফিরিয়া আসিব" এইরূপ আশ্বাসবাক্য প্রদানপূর্ব্বক হরিদাসকে সেইস্থানে রাখিয়া একাকী কোথায় প্রস্থান করিলেন।

এদিকে রাধাবিনোদ, বাবাজী মহাশয় সঙ্গে লইয়া বাঙ্গালায় গমন করিবেন এই আশায় কয়েকদিন পুরীতে ছিল; যখন ইনি ছোট

হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া গমন করিলেন, তখন মনঃকষ্টে চারিধাম যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। ফণী বলিল—"যখন বাবাজী মহাশয় আমাকে সঙ্গে নিলেন না, তখন আমিও তোমার সঙ্গে চারিধাম যাইব।" এইরূপে বাবাজী মহাশয় যাইবার তিন চারিদিন পরে রাধাবিনোদ, ফণী, গোবিন্দানন্দ পরিব্রাজক, ঈশ্বরদাস, রূপদাস, সনাতনদাস এবং নীলমাধব দাস এই সাতজনে চারিধাম রওনা হইলেন।

এদিকে আটদিনের স্থলে পনের দিন হইয়া গেল, তবুও বাবাজী মহাশয়ের কোনও সংবাদ না পাইয়া মোক্তার বঙ্কিমবাবু মেদিনীপুর হইতে পুরী, কলিকাতা এবং নবদ্বীপে সংবাদ দিলেন। সংবাদ পাইয়া অনেকেই বাবাজী মহাশয়ের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। রামদাদা মেদিনীপুর গমন করতঃ কোনই সন্ধান না পাওয়ায় অগত্যা হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। বড় বাবাজী মহাশয় নিরুদ্দেশ এই কথা খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। সাতমূর্ত্তি চারিধামে যাইতেছিলেন; ওয়ালটেয়ার পর্য্যন্ত যাইয়া খবরের কাগজে বাবাজী মহাশয়ের সংবাদ শ্রবণে ফণী আর সেদিকে না গিয়া একেবারে কলিকাতায় চলিয়া আসিল। রূপদাস, সনাতন দাস, নীলমাধব দাস প্রভৃতি এক একজন এক একদিকে চলিয়া গেল। কেবল রাধাবিনোদ, গোবিন্দানন্দ পরিব্রাজক এবং ঈশ্বর দাস এই তিনজন চারিধাম গমন করিলেন।

এদিকে প্রায় দেড়মাস পরে শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘটক মহাশয় কলিকাতা মির্জ্জাপুর মঠে এই মর্ম্মে একখানি পত্র দিলেন যে—"তোমরা দাদার জন্য কোনই চিন্তা করিও না, তিনি আজ তিন দিন হইল শ্রীধামে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আট দশদিন পরে কলিকাতা যাইবেন।" সংবাদ পাইয়া রামদাদা, হরিদাস প্রভৃতি কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপ গমন করিলেন। ফণী, পুলিন দাদার নিকটে

বাবাজী মহাশয়ের সংবাদ পাওয়ায় কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া নবদ্বীপ যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলে পুলিন দাদা, প্রিয়নাথ মল্লিক মহাশয়ের আগরপাড়ার বাগানবাটীতে বাবাজী মহাশয়ের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপ রওনা হইলেন। রাত্রি অনুমান দশটার সময় ঘটক মহাশয়ের বাড়ী আসিয়া শুনিলেন যে, বাবাজী মহাশয় সকাল বেলা কোন ভক্তের বাড়ী গিয়াছেন। রাত্রে আর সে স্থানে যাওয়ার সুবিধা না হওয়ায় পরদিবস প্রাতে একখানি নৌকা করিয়া ঘটক মহাশয়, পুলিন দাদা ও ফণী এই তিনজনে সেই ভক্তের বাড়ী রওনা হইলেন। গঙ্গার জল অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় ভক্তের আঙ্গিনায়ই নৌকা উপস্থিত হইল। বাবাজী মহাশয়, পুলিন দাদা ও ফণীকে দেখিবামাত্র এক লম্ফে নৌকায় উঠিয়াই পুলিনদাদার কোলের উপর বসিয়া বালকের ন্যায় সাশ্রুগদগদ-কণ্ঠে বলিলেন—"তোদের বড়ই কষ্ট হইয়াছে।"

পুলিন। আজ্ঞে! কষ্টের কথা আর কি বলিব? প্রাণহীন দেহ লইয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিতেছিলাম। আচ্ছা, কাহাকেও কিছু না বলিয়া এইরূপভাবে চলিয়া গেলে আমরা কিরূপে বাঁচি?

বাবাজী। আমি পাগল মানুষ, নিতাইচাঁদ কখন কোথায় লইয়া যান সে জন্য তোদের অত ভাবিলে চলিবে কেন?

পুলিন। আজ্ঞে! সম্প্রতি কোথায় যাওয়া হইয়াছিল?

বাবাজী। নিতাইচাঁদ উত্তরাখণ্ডে শ্রীগুরুদেবের দর্শনে লইয়া গিয়াছিলেন।

পুলিন। আপনি ত প্রায়ই আপনার গুরুদেবের কথা বলেন; কিন্তু আমাদিগকে ত একবারও দর্শন করাইলেন না।

বাবাজী। তিনি ত আর এদিকে আসিবেন না, আমি কিরূপে দর্শন করাইব?

পুলিন। আপনি গুরুদেবের দর্শনে যাইবেন, যদি আমরা জানিতাম, তবে আপনার সঙ্গে গেলেই তাঁহার দর্শন লাভ হইত।

বাবাজী। হ্যাঁরে! তোদের এখনও সেরূপ অবস্থা হয় নাই যে তোরা তাঁহার দর্শন পাইবি। তিনি যে সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ! তিনি কৃপা করিয়া যাঁহাকে আকর্ষণ করিবেন, সে ছাড়া কাহার সাধ্য যে তাঁহার দর্শন পায়!

পুলিন। তথা হইতে আর কোথায় যাওয়া হইয়াছিল?

বাবাজী। তাঁহারই আদেশক্রমে একবার পূর্ব্বাশ্রম দর্শন করিয়া শ্রীধামে আসিয়াছি।

এইরূপ পরমানন্দে পাঁচ সাতদিন শ্রীধামে থাকিয়া কলিকাতায় আগমন করতঃ আগরপাড়ার বাগানবাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

—০—

আগরপাড়া বাগানে অবস্থিতি

বাবাজী মহাশয় কলিকাতা আগমন করিয়াছেন শুনিয়া বহু ভক্তবৃন্দ ইঁহার দর্শনার্থ আসিতে লাগিলেন। এইদিন শ্রীধাম পুরী হইতে শ্রীযুক্ত জগদীশ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উঁহার একটু মস্তিষ্কের গোলমাল হইয়াছে। একদিন আহ্নিক করিতে বসিয়া একটি শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের চরণছাপা লইয়া গোপীচন্দন দ্বারা নিজের পায়ের উপর নূপুর আকারে ছাপ দিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় বলিলেন,—"দেখ জগদীশবাবু! তোমার এ কাজটি উচিত হয় নাই, ইহাতে অপরাধ হয়।" জগদীশ বাবু একটু জোরের সহিত বলিলেন—"আমি ত কিছুই করিতেছি না, এ সমস্তই ত তুমি করাইতেছ! অপরাধ হয় তোমার হইবে, তাহাতে আমার কি? কথাটি শুনিয়া ইনি নীরব রহিলেন।

তিন চারি দিন যায়, একদিন জগদীশ বাবু বাগানে পুষ্করিণীর ধারে পূর্ব্ববৎ আহ্নিক করিবার মানসে ছাপাতিলক ইত্যাদি বাহির করিয়া হাতে তিলক ঘসিতেছিলেন, এই সময় একটী কাক আসিয়া চরণছাপাটী লইয়া গেল। সকলে দেখিয়া শুনিয়া অবাক্! বৃদ্ধ ছাপার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে ইঁহার নিকট সংবাদ দিলে ইনি গিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"এখনও কি তোমার বুঝিতে বাকি আছে? ও যাঁহার ছাপা তাঁহারই কাজ। তাহা না হইলে অত বড় ভারি ছাপাটী কাকে লইতে পারে কি? একে ত চরণছাপা তাহাতে আবার নাম রহিয়াছে। নাম নামী অভিন্ন, নামী হইতেও নামমাহাত্ম্য বড়, তুমি তাঁহাকে অবমাননা করিবে, আর প্রভু সেইটি অবাধে সহ্য করিবেন, এ কি কখন সম্ভবে? বেশ উপযুক্ত বিচার হইয়াছে।"

জগদীশ। কাক টাক কিছুই নয়, ও সকলই তোমার চাতুরী আমি বেশ বুঝিয়াছি। আমি নাস্তিক ছিলাম, আস্তিক করিলে; ঘোর অবিশ্বাসী ছিলাম, বিশ্বাস জন্মাইয়া দিলে; বিধিবদ্ধ ভাবে নৈষ্ঠিক ভক্তিযাজক ছিলাম, রাগানুগা ভক্তি বুঝাইয়া স্বেচ্ছাচারী করিলে; গৃহস্থ ছিলাম, উদাসীন করিয়া পাগল সাজাইলে। আরও যে, তোমার মনে কি আছে তুমিই জান!

বাবাজী। আচ্ছা, একটা জীবের প্রতি যদি তোমার এই জাতীয় বিশ্বাসই হইয়া থাকে, তবে পরোক্ষানুভূতি দ্বারা তাহার প্রত্যক্ষ আদেশ উল্লঙ্ঘন করিতেছ কেন? প্রত্যক্ষ থাকিতে অনুমান করা উচিত কি?

তখন জগদীশ বাবু অতিশয় ব্যাকুলিতভাবে আসিয়া ইঁহার চরণ ধারণপূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"তোমার যাহা ইচ্ছা কর, আমি আর কি বলিব?"

—০—

সখী কিশোরী দাসীর বিবরণ

একদিন ইনি প্রাতঃকালে মুখ ধুইতেছেন হঠাৎ মুখ হইতে কতকটা রক্ত বাহির হইল। উপস্থিত সঙ্গীগণ একটু চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ্ঞে! আমরা ত আর কখনও এরূপ অবস্থা দেখি নাই, হঠাৎ এরূপ রক্ত বাহির হইবার কারণ কি? তবে কি কোনওরূপ শারীরিক অসুখ হইয়াছে?

বাবাজী। শ্রীধাম পুরীতে হঠাৎ কোনও বিপদ্ হইয়াছে, তাই আমার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে।

এই বলিয়া নিজের থাকিবার ঘরে গমনপূর্ব্বক আপাদমস্তক একখানি চাদর চাপা দিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। প্রায় আধঘণ্টা পরে হঠাৎ অর্দ্ধস্ফুটস্বরে "কিশোরী" এই শব্দটি উচ্চারণ করিয়া আবার চুপ করিলেন। বেলা অনুমান সাড়ে দশটা, এই সময় উঠিয়া বলিলেন—"আমি আজই পুরী রওনা হইব—পুলিনকে এই সংবাদ দাও।" বলিতে না বলিতেই পুলিন দাদা একটী টেলিগ্রাম হাতে করিয়া অতি দ্রুতগতি আসিতেছেন দেখিয়া ইনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁরে পুলিন! তোর হাতে কিসের কাগজ রে?" পুলিন দাদা বলিতে একটু ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া আবার বলিলেন—"বল্ বল্ কি সংবাদ! ও আমি আগেই জানি যে, শ্রীরাধাষ্টমীর পরদিবস কিশোরী দাসী সখীকে রাধারাণী অঙ্গীকার করিয়াছেন। ভালই হইল, নিরপরাধে জীবন যাপন করিয়া রাধারাণীর কৃপা পাইল। আমার ভাগ্যে ত আর হইবে না। যাহা হউক আজই আমাকে পুরী যাইতে হইবে, বন্দোবস্থ কর।" বলিয়া স্নানাদি নিত্যকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক মহাপ্রসাদ গ্রহণকরতঃ কিঞ্চিৎ

বিশ্রামান্তে বেলা অনুমান দুইটার সময় সকলকে সঙ্গে লইয়া আগরপাড়ার ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

হঠাৎ ইঁহার পুরী যাইবার কথা শুনিয়া আগরপাড়ানিবাসী বহু ভদ্রলোক আসিয়া অকস্মাৎ পুরী যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় ইনি বলিতে লাগিলেন—"অদ্বৈত দাস নামক অনুমান বিশবর্ষ বয়স্ক একটি বালক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে আমার সঙ্গ ছাড়িয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন গমন করে। তীব্র বৈরাগ্যভাবে বৃন্দাবনের সমস্ত দর্শন করতঃ বর্ষাণে শ্রীজীউর মন্দিরে ঝাড়ুগিরি করিতে থাকে। বালকটি কাহার সহিত বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা কহে না। আপন মনে ঝাড়ু দেয়, আর সন্ধ্যার সময় অনুরাগভরে নিজের গায়ের চাদরখানি মাথায় দিয়া শ্রীজীউর সম্মুখে নৃত্য করে। বালকটিকে সকলেই প্রীতি করিয়া থাকে। একদিন প্যারীজী স্বপ্নে উহাকে সখীবেশ ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে আদেশ করেন। আদিষ্ট হইয়াও তদনুযায়ী প্রত্যক্ষরূপ কোন প্রমাণের অপেক্ষায় পূর্ব্ববৎ ভাবেই নৃত্য করিতে থাকে। তিন দিনের দিন রাত্রে আবার প্যারীজী বলিলেন—"কৈ তোকে আমি যাহা বলিলাম তাহা ত আচরণ করিলি না! আগামী কল্য অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় আমি একখানি কাপড় পাঠাইয়া দিব; উহা পরিয়া আমার সম্মুখে নৃত্য করিবি। সেই তোর সিদ্ধ বেশ।" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

পরদিবস যথাসময়ে প্রিয়াজীর সেবকদিগের ঘরের একটী প্রাচীনা স্ত্রীলোক একখানি শাড়ী এবং একটি কাঁচলী লইয়া অদ্বৈতকে বলিলেন—"বাবা! তুমি প্যারীজীর সম্মুখে রোজ নৃত্য কর দেখিয়া আমার বড়ই সুখ হয়। এই কাপড় ও কাঁচলী পরিয়া প্রতিদিন নাচিবে বলিয়া কাপড়খানি উহার হাতে দিয়া দ্রুতগতি প্রস্থান

করিলেন। সেইদিন হইতেই সে ঐ কাপড়খানি পরিয়া নৃত্য করে। ক্রমে ঐ বেশের উপর আসক্তি জন্মিলে বহু চেষ্টা করিয়াও আর বেশ ছাড়িতে পারিল না। ব্রজবাসী-বাসিনীগণ উহাকে কিশোরী দাসী বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। বৎসরাবধিকাল পরমানন্দে ব্রজে কাটাইয়া পুনরায় পুরী ঝাঁজপীটা মঠে আগমন করতঃ শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেবের সেবা করিতেছিল। উহার অপূর্ব্ব ভাবের বিকাশ, অতি আশ্চর্য্যরূপ লীলাস্ফুর্ত্তি এবং অভাবনীয় সেবার পরিপাটি দেখিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হইয়া যাইত। উহার সেবায় শ্রীবিগ্রহের এমন অপূর্ব্ব মাধুরী এবং সৌন্দর্য্য বিকাশ হইয়াছিল যে, লোকে দেখিয়া পূর্ব্বদৃষ্ট বিগ্রহ কি না সন্দেহ করিত। বাস্তবিক সময় সময় আমাদেরই ভ্রম জন্মিত। সেই ছেলেটির সাধন পূর্ণ হইয়াছিল। কাজেই রাধারাণী গতকল্য (রাধাষ্টমীর পরদিবস) তাহাকে চিরজীবনের মত অঙ্গীকার করতঃ নিত্যলীলায় নিত্যসেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। অবশ্য উহার অবস্থা দেখিয়া আমার পরমানন্দ হইয়াছে। তবে কি না নিতাইচাঁদ কৃপা করিয়া সঙ্গ দিয়াছিলেন, উহাকে দেখিবামাত্র আমার লীলাস্ফুর্ত্তি হইত; উহার আধ আধ মধুর লীলাকথায় শ্রবণমন জুড়াইয়া যাইত; সেবার বিকাশ দেখিয়া প্রাণ শীতল হইত। সেইটির অভাব হইল! "কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈল সঙ্গভঙ্গ॥"

বাবাজী মহাশয় আরক্তিম-নয়নে সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বিভোরভাবে এইরূপ কত কথাই যে বলিতে লাগিলেন, তাহার আর সীমা নাই। ইঁহার মুখে কিশোরীদাসীর গুণ শুনিয়া সকলেই বিস্মিতভাবে তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন ইনি সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক নৌকাযোগে তেলকলঘাটে পৌঁছিয়া তথা হইতে গাড়ী করিয়া বেলা অনুমান চারিটার সময় হাওড়া কোঁড়ার বাগানে শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু

কাব্যতীর্থ মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। অভাবনীয়রূপে হঠাৎ গুরুদেবকে পাইয়া কাব্যতীর্থ মহাশয় একেবারে আনন্দে অধীর হওয়ায় কি করিবেন, কোথায় রাখিবেন ইত্যাদি ভাবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এদিকে রাধাগোবিন্দের ভোগরাগের যোগাড় হইতে লাগিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বাবাজী মহাশয়ের আগমনবার্ত্তা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ওখানকার জমিদার শ্রীযুক্ত কালীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রিয়নাথ বাবু প্রভৃতি কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভক্ত আসিয়া ইঁহার সহিত নানারূপ তত্ত্বকথা প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া কাব্যতীর্থ মহাশয় কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। পণ্ডিত কাব্যতীর্থ আজ অভীষ্টদেবকে নিজগৃহে পাইয়া একেবারে আনন্দে আত্মহারা। যথাসময়ে কীর্ত্তন সমাপ্তি করতঃ শ্রীরাধাগোবিন্দের ভোগান্তে ইঁহারা সকলে মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক হাওড়া ষ্টেশনে গমন করিলেন। হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, শ্রীধাম পুরীর গাড়ী প্রস্তুত, সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া মধুরবাক্যে উপস্থিত ভক্তবৃন্দের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীধাম পুরী রওনা হইলেন। পরদিবস বেলা আন্দাজ আটটার সময় গাড়ী পুরী ষ্টেশনে পৌছিলে ইঁহারা হাতে তালি দিয়া নাম করিতে করিতে ঝাঁজপীটা মঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

ললিতাদাসী প্রভৃতি আশ্রমবাসীগণ আজ বাবাজী মহাশয়কে পাইয়া সমকালীন সুখদুঃখে নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন। সকলেই কিশোরী দাসীর কথা স্মরণ করিয়া কাতরভাবে রোদন করিতে লাগিলে বাবাজী মহাশয় সকলকে সান্তনা বাক্যে আশ্বস্ত করতঃ কিশোরী দাসীর বিবরণ জিজ্ঞাসা করায় ললিতা দাসী বলিতে লাগিল—"আপনি এ স্থান হইতে যাইবার পর একদিন কলিকাতা হইতে সংবাদ আসিল যে, আপনি সকলের অজ্ঞাতসারে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। পত্র পাইয়া সকলেই বিশেষ

চিন্তিত। আমি রান্না করিতেছিলাম, হঠাৎ কিশোরী দাসী আসিয়া আমার নিকট বসিল এবং নানা কথাবার্ত্তার পর একটু ব্যাকুলভাবে বলিল—"মা! তোমার ত শরীর প্রায়ই অসুস্থ থাকে, তুমি যদি আমাদের আগে মরিয়া যাও, তবে আমাদিগকে কে এত যত্ন করিয়া খাইতে দিবে? বাবাজী মহাশয় ত আজকাল প্রায়ই আমাদিগকে ছাড়িয়া নানা স্থানে পরিভ্রমণ করতঃ জীব উদ্ধার করিতেছেন। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ দাদা, গোকুল দাদা, চৈতন্য দাদা প্রভৃতিও আমাদিগের মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাকৃত চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া নিজ নিজ অভীষ্ট বস্তু ভোগ করিতে লাগিলেন। আবার তুমিও যদি চলিয়া যাও, তবে কাহার কাছে দাঁড়াইব? কেই বা আমাদের মুখপানে তাকাইবে?

আমি। ভয় কি মা! তোমরা যাঁহার চরণাশ্রয় করিয়াছ, তাঁহার কৃপায় আমা হেন কত শত দাসী তাঁহার চরণে গড়াগড়ি যাইতেছে। তোমরা তাঁহার প্রাণের জিনিষ, তোমাদের যত্নের অভাব কি মা? প্রভু কৃপা করিয়া যে সেবা দিয়াছেন, প্রাণপণে সেই সেবা কর, অভীষ্টপূরণ হইবে।

কিশোরী। না মা! তোমার ও সমস্ত কথায় আমার মনের ব্যাকুলতা মিটিতেছে না। আমার চিত্ত বড়ই চঞ্চল হইয়াছে, কি উপায় করি বল।

আমি। পাগলী, অত অস্থির কেন? প্রভু আমার বাঞ্ছাকল্পতরু, তাঁহাকে জানাও, তিনি বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

"বাঞ্ছাকল্পতরু" নামটী শুনিবামাত্রই সে হৃষ্টচিত্তে উঠিয়া বসিল—তিনি যখন বাঞ্ছাকল্পতরু তখন আর ভাবনা নাই। আমি তোমার সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, ব্যাকুলপ্রাণে প্রভুকে জানাই যাহাতে তোমার অগ্রে এই দেহ ছাড়িতে পারি তাহার চেষ্টা করিব।" আমি

কথাটাকে উপহাসের সহিত উড়াইয়া দিয়া বলিলাম—"আচ্ছা হইয়াছে ও সমস্ত বাজে কথা লইয়া সময় কাটাইবার দরকার নাই, যাও সেবার কার্য্য কর গিয়া।" বলিবামাত্র উঠিয়া ঠাকুরমন্দিরে গেল, আমি আমার নিজের কার্য্য করিতে লাগিলাম।

এইরূপে কয়েক দিন যায়, নন্দোৎসবের পর দিন কীর্ত্তনাদি হইয়া গেল; বৈকাল বেলা উহার মুখের দিকে তাকাইয়া আমি বলিলাম, "কিশোরি! আজকাল প্রায় সর্ব্বদাই তোমার মুখখানি মলিন দেখি কেন? যেন কত চিন্তিত বলিয়া মনে হয়, কারণ কি বল দেখি?"

কিশোরী। না মা! বিশেষ কিছুই নয়, তবে কতদিনে যে তিনি বাসনা পূর্ণ করিবেন তাই ভাবিতেছি।

আমি। সেদিনকার কথা ভুলিয়া গিয়া উপাসনা সম্বন্ধে বলিলাম যে, পরম করুণাময়ী প্যারীজীকে জানাও, তিনি যখন সেবায় অঙ্গীকার করিয়াছেন তখন আবার ভাবনা কি?"

কিশোরী। আমার জন্য আর কোনও ভাবনা নাই, তবে তোমার নিকট দুইটি প্রার্থনা আছে, তুমি যদি পূর্ণ করিবে প্রতিজ্ঞা কর, তবে আমি বলি!

আমি। আরে পাগলী! এমন কি কথা যে আমাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে? আচ্ছা আমি না হয় প্রতিজ্ঞাই করিলাম, তুমি যাহা বলিবে আমি সাধ্য মত পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিব।

কিশোরী। প্রথম প্রার্থনা—আমার অন্তিম সময় তুমি নিজে আমার সিদ্ধ নামটী স্মরণ করাইয়া দিবে। দ্বিতীয়—আমার অসাবধানতাবশতঃ যেন বস্ত্রাদি বিশ্রস্ত হইয়া বে-আবরু না হই। মোট কথা—শেষ সময়টিতে এই কৃপাদত্ত ভাবোচিত বেশের কোনরূপ বৈপরীত্য না ঘটে এইটির প্রতি তুমি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।

কিশোরী দাসীর তাৎকালিক ভাবভঙ্গী বা সেই কথাটা যেন আমার প্রাণে বড়ই বাজিল। সেদিন আর আমি ঐটি উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলাম না। একটু কাতরভাবে বলিলাম—"কিশোরী! তুমি প্রায় সর্ব্বদাই ঐরূপ একটা হৃদয়বিদারক কথা বলিয়া আমার হৃদয়ে আঘাত দাও কেন? এমন সুমধুর সেবা পাইয়াছ, সেবা কর।"

কিশোরী। মা! আমি কি করিব? আমার প্রাণ বলিতেছে যে, আমি বোধ হয় শ্রীরাধাষ্টমী পর্য্যন্ত সেবা করিতে পারিব কি না সন্দেহ।

আমি অন্য কার্য্যে চলিয়া গেলাম। যথার্থই শ্রীরাধাষ্টমীর পূর্বদিন আমায় ডাকিয়া বলিল—'মা! আমি আজ আর সেবা করিতে পারিব না। গোবর্দ্ধনকে সেবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া দাও।" আমি তাহাই করিয়া দিলাম; কিন্তু মনটা বড়ই খারাপ বোধ হইল। কবিরাজ ধুলিরথকে ডাকিয়া দেখাইলে তিনি বলিলেন—"ইহার' অবস্থা ত কিছু খারাপ দেখিতেছি না। আপনারা এত চিন্তিত হইয়াছেন কেন? কোন ভয় নাই।" আমি উঁহার কথায় সম্পুর্ণ নির্ভর করিতে না পারিয়া একটি ডাক্তার আনাইলাম। তিনি ত প্রথমতঃ হাসিয়াই অস্থির, তৎপরে বলিলেন—"ইহার মরিবার কোন্ লক্ষণ আপনারা অনুভব করিতেছেন?" আমি বলিলাম—"আমরা ত করিতেছি না, ও নিজে বলিতেছে।" ডাক্তার বাবু বলিলেন—"কোনই ভয়ের কারণ নাই, সামান্য একটু জ্বরভাব হইয়াছে, আমি এখনই ঔষধ দিতেছি, আজই ভাল হইয়া যাইবে।" কিশোরী প্রথমতঃ ঔষধ খাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে আমি অনেক জেদ করায় একটু মৃদু হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর।" আমি ঔষধ দিলাম।

পরদিন রাধাষ্টমী, সুতরাং উৎসবাদিতে ব্যস্ত থাকায় সকাল বেলা

আর আমি উহার দিকে লক্ষ্য করিতে পারি নাই; অপরাহ্ণ সময় একবার আমাকে ডাকাইয়া বলিল—"মা! আমার মনে আর কোন দুঃখ নাই; কেবল শেষ সময় বাবাজী মহাশয়ের দর্শন পাইলাম না এই দুঃখ।" আমি বলিলাম—কিশোরি! অতি সামান্য একটু জ্বরে অত ভীত হইতেছ কেন?

কিশোরী। মা! আমি যথার্থই বলিতেছি, শ্রীরাধারাণীর কৃপায় এবং তোমাদের আশীর্ব্বাদে বোধ হয় কাল সাড়ে আটটা নয়টার মধ্যে আমাকে নিশ্চয়ই যাইতে হইবে। তুমি আমার কথা বিশ্বাস করিয়া তদনুরূপ কার্য্য কর, নতুবা অনুতাপ পাইবে। আর আমার এই অনুরোধ—অপরাপর দিন যেমন প্রাতঃকালেই ঠাকুরের রান্না আরম্ভ হয়, কাল যেন সেরূপ করা না হয়।

আমি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম—"হ্যাঁরে কিশোরি! তুই কি যা' বলিলি তাই করিবি? যথার্থই কি আমাদিগকে ফেলিয়া ব্রজে গমন করিবি?"

কিশোরী। মা। তোমাদের আশীর্ব্বাদে বোধ হয় তাহাই হইবে। মা! তোমার দুঃখ করিবার কিছুই ত নাই! বরং তুমি হৃষ্টচিত্তে আমাকে সাজাইয়া ব্রজে পাঠাইয়া দাও। মা! যতদিন বাঁচিব তত দিনই বিপদের আশঙ্কা। "মরবে মেয়ে উড়্বে ছাই, তবে মেয়ের কলঙ্ক নাই।" আমি যে তোমার সম্মুখে নিষ্কলঙ্ক ভাবে যাইতে পারিলাম, এইটিই ত তোমার বিশেষ আনন্দের বিষয়। তবে বাবাজী মহাশয়ের দর্শন পাইলাম না এবং তোমাদের এই মধুময় সঙ্গ ছাড়িয়া যাইতেছি এই আমার দুঃখ।

এই বলিয়া ঠিক বালিকার ন্যায় আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে একটু স্থির হইয়া কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ চাহিলে

কুসুম একখানি থালায় করিয়া শ্রীরাধাকান্তদেবের এবং জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ লইয়া আসিবামাত্র নিজ হাতে আমাদের সকলের মুখে একটু একটু দিয়া সেই অধরামৃত পাইতে লাগিল। এইরূপে সে রাত্র কাটিয়া গেল। পরদিবস প্রাতঃকাল হইতে সকলেই উহার কাছে আসিয়া নাম করিতে লাগিল। বেলা প্রায় সাড়ে আটটার সময় অবস্থাটার একটু বৈপরীত্য লক্ষ্য করায় আমি উহার আদেশমত সিদ্ধ নামটি যেমন কর্ণের কাছে বলিলাম, অমনি মুখখানি প্রসন্ন ও উজ্জ্বল জ্যোতিঃ-সম্পন্ন হইল। আমি তখন একগাছি নিকুঞ্জ বিলাসের যুগল মালা আনিয়া উহার গলায় দিলাম। কেহ কেহ পায়ে আল্‌তা, কপালে সিন্দুর প্রভৃতি দ্বারা নানারূপ ভাবে সিঙ্গার করিয়া দিল! আমরা "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এই নাম করিতেছিলাম, সেও আমাদের সহিত সমস্বরে নাম করিতেছিল; হঠাৎ উচ্চ হাস্য করিতে করিতে রাধে প্রাণেশ্বরি বলিয়া নীরব হইল। মুখখানি হাসিমাখা, চক্ষু দুইটি চল চল, যেন কোনও অত্যাশ্চর্য্যময় বস্তু দেখিতে দেখিতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।"

এই বলিয়া ললিতা দাসী কাঁদিতে লাগিলে বাবাজী মহাশয় সাশ্রু-গদগদকণ্ঠে যেন পঞ্চমুখে কিশোরী দাসীর গুণ বলিয়া সকলকে বলিতে লাগিলেন—"কিশোরী দাসীর জীবন আদর্শ জীবন। যদি কাহারও ব্রজে মধুর ভাবোচিত সিদ্ধ দেহ লাভ করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা প্রাপ্তি কামনা থাকে, তবে সর্ব্বতোভাবে কিশোরী দাসীকে আদর্শ করিয়া সাধকদেহে শ্রীমূর্ত্তিতে নিত্যলীলা স্থাপন করিয়া ভাবসেবা আচরণ কর। সর্ব্বদা মনের একাগ্রতা সম্পাদন করিতে চেষ্টা কর। অনন্যপ্রাণে নিঃস্বার্থ ভাবে অভীষ্ট বস্তুতে ভালবাসা স্থাপন কর। শ্রীগুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস কর। গ্রন্থীপাপ দূর হইয়া হৃদয় সরল ও নির্মল হইবে। রসনিষ্ঠা

রাখিয়া রসান্তরের প্রতি অবজ্ঞাবুদ্ধি পরিত্যাগ কর। আদর্শ জীবন লাভ হইবে। কিশোরী দাসীর প্রাপ্তির কথায় শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণকথা স্মরণ হয়। যাক্, তোমরা সকলে তাহার হইয়া রাধারাণীর নিকটে প্রার্থনা কর—যদি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তোমাদের কাহারও নিকট তাহার কোনওরূপ অপরাধ থাকে ক্ষমা কর।" এইরূপ ভাবে সকলকে নানাবিধ উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক স্নানাহ্নিকাদি করিতে গমন করিলেন।

—০—

আত্মসমর্পণ

একদিন বাবাজী মহাশয় অতিশয় গম্ভীরভাবে ফণীকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ ফণী! তুমি অবিলম্বে নিতাইচাঁদের আজ্ঞা শিরোধারণ-পূর্ব্বক হাঁটাপথে চারিধাম গমন কর। অন্যথা হইলে তোমার যথেষ্ট অনিষ্ট হইবে।" বালক ফণীর উপর কেন যে এইরূপ কঠোর শাসন হইল তিনিই জানেন। ললিতা দাসী দুঃখিত হৃদয়ে বলিল—"আজ্ঞে! কি গুরুতর অপরাধে বালকের উপর এই বজ্রাদপি কঠোর আদেশ হইল? এইরূপভাবে আর আর যে কয়জন বালককে পাঠান হইল, কৈ কেহই ত ফিরিয়া আসিল না! আবার ইহাকে পাঠান কেন?"

বাবাজী। কারণ শুনিবার তোমাদের প্রয়োজন নাই। মোট কথা ইহার অন্যথা করিলে বিপদ হইবে।

ললিতা দাসী আর কোন কথা বলিতে পরিল না। চারি পাঁচদিন যায়, আবার বলিলেন—"কৈ ফণী যে এখনও যায় নাই? ইতিপূর্ব্বে সকলেই মনে করিয়াছিল যে, ইনি খেলায় খেলায় যাওয়ার কথাটা বলিয়াছিলেন, হয় ত ভুল হইয়া গিয়াছে, আর কোন ভয় নাই। আজকার কথা—শুনিয়া সকলেই মনে দৃঢ় ধারণা করিলেন যে, নিশ্চয়ই ফণীকে

বিদায় দিলেন। ফণীও যাওয়াই স্থির করিয়া সমস্ত যোগাড় করিতেছে, আর মনে মনে বিচার করিতেছে যে, বাবাজী মহাশয় যখন পুনঃ পুনঃ আদেশ করিতেছেন তখন যাইতে ত হইবেই, তবে একবার জিজ্ঞাসা করি না কেন যে কি অপরাধে আমাকে সঙ্গছাড়া করিবেন। পরদিবস ললিতাদাসী প্রভৃতি কয়েকজন সখী রাত্রি তিনটার সময় সমুদ্রস্নানে গমন করিলে ফণী ধীরে ধীরে বাবাজী মহাশয়ের ঘরে গমন করিয়া দেখে যে তখনও ইনি শয়নে আছেন। তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে, এই সময় বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"কে রে ?"

ফণী। আজ্ঞে! আমি ফণী।

বাবাজী। তুমি যে এখনও যাও নাই ?

ফণী। আজ্ঞে! আজই যাইবার ঠিক করিয়াছি, তবে একটী কথা জিজ্ঞাস্য আছে।

বাবাজী। আমার কাছে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার ত কোনই প্রয়োজন নাই। আচ্ছা বল কি বলিবে।

ফণী। বলিবার অন্য কিছুই নাই, কেবল কি অপরাধে আমাকে সঙ্গছাড়া করিয়া চারিধামে পাঠাইতেছেন, দয়া করিয়া একটু বলিলে আমি নিশ্চিন্তমনে চলিয়া যাই।

বাবাজী। বেটা! অপরাধ করিবে তোমরা, আর আমি কি না স্মরণ করাইয়া দিব! তোমার নিজের স্মরণ নাই ?

ফণী তখন বাল্যাবধি যত কিছু পাপ অপরাধের কার্য্য করিয়াছিল, একে একে বলিতে লাগিলে ইনি বলিলেন—"ও সমস্ত নয়, আরও কিছু আছে মনে করিয়া দেখ!"

ফণী। আজ্ঞে! বহু চিন্তা করিয়াও ত আর কিছু স্মরণ হইতেছে না!

বাবাজী। আচ্ছা এই পুরীতে তুমি কাহার নিকট আসিয়াছিলে?

ফণী। আজ্ঞে! আপনার নিকট।

বাবাজী। আমার নিকট কেন আসিয়াছিলে?

ফণী। আজ্ঞে! কেন আসিয়াছিলাম জানি না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে আপনার নাম শুনা অবধি মনে ধারণা হইয়াছিল আপনার শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া চিরজীবন শান্তিলাভ করিব।

বাবাজী। সে শান্তি হইতেছে না কেন?

ফণী। আজ্ঞে! আপনি সঙ্গ ছাড়াইয়া দিলে আমি কি করিব?

বাবাজী। বেটা! আমি সঙ্গ ছাড়াইতেছি, না তুই নিজে ছাড়িতেছিস্? মনে করিয়া দেখ দেখি!

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এই সময় ললিতাদাসী প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইল। হঠাৎ ফণীর উপর ঐরূপ শাসনবাক্য শুনিয়া ললিতাদাসী বলিল—"আজ্ঞে! ও ছেলেমানুষ, ওর হয় ত ভুল হইয়া গিয়াছে। আপনিই না হয় বলিয়া দিন যে উহার কি অপরাধ হইয়াছে।"

বাবাজী। আমার সঙ্গে থাকিয়া যখন উহাদের কিছুই হইতেছে না, তখন থাকিবার প্রয়োজন কি?

কথাটী শুনিবামাত্র ফণীর স্মরণ হইল, গদগদকণ্ঠে বলিল—"আজ্ঞে! আগরপাড়ার বাগানে থাকার সময় আমি একদিন ছোট হরিদাসের নিকট এই কথাই বলিয়াছিলাম। যথার্থই আমার ঘোর অপরাধ হইয়াছে, আপনি ক্ষমা করুন", বলিয়া ইঁহার চরণ ধারণপূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিল। ইনি বলিলেন—"যাহা হইয়াছে হউক, যা এখন শ্রীরাধাকান্ত ও নিতাই-গৌরাঙ্গের সম্মুখে গড়াগড়ি দিয়া অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং চিরজীবনের তরে উঁহাদের নিকটে বিকাইয়া যা।

ফণী। আজ্ঞে! আমি ছেলেমানুষ, আমি রাধাকান্ত বা নিতাইগৌর

বুঝি না বা জানি না। দয়া করিয়া আপনি শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়াছেন, যদি কৃপা হয় তবে চিরজীজনের মত অঙ্গীকার করুন, এই প্রার্থনা।

তখন ললিতা দাসী প্রভৃতি সকলেই অনুরোধ করিতে লাগিলে ইনি উঠিয়া গিয়া শ্রীরাধাকান্তের বারান্দায় বসিলেন। এদিকে ফণী রজে গড়াগড়ি দিয়া কাতরস্বরে সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "আমি নিজ বুদ্ধিভ্রমে যত কিছু পাপ, দোষ, অপরাধাদি করিয়াছি, আমার সে সমস্ত ক্ষমা করুন, আমি চিরজীবনের মত আপনার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিলাম।

বালকের আর্ত্তি শুনিয়া সকলেরই হৃদয় দ্রব হইয়া গেল। বাবাজী মহাশয় আবিষ্টভাবে উহার মস্তকে শ্রীচরণ অর্পণপূর্ব্বক বলিলেন—"যা বেটা! আজ হইতে তোকে নিতাইচাঁদ অঙ্গীকার করিলেন।" বলিতে বলিতে চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ হইল—অশ্রু-কম্প, পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারগণ ইঁহার দেহকে ব্যাপৃত করিয়া ফেলিল। বিকম্পিত গদগদস্বরে স্খলিত ভাষায় বলিতে লাগিলেন—"আজ আমার নিতাইচাঁদ খরিদদার হইয়া বসিয়াছেন, যাহার ইচ্ছা হয় বিক্রী হইতে পার।" শুনিয়া মঠের সমস্ত লোক একে একে নিজ নিজ মনোভাব ব্যক্ত করতঃ কাতরপ্রাণে কেহ বা রাধাকান্ত, কেহ বা নিতাই গৌর, কেহ বা বাবাজী মহাশয়ের নিকট চিরজীবনের মত বিক্রী হইতে লাগিল। আহা মরি কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! করুণাময় প্রভুর কৃপায় আজ করুণাসাগর উথলিয়া উঠিল—মঠস্থ আবাল-বৃদ্ধ-যুবা সকলেই কারুণ্যরসে পরিপ্লুত। সকলেরই চোখে জল, ধূলিধূসরিত অঙ্গ, স্খলিত গতি। বাবাজী মহাশয় আবিষ্টভাবে গদগদকণ্ঠে একটি পদ ধরিলেন—

"অদোষদরশী ওহে প্রভু নিত্যানন্দ।
কায়মনে ভজি মোরা তুয়া পদদ্বন্দ্ব॥

মায়া মোহে মুগ্ধ হইয়া আছিনু ভুলিয়া।
কৃপা করি কেশে ধরি আনিলে টানিয়া॥
করম বিপাকে মোরা সদা অপরাধী।
এই সে ভরসা তুমি করুণার নিধি॥
আত্মসুখ স্বতন্ত্রতা ছাড়ি একমনে।
শরণ লইনু তুয়া অভয় চরণে॥
তুয়া পাদপদ্ম বিনু আর নাহি গতি।
অঙ্গীকার কর প্রভু এই সে মিনতি।" ইত্যাদি

সকলেই কাতরকণ্ঠে এই প্রার্থনা গান করিতেছেন, আর নয়নজলে মুখ বুক ভাসিয়া যাইতেছে। কেহ কেহ বাবাজী মহাশয়ের চরণ দুইখানি বক্ষে ধারণ করিয়া বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন। এইরূপ ভাবে বহুক্ষণ কাটিয়া গেলে বাবাজী মহাশয় আশ্বাসবাক্যে সকলকে সান্ত্বনা করতঃ স্বীয় স্বীয় সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য উপদেশ দিয়া নিজে নিত্যকৃত্য করিতে গমন করিলেন।

—০—

শারদীয়া দুর্গাপূজা

একদিন বাবাজী মহাশয় ঝাঁজপীটা মঠের পঙ্গতঘরে নানাজাতীয় ভক্তবৃন্দসহ বসিয়া ভগবৎ-প্রসঙ্গ করিতেছেন, হঠাৎ কি মনে হইল, ভক্তবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা! তোমরা সকলে বল দেখি আজ প্রকৃতির শোভা এত মধুর কেন? আজ যেন তরুলতা প্রফুল্লিত হইয়াছে। আবাল-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান সকলেই যেন কেমন একরূপ মনপ্রাণ মাতান আনন্দসাগরে নিমগ্ন? কারণ কি বল দেখি?"

ভক্তগণ। আজ্ঞে আমরা কি জানি যে বলিব? আপনিই বলুন।

বাবাজী। আজ শারদীয়া দুর্গাপূজার অধিবাস দিন। জগন্মাতা মহামায়া পৃথিবীতে শুভাগমন করিবেন; সুতরাং জগদ্বাসী জীবমাত্রেরই হৃদয়ে আনন্দের উৎস ছুটিতেছে। একেই ত শরৎকালে প্রাকৃতিক শোভার আধিক্য বিশেষ হইয়া থাকে, তাহাতে আবার মা আগমন করিবেন, তাই আনন্দ আর ধরে না।

ভক্তগণ। আচ্ছা রটন্তী বাসন্তী, জগদ্ধাত্রী, শ্যামা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মনসা, শীতলা প্রভৃতি কত ভাবেই ত মা আগমন করেন; কিন্তু সবদিন অপেক্ষা এই দিনে জগদ্বাসী হিন্দু, মুসলমান খৃষ্টান সকলেই আনন্দিত হয় কেন?

বাবাজী। শ্রীরামচন্দ্র অকালে দেবীকে জাগাইয়া রাবণবধের সহায়তা করিবার জন্য এই পূজাটী করিয়াছিলেন। মা জগদম্বার কৃপায় বিজয়া দশমীর দিন রাবণবধ হয়। তাই মহাশত্রু হইলেও বিজয়ার দিনে পরস্পর প্রেমালিঙ্গন, দণ্ডবৎপ্রণতি, আপ্যায়নাদি করিবার প্রথা। অন্যান্য যে সমস্ত দেবীপূজা সে সমস্তই কোন না কোন কামনাসিদ্ধির মানসে অনুষ্ঠিত। যথা—সুরথ রাজা, সমাধি নামক বৈশ্য প্রভৃতির পূজা। আর এইটী হইল শক্তিমানের শক্তিপূজা; সুতরাং এইটী প্রেমের খেলা। কাম্য পূজায় রজস্তমোগুণের ক্রিয়া পশুহিংসাদিও থাকে; কিন্তু এইটি একমাত্র সাত্ত্বিক ভাবের পূজা। পূজাদির মূল সূত্র হইল—

"রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।"

ভক্তগণ। আচ্ছা যখন শক্তিমানের শক্তিপূজা, তখন এত আড়ম্বর কেন? পূর্ণব্রহ্ম সনাতন রামচন্দ্র মাকে একবার আদেশ করিলেই ত তিনি আসিয়া রাবণবধাদি কার্য্য উদ্ধার করিয়া দিতেন?

বাবাজী। ভগবান্ রামচন্দ্র মর্য্যাদাপুরুষোত্তম, তিনি কাহারও

মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে পারেন না। রাবণ এক সময় কোন কারণে ভীত হইয়া কঠোর তপস্যা করে। সেই তপস্যায় জগদম্বা প্রসন্না হইয়া উহাকে বর দিলেন যে—"বৎস রাবণ! আমি তোমাকে এই বর দিতেছি যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার আলয়ে বিধানানুযায়ী আমার পূজা হইবে এবং বিশুদ্ধভাবে আমার মাহাত্ম্যসূচক চণ্ডী পাঠ হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি তোমাকে কোলে করিয়া রাখিব। তোমার জীবন বিনাশ ত দূরের কথা, একটী অঙ্গুলী পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবার কাহারও সাধ্য হইবে না।" তখন রাবণ বৃহস্পতিকে পূজা ও চণ্ডীপাঠে নিযুক্ত করিলেন। এদিকে রামচন্দ্র রাবণবধে উদ্যুক্ত হইয়াই দেখেন যে রাবণ মা জগদম্বার ক্রোড়ে বসিয়া আছে। তখন হতাশপ্রাণে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হইয়া রাবণবধ অসম্ভব, সুতরাং আর সীতার উদ্ধার হইল না ভাবিয়া রোদন করিতে লাগিলে দেবগণ রামচন্দ্রকে অষ্টোত্তর শত নীলপদ্ম দ্বারা মায়ের আরাধনা করিতে বলায়, হনুমান নীলপদ্ম আহরণ করিয়া আনিলেন। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন মহামায়ার পূজা আরম্ভ করিয়া একে একে নীলোৎপল অর্পণ করিতেছেন, ইত্যবসরে কোনও কৌশলী ছদ্মবেশী রাক্ষস অদৃশ্য-ভাবে একটি নীলোৎপল অপহরণ করিয়া লইল। রামচন্দ্র একশত সাতটি নীলপদ্ম অর্পন করিয়া দেখেন আর একটি নাই। কিছুক্ষণ চিন্তার পর মনে ভাবিলেন, "আচ্ছা আমাকে ত সকলে পদ্মপলাশলোচন বলিয়া থাকে; অতএব আমার দক্ষিণ চক্ষুটি মায়ের চরণে অর্পণপূর্ব্বক পদ্মের অভাব পূরণ করি।" এই ভাবিয়া বাণদ্বারা নিজের চক্ষু উৎপাটন করিতে উদ্যত হইলেন! এদিকে হনুমান মক্ষিকারূপ ধারণ করতঃ বৃহস্পতির চণ্ডী পাঠ অশুদ্ধ করিয়া দেওয়ায় জগদম্বা রাবণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রুতগতি আসিয়া রামচন্দ্রের হস্ত ধারণ করতঃ বলিতে লাগিলেন—"প্রভু! দাসীর বাক্য রক্ষা করিবার জন্য এত ব্যস্ত হইবার কি প্রয়োজন ছিল?

আদেশ করিলেই ত হইত! আমি যে রাবণকে বাৎসল্য করি সেও ত আপনারই সম্বন্ধে; সুতরাং আপনার রাবণবধ লীলা সম্পন্ন হইলে উহারা যখন গিয়া আপনার বৈকুণ্ঠের দ্বারে জয় বিজয় রূপে অবস্থান করিবে, আমি তখন উহাদিগকে কোলে লইয়া মনের সাধ মিটাইব। এখন আপনার রাবণকে আপনি নিধন করুন। তবে আমার একটী প্রার্থনা যে দাসীর বাক্য রক্ষার জন্য আপনি এই যে প্রেমের খেলাটি খেলিলেন, মর্ত্তলোকে এইটী বিশেষভাবে প্রচার লাভ করুক। আর আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, আপনার অনুগ্রহ রূপ এই পূজাটী যে স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে, তাহার অষ্টক্রোশ ব্যবধান পর্যন্ত স্থাবর, জঙ্গম, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদিকেও আমি আনন্দরসে নিমগ্ন করিব। কাজেই সকল পূজা হইতে এই শরৎকালীন মহাপূজার প্রাধান্য।

ইত্যাদি নানারূপ প্রসঙ্গের পর ললিতাদাসীকে আদেশ করিলেন, —"দেখ, আগামীকল্য হইতে জগদম্বার পূজা করিতে হইবে, সকল বন্দোবস্ত কর।"

ললিতা। আজ্ঞে! কি অবলম্বনে পূজা হইবে?

বাবাজী। চিত্রপট এবং ঘটে।

ললিতা। কে পূজা করিবে?

বাবাজী। সকলেই মায়ের সন্তান, যাহাকে তিনি অঙ্গীকার করিবেন সেই করিবে।

ললিতা। কি কি আয়োজন করিতে হইবে? অর্থাৎ মায়ের পূজায় কি কি লাগিবে?

বাবাজী। মায়ের পূজায় কি কি লাগিবে তাহা আর আমি কি বলিব? তবে অনুরাগমাখান প্রাণ, মন, আত্মত্যাগ, অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্তির

লোভ, আত্মসুখ-বিবর্জ্জিত কাম অর্থাৎ প্রেম, কৃষ্ণপ্রাপ্তির উৎকণ্ঠা, নিষ্ঠা, ভক্তি, বিশ্বাস প্রভৃতি আরাধনার অবশ্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি দ্রব্য ত চাইই; তৎপর তুলসী, বিল্বপত্র, আম্রশাখা, ফুল চন্দন, দূর্ব্বা, আতপ চাউল, কদলী এবং অন্যান্য ফলমূল ও মিষ্টদ্রব্য। মোট কথা— কৃষ্ণপদে সেবা, ভক্তি, রতি, মতি কামনায় মাকে যত প্রকার উপহার দিবার বাসনা থাকে দিতে পার, কোন বিধি-বিধান জানিবার আবশ্যকতা নাই।

একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য অন্য দেবদেবীর উপাসনা করিবার প্রয়োজন কি? একমাত্র কৃষ্ণ-উপাসনা করিলেই ত সিদ্ধি হইতে পারে?

বাবাজী। বাবা! অন্যান্য দেবতা সম্বন্ধে একথা সম্ভবপর হইলেও হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা ঐশ্বর্য্যগন্ধহীন রসময় ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ-প্রাপ্তিকামী, তাঁহাদিগকে যাবতীয় দেবদেবীর পূজা করিয়া সকলের কৃপা গ্রহণ করিতে হইবে। বিশেষতঃ যাঁহারা মধুর ভাবের উপাসক তাঁহাদের ত কথাই নাই। প্রাকৃত রাজ্যে কন্যা পিতামাতা ভিন্ন অন্য কিছুই জানে না। উপযুক্ত সময় হইলে তাঁহারাই যোগ্য পাত্রের হস্তে অর্পণপূর্ব্বক কন্যাকে চিরজীবনের মত স্বামীর চরণে আত্মসমর্পণ করতঃ তাঁহারাই প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সুখে কাল যাপন করিবার উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। এই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহারা স্বতন্ত্রভাবে পতির অন্বেষণ করিতে যায় তাহাদের পক্ষে যোগ্য পাত্র পাওয়া সুকঠিন হইয়া পড়ে এবং সমাজে স্বতন্ত্র বলিয়া স্ত্রীজাতির মধ্যে নিন্দনীয়া হইয়া থাকে। প্রাকৃত রাজ্যে যদি বা কিঞ্চিৎ সম্ভবপর হইলেও হইতে পারে; কিন্তু অপ্রাকৃত চিন্ময় রাজ্যে যোগমায়ার কৃপা ভিন্ন কোন মতেই অভীষ্টলাভ হইতে পারিবে না। তাই কন্যকা গোপীগণ কাত্যায়নী-ব্রত

এবং গোপেশ্বরের আরাধনা করিয়া কৃষ্ণকে পতিভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ ভাবে অনেক কথাবার্ত্তার পর ভক্তগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ইনিও নিজ নিত্যকৃত্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

পরদিবস প্রাতঃকাল হইতেই মায়ের পূজার আয়োজন হইতে লাগিল। আশ্রমবাসীগণের মানসিক অভিপ্রায় বুঝিয়াই যেন অন্তর্য্যামী বাবাজী মহাশয় নিজে মায়ের আরাধনাকার্য্যে ব্রতী হইলেন। আনন্দের আর সীমা নাই। প্রথমে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। পরে দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। মায়ের সম্মুখে খোল করতাল যোগে গগনভেদী স্বরে "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম" এই নাম হইতে লাগিল। মায়ের স্নান, পূজা, ধ্যান প্রভৃতি যাবতীয় মন্ত্রেরই উদ্দেশ্য কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তি। সর্ব্বপ্রথমে শালগ্রামের পূজা করিয়া আতপ তণ্ডুল ব্যতীত যাবতীয় উপহার তাঁহাকে নিবেদন করা হইল। তৎপরে সেই মহাপ্রসাদ দেবীকে অর্পণ করিলেন। এইরূপে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী পূজা শেষ করিয়া দশমীর দিবস সামান্য ভাবে মায়ের পূজা করতঃ কাতরপ্রাণে অনেকপ্রকার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বেলা অনুমান চারিটার সময় ইনি অগ্রে অগ্রে শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে গমন করিলেন, আর তৎপশ্চাৎ একজন দেবীর চিত্রপট, একজন ঘট, একজন পূজার নির্ম্মাল্যাদি লইয়া যাইতে লাগিল। অপর সকলে খোল করতাল যোগে নাম করিতে করিতে সমুদ্রের তীরে গমনপূর্ব্বক, মাকে তীর্থরাজের জল স্পর্শ করাইলেন এবং অন্যান্য দ্রব্যসকল জলে নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার নাম করিতে করিতে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

—০—

শ্রীবৃন্দাবনে প্লেগ

নানাবিধ লীলা-প্রসঙ্গে পরমানন্দে দিনের পর দিন—মাসের পর মাস যাইতে লাগিল। ফাল্গুন মাসে একদিন অপরাহ্ণ সময়ে বাবাজী মহাশয় বাহিরে একখানি চৌকির উপরে বসিয়া আছেন, চারিদিকে বহু ভক্তবৃন্দ ভগবৎলীলা-সম্বন্ধীয় নানা কথা প্রশ্ন করিতেছেন, ইনিও হাসি-মুখে প্রত্যুত্তর দিতেছেন, হঠাৎ ঠিক বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। মুখে অন্য কোনও বুলি নাই, কেবল "হায় হায়! উদারপ্রাণ আনন্দময়-মূর্ত্তি ব্রজবাসীদিগের কি কষ্ট! কি ভীষণ উৎপীড়ন! কি বীভৎস ব্যাপার! আহা! তাহারা ব্রজভূমির মমতা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরিত হইতেও সমর্থ হইতেছে না, আবার সংক্রামক রোগের অত্যাচারে ব্রজে থাকাও দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। হা কৃষ্ণ! ব্রজবাসী-বল্লভ! তোমার ব্রজে এতাদৃশ অত্যাচার হইতেছে, আর তুমি নিশ্চিন্ত রহিয়াছ! ব্রজবাসীগণ দারুণ রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে! তুমি কি একবারও দেখিতেছ না? তাহাদের প্রাণ যায় সেও স্বীকার তবু তোমার নিত্যলীলা-বিলাসভূমি ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে রাজি নয়। এ সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াও কি তোমার প্রাণ কাঁদে না?" উপস্থিত ভক্তগণ ইঁহার ঐরূপ ব্যাকুলতা দেখিয়া বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ্ঞে! শ্রীবৃন্দাবনে কি হইয়াছে?

বাবাজী। প্রায় একমাসের অধিক হইল বৃন্দাবনে দারুন প্লেগ রোগের অত্যাচারে বহু লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে বা করিয়াছে। বহু বহু নিষ্ঠাবান্ ভক্ত ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন ও করিতেছেন।

ইত্যাদি নানা কথাবার্ত্তায় সে দিন কাটিয়া গেল, পরদিবস বৃন্দাবন কুসুম সরোবর হইতে শ্যাম দাদা একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রখানির

মর্ম্ম এই—"জয় নিতাই! বৃন্দাবনে ভয়ানক প্লেগের প্রাদুর্ভাব আরম্ভ হইয়াছে। ব্রজবাসী অপেক্ষা ব্রজমায়ীগণ অধিক পরিমাণে দেহ রাখিতে-ছেন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সর্ব্বদার তরে সশঙ্কিত। আপনার প্রিয় অনেক ব্রজবাসীগণ প্লেগের ভয়ে কাতর হইয়া গোবর্দ্ধন হইতে কুসুম সরোবরে আমার নিকট আসিয়া রহিয়াছেন। বনমালী বাবু সপরিবারে বিনোদ বিনোদিনীকে লইয়া কলিকাতায় গমন করিয়াছেন এবং প্রভুপাদ রাধিকানাথ গোস্বামী, হরিচরণ দাস বাবাজী, ছোট নিত্যানন্দ দাস বাবাজী, রসিক দাস বাবাজী প্রভৃতিও তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছেন। কুসুম সরোবরে এখনও কোন উৎপীড়ন হয় নাই। এ সময় আমার কি কর্ত্তব্য লিখিয়া জানাইবেন। ইতি।"

পত্রখানিতে ব্রজবাসী দিগের দুঃখের কথা পাঠ করিয়া বাবাজী মহাশয় কাতরভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ স্থিরতালাভ করিয়া নিজহস্তে শ্যামদাদাকে একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রখানির মর্ম্ম এই,—"জয় নিতাই! ভাই শ্যামদাস! তোমার পত্র পাইলাম। এইটী প্লেগ বলিয়া মনে করিও না; শ্রীরাধারাণীর পরীক্ষামাত্র জানিবে। ইহাতে ব্রজবাসনিষ্ঠ ভক্তদিগের ব্রজধামের প্রতি মমতা অধিক কি নিজ দেহের প্রতি মমতা অধিক তাহাই পরীক্ষা করিবেন। যাক্, তুমি কুসুম সরোবর ছাড়িয়া কোথাও যাইবে না। ত্রিসন্ধ্যা ব্রজবাসী-দিগকে সঙ্গে লইয়া নাম-কীর্ত্তন করিবে। কোনই ভয় নাই, প্লেগ তোমাদের কাছে যাইতে পারিবে না। সুবিধা হয় ত রথযাত্রার পূর্ব্বে একবার শ্রীধামপুরী আসিতে চেষ্টা করিবে। মাঝে মাঝে সংবাদ দিও।" ইত্যাদি। পত্রখানি পাইয়া শ্যামদাদার মনে সৎসাহসের সঞ্চার হইল এবং ইঁহার আদেশানুরূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন।

শুভ জন্মোৎসব

আজ আশ্রমবাসী ভক্তবৃন্দের মনে আনন্দ আর ধরে না—সকলেই বিভোর। সকলেই নিজ নিজ সেবার কার্য্য করিতেছেন; কিন্তু ইঁহাদের মনপ্রাণ যেন কোনও মহান্ ব্যাপারে নিমগ্ন। কয়েক মাস হইতে প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সস্ত্রীক শ্রীধাম পুরী বাস করিতেছেন। যদিও প্রভুর থাকিবার স্থান প্রাণবল্লভ মঠে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু তিনি নামমাত্র তথায় থাকেন, প্রায় সর্ব্বদা বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে ঝাঁজপীটা মঠে থাকিয়া নানারূপলীলারস-প্রসঙ্গে আপামর সাধারণকে আনন্দ-রসে পরিপ্লুত করিতেছেন। সন ১৩১১ সালের ২৭ শে চৈত্র বেলা আন্দাজ আটটার সময় প্রভুপাদ ঝাঁজপীটা মঠে আগমন করিয়া দেখেন যে বাবাজী মহাশয় শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনে গিয়াছেন। আশ্রমবাসী ভক্তগণ একত্র বসিয়া কি যেন পরামর্শ করিতেছেন, আর আনন্দ সাগরে ভাসিয়া যাইতেছেন। প্রভুপাদের দর্শন পাইবামাত্র শশব্যস্তে আসন প্রদানপূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ সকলে নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের তাদৃশ অবস্থা-দর্শনে প্রভুপাদ বলিলেন,—"তোমরা যেন কোনও আনন্দময় ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিলে বলিয়া মনে হয়। আমার আসাতে কোনরূপ ব্যাঘাত হইল কি?"

ললিতা। আজ্ঞে! ব্যাঘাত কিছুই নয়।

প্রভু। যদি ব্যাঘাতই না হইয়া থাকে, তবে আনন্দের ঘটনাটী শুনিয়া আমি কিছু অংশীদার হইতে পারি না কি?

ললিতা। আজ্ঞে! আপনাকে বলিতে কোনই আপত্তি নাই, তবে আপাততঃ বাবাজী মহাশয়ের কর্ণগোচর হইলে পাছে বাধা পড়ে এই ভয়।

প্রভু। তা বেশ, আমি না হয় বাবাজী মহাশয়কে নাই বলিব; মোটকথা—যদি সকলের আনন্দপ্রদ শুভ কার্য্য হয় তবে যাহাতে তাহার কোনও বাধা না হইতে পারে সে ভার আমার উপর রহিল।

প্রভুপাদের অভয়বাণীতে সকলেই আনন্দোৎফুল্লচিত্তে "জয় নিতাই বলিয়া উচ্চধ্বনি করিতে লাগিলেন।

ললিতা। আজ্ঞে! আমরা বহুদিন হইতে অনেক রকম যত্ন চেষ্টা করিয়াও যাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই নাই, আপনাদের কৃপায় অযাচিতভাবে সেই আশালতার ফল ফলিয়াছে। আমরা এবার বাবাজী মহাশয়ের জন্মোৎসব করিব মনস্থ করিয়াছি।

প্রভু। এ ত বেশ ভাল কার্য্য, ইহাতে কাহারও ত আপত্তি হইবার কথা নয়! এতদিন এ উৎসব করা হয় নাই কেন?

ললিতা। আজ্ঞে! এতদিন আমরা তিথি-নক্ষত্র সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

প্রভু। এবার সংগ্রহ হইল কিরূপে?

ললিতা। আজ্ঞে! সে এক আশ্চর্য্য ঘটনা! গত পরশ্ব তারিখে কাশীধামের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী মহাত্মা "কড়ার স্বামী" আসিয়া উপস্থিত হইলে বাবাজী মহাশয় উঁহার সহিত নানারূপভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন। আমি ঠাকুরদের ভোগ রান্না করিতেছি। আর অন্তরালে থাকিয়া এক একবার ইঁহাদের আলাপ-ব্যবহার শুনিতেছি। হঠাৎ ইনি স্বামীজীকে বলিলেন—"আপনি নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করিতে পারেন কি?"

স্বামীজী। "স্বচ্ছন্দে, এ ত অতি অল্প-কথা" বলিয়া ইঁহার দক্ষিণ হস্তখানির রেখা দেখিতে লাগিলেন। আমি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকার দরুণ সে স্থানে উপস্থিত হইতে না পারায় স্বামীজী কি বলেন শুনিবার জন্য এই গোবর্দ্ধনদাসকে সেস্থানে পাঠাইলাম। স্বামীজী প্রায় একঘণ্টা সময়

ইঁহার হাতের রেখা গণনা করতঃ জন্মমাস, তিথি, নক্ষত্র, বার, লগ্নাদি এবং অতীত বিশেষ বিশেষ কয়েকটী ঘটনা প্রকাশ করিয়া ইঁহার বিশেষ বিশ্বাসভাজন হইলেন। বালক গোবর্দ্ধন সেইস্থানে দাঁড়াইয়া আমূল-বৃত্তান্ত শুনিতেছে দেখিয়া আমি নিশ্চিন্তমনে রান্নার কার্য্য করিতেছিলাম। কিছু-ক্ষণ পরে স্বামীজী এবং বাবাজী মহাশয় উভয়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনে গমন করিলেন। আমি হৃষ্টচিত্তে গোবর্দ্ধনকে ডাকিয়া জন্ম-বিবরণ জিজ্ঞাসা করায় বালক বলিল—"দিদি! আমি সমস্তই শুনিয়াছি; কিন্তু একটী বর্ণও আমার মনে নাই।" শুনিয়া আমি ব্যথিতহৃদয়ে ভাবিতে লাগিলাম—"হায় রে! আমি হাতে পাইয়া অভীষ্টবস্তু নিজবুদ্ধির দোষে হারাইলাম। কোনও বয়স্থ লোককে না পাঠাইয়া, উহাকে পাঠাইলাম! উহার দোষ কি? একে বালক তাহাতে উড়িষ্যাবাসী, ও ত বাঙ্গলা ভাষায় সেরূপ অভিজ্ঞ নয়।" এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময় বাবাজী মহাশয় আগমন করিলে আমি উৎকণ্ঠিতচিত্তে ইঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম—"স্বামীজী কোথায় গেলেন?" উদ্দেশ্য যে কোনও লোকদ্বারা তাঁহার নিকট হইতে আমার অভীষ্ট-বস্তু সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিব। উত্তরে ইনি বলিলেন—"তিনি বারটার ট্রেণে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।" শুনিয়া মনের দুঃখ মনেই গোপন করিলাম। আরও ভাবিলাম বোধ হয় এখনও ঐ আনন্দ পাইবার অধিকারী আমরা হই নাই। দেখা যাক্ প্রভুর কি ইচ্ছা!

সুখে-দুঃখে সেদিন কাটিয়া গেল। তৎপরদিন অর্থাৎ গতকল্য অতি প্রত্যুষে বাবাজী মহাশয় মুখ ধুইতেছেন; জল এবং অন্যান্য উপকরণ হস্তে আমি সেইস্থানে উপস্থিত। আরও অনেকেই সেখানে রহিয়াছেন; হঠাৎ আমার মনের মধ্যে একটী কৌশল স্ফূর্ত্তি হওয়ায় আমি একটু অবজ্ঞাভরে বলিলাম—"জ্যোতিষ শাস্ত্রটা কিছুই নয়, আমি ত উহার একটী অক্ষরও বিশ্বাস করি না। জ্যোতিষ-ব্যবসায়ীগণ কেবল কতকগুলি

মুখস্থ গল্প বলিয়া লোকের বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা করেন ; তবে দশটা বলিতে বলিতে হয় ত কোন একটা ঠিক হইয়া যায় মাত্র।” বাবাজী মহাশয়ের স্বভাব যে কখন কাহারও নিন্দা শুনিতে পারেন না। আজ নিজগণের মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ শাস্ত্রের নিন্দা শুনিয়া একটু ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন—“তুমি কি করিয়া জানিলে যে জ্যোতিষ-শাস্ত্র মিথ্যা ?”

আমি। কৈ কাহারও কোন কথা প্রায় সত্য হইতে দেখি না !

বাবাজী। যে শাস্ত্র জানে না তাহার কথার উপর নির্ভর করিয়া কোন শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা করা নিতান্ত মূঢ়তা। তুমি কোনও ভাল জ্যোতিষীর সহিত আলাপ করিয়াছ কি ? এই যে কাল স্বামীজী আসিয়াছিলেন, উঁহার কোন কথায় যদি ভুল ধরিতে পার তবে ত বুঝি।

আমি। আজ্ঞে ! ভবিষ্যৎ ঘটনা সত্য-মিথ্যা আমি কি করিয়া ধরিব ? তিনি হয় ত হাত দেখিয়া বলিলেন—“আপনার এত বৎসর বয়সে শনিগ্রহের কোপ হইবে, এতদিনে শরীর অসুস্থ হইবে, এত বৎসরের সময় খুব ধনবান্ হইবেন” ইত্যাদি বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। এখন তত বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তবে ত তাঁহার বাক্যের সত্যতা প্রতিপন্ন করিব ? প্রত্যক্ষ অথচ অতীত ঘটনা যদি বলিতে পারেন তবে ত বুঝি !

বাবাজী। তোমাদের কতকগুলি ভুল ধারণা আছে, যাহার বলে তোমরা বিশেষভাবে অনুসন্ধান না করিয়াই একটা সিদ্ধান্ত করিয়া ফেল। এই স্বামীজী আমার নিজের সম্বন্ধে কাল যে সমস্ত অতীত এবং প্রত্যক্ষ ঘটনা বলিলেন তাহার মধ্যে একটীও ত মিথ্যা নয় ! তবে কি করিয়া শাস্ত্র মিথ্যা বলিব ?

আমি। আচ্ছা, আপনার জন্ম সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিলেন—সে সমস্তই কি সত্য বলিয়া আপনার বিশ্বাস হইয়াছে ?

বাবাজী। হ্যাঁ, হইয়াছে বৈ কি? একেবারে যথাযথরূপে একে এক চৈত্র-সংক্রান্তি, ত্রয়োদশী-তিথি, বৃহস্পতিবার, পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র, সিংহ লগ্ন ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিলেন।

আমি। আপনার কি ঐ সমস্ত মনে ছিল যে আপনি সত্য বলিয়া মানিলেন?

বাবাজী। আমার কোষ্ঠীর অন্য কোনও কথা সেরূপ স্মরণ নাই; কিন্তু জন্মতিথি নক্ষত্রাদি সমস্তই আমার মনে আছে। এমন কি উষাকালে জন্ম এটী পর্য্যন্তও স্বামীজী বলিলেন।

কৌশলে অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হওয়ায় আমার হৃদয়ের ভাব আর গোপন করিতে না পারিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া ফেলিলাম। তখন ইনি আমার চাতুরী অবগত হইয়া নানারূপ প্রতারণাবাক্যে যথার্থ ঘটনা চাপা দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলে আমি বলিলাম—"দেখুন! উদিত সূর্য্যকে হস্তদ্বারা আচ্ছাদন করিবার প্রয়াস পাওয়ার প্রয়োজন কি? যখন তিথি পাওয়া গিয়াছে তখন আমরা না করিলেও কেহ না কেহ ঐ তিথির আরাধনা করিবেই করিবে। সে বিষয়ে বাধা দিতে চেষ্টা করিলে আর কি হইবে?" ইত্যাদি নানা কথোপকথনের পর বাবাজী মহাশয় আর কোনও উত্তর না করিয়া নীরবে নিজ নিত্যকৃত্য করিতে লাগিলেন। এবার সংক্রান্তি উনত্রিশে হইয়াছে; সুতরাং দুইটী দিন মাত্র বাকী, কিরূপ কি হইবে আপনিই জানেন।

প্রভু। বড়ই আনন্দের বিষয়। উপস্থিত ব্যাপারটিতে আমার হৃদয়ে যে কি জাতীয় উৎসাহ হইয়াছে তাহা বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। আমি বাসায় গিয়া আমার স্ত্রীকে এ সংবাদ জানাইতেছি, তিনিও যতদূর সাধ্য এই শুভকার্য্যে যোগদান করিবেন।

এই বলিয়া বাসায় গমন করতঃ উঁহার স্ত্রীর নিকট আমূল বৃত্তান্ত

প্রকাশ করিলেন। বাৎসল্যরসের প্রতিমূর্ত্তি মা গোস্বামিনী যেন আনন্দে আত্মহারা। অবশিষ্ট দুইটী দিন যেন উঁহার নিকট যুগসম বোধ হইতে লাগিল। অপরাহ্ণ সময়ে একবার মঠে আসিয়া তৈল, হরিদ্রা, নূতন-ঘট প্রভৃতি যে যে বস্তু বিশেষ প্রয়োজনীয়, ললিতাদাসীকে সেই সমস্ত যোগাড় করিতে বলিয়া উপস্থিত শুভকার্য্যে বিশেষ সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন। আরও বলিলেন—"তোমরা নিশ্চিন্তমনে আনন্দ কর, নিঃসঙ্কোচে মনের মধ্যে যাহা যাহা উদয় হইবে সংগ্রহ কর। মোট কথা—বাবাজী মহাশয় বলিয়া তোমাদের কোনও আশঙ্কা করিতে হইবে না, সে ভার আমার উপর।" মা গোস্বামিনীর তাদৃশী অভয় বাণী শ্রবণে সকলেই পরম প্রীতি লাভ করিলেন। যথাসময়ে মা গোস্বামিনী চলিয়া গেলেন; কিন্তু প্রভুপাদ বাবাজী মহাশয়ের দর্শনমানসে আশ্রমেই রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে বাবাজী মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলে উভয়েই উভয়ের মিলনসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

২৮শে চৈত্র বুধবার প্রাতঃকাল হইতেই আশ্রমবাসীগণ বিশেষ ব্যস্ত। প্রভুপাদও উপস্থিত আছেন। বাজার হইতে নানারূপ দ্রব্যাদি আসিতেছে। বলরামবাবুকে ডাকাইয়া জগন্নাথদেবের ভোগের জন্য একশত টাকার ব্যবস্থা করা হইল। ললিতাদাসীর অভিপ্রায়-অনুরূপ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য শ্রীমান্ নন্দকিশোর দাস এবং কৃষ্ণদাস ইঁহারা দুইজন প্রায় সর্ব্বদার তরেই বাজারে বা অন্যান্যস্থানে যাতায়াত করিতেছে; সুতরাং সে দিন আর বাবাজী মহাশয়ের সহিত উহাদের সাক্ষাৎ করা বা কাছে বসা হয় নাই। হঠাৎ একবার বাবাজী মহাশয় নন্দকে দেখিয়া বলিলেন—"কি রে নন্দ! তোদের যে দেখাই নাই! মঠের সকলেই যেন কি এক মহাব্যাপারে ব্যাপৃত মনে হইতেছে। কারণ কি বল্ দেখি?" নন্দ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই প্রভুপাদ বলিয়া উঠিলেন—

"তাই বটে, আশ্রমের প্রাকৃতিক শোভা দর্শনে আমার বোধ হইতেছে যেন আশ্রমস্থ স্থাবর, জঙ্গম, পশু, পক্ষী পর্য্যন্ত কোনও একটী অপ্রাকৃত চিন্ময় আনন্দে নিমগ্ন হইতেছে। বলিতে কি, আশ্রমে প্রবেশ করিবামাত্র অবিতর্কিত ভাবে হৃদয় আনন্দে উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে। যাহারই মুখপানে তাকাইতেছি যেন বিকশিত কুসুমের ন্যায় একটী বিমল আনন্দের ছবি দেখিতেছি। আশ্রমের প্রতি রেণুতে রেণুতে যেন আনন্দের উৎস ছুটিতেছে। অকস্মাৎ এইরূপ আনন্দময় মহান্ ব্যাপারের কারণ কি আপনিই জানেন।"

বাবাজী। আমি ত ভাবিয়া অন্য কোনও কিছু স্থির করিতে পারি নাই, তবে মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন ভক্তপ্রবর মহাবীরের জন্মদিন; যদি সেই উপলক্ষে ইহারা কোনও উৎসবের যোগাড় করিয়া থাকে—জানি না।

প্রভুপাদ একটু শ্লেষভাবে কথাটার অন্যার্থ করিয়া বলিলেন—"যথার্থই ত আগামী কল্য অপ্রাকৃত বলে বলীয়ান্, বৈষ্ণবচূড়ামণি মহাবীরের জন্মোৎসবই ত বটে! তবে এ মহামহোৎসবে যোগ দিতে ত কাহারও আপত্তি হইতে পারে না।"

বাবাজী। ভক্তি-বিশ্বাসগত না হইলেও স্বভাবেতে আমরাও প্রায় তদ্‌জাতীয়ই বটে। (নন্দকে লক্ষ্য করিয়া) কোন নূতন বস্ত্রাদিরও যোগাড় হইতেছে বলিয়া বোধ হয়!

ললিতা। আপনি কিরূপে জানিলেন?

বাবাজী। কেন, ইহারা হাতে করিয়া বাজার হইতে আনিতেছিল দেখিলাম! যাহা হউক, আমার এই কথা—যদি হনুমানকে নূতন বস্ত্রাদি পরাইতে অভিপ্রায় থাকে, তবে সর্ব্বাগ্রে আশ্রমস্থ যাবতীয় ভগবদ্বিগ্রহকে নববস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া উঁহাদের ভোগরাগের

বিশেষভাবে বন্দোবস্ত করা চাই। আর একটী কথা—প্রভুপাদ রঘুনাথদেব গোস্বামীর নিকট হইতে যে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীর শ্রীমূর্ত্তি আগমন করিয়াছেন, আগামী কল্য তাঁহাদের মহাভিষেক করিতে হইবে। সে বিষয়ে যাহা যাহা প্রয়োজন সমস্ত সংগ্রহ করা চাই।

ললিতা। আজ্ঞে! কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে?

বাবাজী। বিশেষ কিছুই নয়, নূতন কাপড়, পঞ্চামৃত, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চতীর্থোদক, পঞ্চবর্ণের গুঁড়া প্রভৃতি যোগাড় করা চাই; আর ভোগের কিছু বিশেষ বন্দোবস্ত করিলেই হইবে।

ললিতা। আজ্ঞে! অভিষেক কে করিবে?

বাবাজী। আমি নিজ হাতেই করিব মনস্থ করিয়াছি।

বাবাজী মহাশয়ের কথা শুনিয়া ললিতাদাসীর মনে আতঙ্ক হইল যে, সকাল হইতে ইনি যদি ঐরূপ বিধিবিধানের মধ্যে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে ত আর আমাদের আশা পূর্ণ হয় না; যাউক, যাহাতে অন্যের দ্বারা ঐ কার্য্যটী সম্পন্ন করিতে পারি সেই চেষ্টা করিতে হইবে। এই ভাবিয়া প্রকাশ্যে ইহাঁকে বলিল—"দেখুন! আমার বোধ হয় নিত্যানন্দ দাসের দ্বারা অভিষেক করাইলে ভাল হইবে।"

বাবাজী। সে কি এ সমস্ত কার্য্য করিতে পারিবে?

ললিতা। সে অমন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ! কেন পারিবে না? এ সমস্ত কার্য্যে ত সে বিশেষ পারদর্শী।

বাবাজী। বেশ ত! পারিলে আর আমার আপত্তি কি! তোমরা যথাযথরূপে সমস্ত যোগাড় কর।

ললিতা। (একটু মৃদু হাসিয়া) আচ্ছা, আপনার কৃপা থাকে ত সমস্তই যোগাড় হইয়া যাইবে।

এই বলিয়া নন্দকে ইঙ্গিত করিবামাত্র নন্দ সেইরূপ বন্দোবস্ত

করিতে লাগিল। এদিকে আশ্চর্য্যরূপে সমস্ত অন্তরঙ্গ ভক্তগণের আকর্ষণ হইতে লাগিল। হঠাৎ কটক হইতে রাধাকৃষ্ণদাদা আসিয়া উপস্থিত হইলে বাবাজী মহাশয় উঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হে রাধাকৃষ্ণ! তুমি এ সময় কেন?"

রাধাকৃষ্ণ। আজ্ঞে! কেন যে কিছুই বলিতে পারি না, এমন কি মনেও ভাবি নাই যে এ সময় আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে এখানে আসিব; কিন্তু হঠাৎ এরূপভাবে আকর্ষণ হইতে লাগিল যে আমি যেন ঠিক গ্রহগ্রস্তের ন্যায় অবশভাবে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইলাম।

ইনি একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"তা বেশ। যাও একটু বিশ্রাম কর গিয়া।" এইরূপভাবে কেন্দ্রাপাড়ার শরৎচন্দ্র ঘোষ এবং চারিদিক হইতে বহু বহু ভক্তের আগমন হইতে লাগিল। সকলের মুখেই এক কথা,—"যেন কেমন এক মহা আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় চলিয়া আসিলাম" ইত্যাদি। ঠাকুরদিগের নূতন কাপড় প্রভৃতির যোগাড় হইতে লাগিল। অবসর পাইয়া রাধাকৃষ্ণদাদা ললিতাদাসীর নিকট সমস্ত অবগত হইয়া পরমানন্দিতহৃদয়ে কিরূপ কি করিতে হইবে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ললিতাদাসী নানারূপ ভোগের দ্রব্য প্রস্তুত কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় বাবাজী মহাশয়ের নিকট একেবারেই যাইবার সময় পাইতেছে না। অপরাহ্নকালে বাবাজী মহাশয় শৌচে যাইতেছেন দেখিয়া ইঁহার সেবার জন্য রাধাকৃষ্ণদাদাকে পাঠাইলেন। বাবাজী মহাশয় রাধাকৃষ্ণদাদাকে উহাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"তাহারা নানারূপ ভোগের দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে।" শুনিয়া ইনি বলিলেন—"বেশ কথা!" উহাদিগকে বলিও আমি চলিলাম।" রাধাকৃষ্ণদাদা একটু ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ্ঞে! কখন্ আশ্রমে ফিরিবেন?"

বাবাজী। কখন্ বা কবে ফিরিব ঠিক নাই। ললিতাদাসীকে বলিও, যেরূপভাবে কার্য্য করিতে বলিয়াছি তাহা যেন সুসম্পন্ন হয়। বাবাজী মহাশয়ের কথাটা রাধাকৃষ্ণদাদার মনে বড়ই চিন্তা উৎপাদন করিয়া দিল। তিনি কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইবামাত্র ললিতাদাসীকে যথাযথ বিবরণ জ্ঞাপন করিলে ললিতাদাসী নন্দ প্রভৃতি সকলকে বলিল—"তোমরা সকলে গিয়া বাবাজী মহাশয়কে আটকাও, আমি কড়াটা নামাইয়া যাইতেছি!" নন্দ প্রভৃতি সকলে তাহাই করিল। এদিকে ললিতাদাসী শশব্যস্তে কড়া নামাইয়া ঘর্ম্মাক্তকলেবরে বাবাজী মহাশয়ের নিকট গমনপূর্ব্বক বিশেষ আব্দারের সহিত বলিল "দেখুন, এযাবৎকাল পর্য্যন্ত আমরা আপনার সমস্ত কথা যথাসাধ্য পালন করিয়া আসিতেছি, একদিনের জন্যও কোন আব্দার করি নাই, আজ আমাদের একটি কথা আপনাকে শুনিতে হইবে। আজ রাত্রি হইতে আগামী কল্য পর্য্যন্ত আপনাকে আশ্রমে উপস্থিত থাকিয়া আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিতে হইবে। আমরা যেরূপ বলিব সমস্ত করিতে হইবে। তাহা না হইলে আপনার ঠাকুর-সেবা রহিল, আমরা যেমন স্বতন্ত্রী নরকের কীট তেমনই হইতে চলিলাম।" উঁহার সাশ্রুগদগদ কণ্ঠের এইরূপ কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলেই বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণ ধারণপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলে ইনি একটু মৃদু হাসিয়া "আচ্ছা দেখা যাইবে" বলিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন।

এদিকে সন্ধ্যার পর হইতে আশ্রমবাসীগণ নিজ নিজ মনোভাবানুরূপ নানাবিধ পিঠা পানা প্রভৃতি ভোগের দ্রব্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। রাত্র অনুমান দশটার সময় বাবাজী মহাশয় আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলের মনে আনন্দ আর ধরে না। রাত্রে কাহারই নিদ্রা নাই। রাধাকৃষ্ণদাদার উপরে কীর্ত্তন আকারে

জন্মোৎসব বর্ণনার ভার পড়িল। কতক্ষণে রাত্র শেষ হইয়া সেই অনির্ব্বচনীয় সুখময়ী উষাদেবীর আবির্ভাব হইবে, এই উৎকণ্ঠায় সকলে উদ্‌ব্যস্ত। এক একটি পল যেন ইহাদের পক্ষে প্রহরবৎ মনে হইতেছে। দণ্ডের মধ্যে দশবার দলে দলে বাহিরে আসিয়া আকাশ পানে তাকাইয়া রাত্রি অনুমান করিতেছেন। কেহ কেহ বা মঠের বাহিরে খোলা জায়গায় গিয়া পূর্ব্বদিকে অরুণোদয় হইল কি না, পাখীগণের রব উঠিল কি না, প্রভাতী কুসুমসকল ফুটিল কি না, প্রাতঃস্নানার্থিনী রমণীগণ আপন আপন কৃত্য সারিয়া প্রশস্ত রাস্তায় জুটিল কি না, শিশুগণ স্তন্যপানার্থ মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল কি না, এই সমস্ত লক্ষ্য করতঃ বিফলমনোরথ হইয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। এইরূপে কিছুক্ষণ পরে সকলের উৎকণ্ঠা বশতঃই যেন রজনীদেবী অন্তর্হিতা হইলে ধীরে ধীরে সেই আনন্দময়ী উষাদেবী আবির্ভূতা হইতে লাগিলেন। মা গোস্বামিনীকে সংবাদ দেওয়া হইল।

এদিকে অভিষেকের দ্রব্যাদি স্নানমণ্ডপে নীত হইল। বাৎসল্যময়ী মা গোস্বামিনী আগমনপূর্ব্বক স্নানের সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে বাবাজী মহাশয়কে ডাকিবামাত্র ইনি ঠিক বালকের ন্যায় মা বলিয়া নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন। বাবাজী মহাশয় আজ যেন আর সে বাবাজী মহাশয় নাই—ঠিক বালকের ন্যায়, যে যাহা বলিতেছে অবিচারে তাহাই পালন করিতেছেন। শৌচক্রিয়া সমাধানপূর্ব্বক স্নানবেদীর উপর বসিয়া দন্তধাবন শেষ করিলেন। তখন মা গোস্বামিনী সুগন্ধি তৈলহরিদ্রা হস্তে উপস্থিত হইবামাত্র ইনি তাঁহার শ্রীচরণধূলি গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন,—"মা! অনেক হইয়াছে, অত কষ্ট কেন?" তখন মা গোস্বামিনী প্রফুল্লচিত্তে বলিলেন—"বাবা! সন্তানের মঙ্গলার্থ এ সমস্ত ত মায়ের অবশ্যকর্ত্তব্য এবং আনন্দের বিষয়, ইহাতে আবার কষ্ট কি? আজ যে

আমি এমন যোগ্য সন্তানের মা হইয়া তাহার মঙ্গলার্থ জন্মতিথির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিয়াছি, এটী আমার পরম সৌভাগ্য এবং আমাদের কুলদেবতা শ্রীনিতাইচাঁদের কৃপা।” বলিয়া ইঁহার ললাটে কিঞ্চিৎ তৈলহরিদ্রা মাখাইবামাত্র ললিতাদাসী ও অন্যান্য সকলে মা গোস্বামিনীর হাত হইতে প্রসাদী তৈলহরিদ্রা লইয়া ইঁহার সর্ব্বাঙ্গে মাখাইতে লাগিলেন। অপূর্ব্ব আকর্ষণ! প্রতিবেশী এবং অন্যান্য বহু বহু স্ত্রী-বালক-বৃদ্ধ-যুবা ঠিক চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের ন্যায় অজ্ঞাতসারে মঠে উপস্থিত হইয়া উলুধ্বনি, হরিধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, জয়ধ্বনি প্রভৃতি দ্বারা দশদিক্ মুখরিত করিতে লাগিল। প্রতিবেশিনী রমণীগণ জলপূর্ণ কলসী কক্ষে করিয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছে। এদিকে সুগন্ধি তৈল, হরিদ্রা প্রভৃতি মর্দ্দন শেষ হইলে পঞ্চামৃত, সুগন্ধি চন্দন মিশ্রিত জল পঞ্চতীর্থোদক, গঙ্গোদক এবং অন্যান্য তীর্থোদক দ্বারা স্নান হইতে না হইতেই শত শত জলপূর্ণ কলসী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সকলেই নিঃসঙ্কোচে পরমানন্দিতচিত্তে ইঁহার মস্তকে ঢালিতে লাগিলেন। সেবকগণ প্রথমে অষ্টোত্তরশত কলসী জলে মহাস্নান করাইবেন মনে করিয়াছিলেন এবং সেই ভাবে সংখ্যাও রাখিতেছিলেন, কিন্তু ক্রমে এত জল আসিতে লাগিল যে কাহার সাধ্য সংখ্যা রাখে? চারিদিক হইতে জল ঢালা হইতে লাগিল। ললিতাদাসী নূতন গামছা দ্বারা ইঁহার অঙ্গ মার্জ্জন করিয়া দিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ এইরূপ পরমানন্দে স্নানকেলি হইবার পর ইনি নূতন সূক্ষ্ম শুভ্র গামছা দ্বারা অঙ্গ মুছিয়া পট্ট বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক শ্রীমন্দিরের সম্মুখে আসিয়া ঠাকুরদিগকে এবং মা গোস্বামিনীকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ সেবকগণের প্রার্থনানুসারে ঠিক বালকের ন্যায় গৃহাভ্যন্তরে একখানি সুসজ্জিত আসনে গিয়া বসিলেন। অপূর্ব্ব দৃশ্য! কেহ কেহ কেশর চন্দন কুঙ্কুমাদি দ্বারা নানারূপ সিঙ্গার করিতে লাগিল।

বসিবার গৃহখানি কদলী বৃক্ষ, পূর্ণকুম্ভ এবং আম্রপল্লবাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছে। ঠাকুরমন্দির এবং অন্যান্য গৃহের দ্বারে দ্বারে কদলীবৃক্ষ রোপণ এবং পূর্ণকুম্ভ স্থাপন করিয়া আম্রশাখা পল্লবাদি দ্বারা চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করা হইয়াছে।

মহাপুরুষ বালক আবেশে বসিয়া আছেন, যাহার যেরূপ মনের বাসনা হইতেছে তিনি সেইরূপ সাজাইতেছেন; হঠাৎ বিশ্বম্ভরদাস নামক একটি বাবাজী একখানি রূপার থালায় করিয়া এক জোড়া মটকা কাপড় এবং দুটী প্যাঁচের স্বর্ণাঙ্গুরী আনিয়া ইঁহাকে প্রণাম করতঃ অঙ্গুরী দুইটী বাম হস্তের অনামা ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়ে পরাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভুবন সাউ এবং গোপী সাউ দুইটী অঙ্গুরী আনিয়া কনিষ্ঠা এবং তর্জ্জনী অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিবামাত্র উপস্থিত ভক্তগণ জয় জয় ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। কণ্ঠে নূতন তুলসী কণ্ঠি এবং আজানুলম্বিত ফুলের মালা শোভা পাইতে লাগিল। মস্তকে ফুলের চূড়া প্রভৃতি দ্বারা সেবকদিগের মনের মত সাজান হইল।

পূর্ব্ব হইতেই নানাবিধ ফলমূল, পীঠা, পানা, পুরী, কচুরী প্রভৃতি ঠাকুরের ভোগ দিয়া উক্ত গৃহ সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। অবসর বুঝিয়া ললিতাদাসী সকলকে সিঙ্গার সমাপ্তি করিতে বলিয়া ভোজনে বসিবার জন্য ইঁহাকে অনুরোধ করিবামাত্র ইনি ঠিক বালকের ন্যায় হাসিতে হাসিতে গিয়া ভোজনে বসিলেন। ভক্তগণের মনে আনন্দ আর ধরে না। লীলাময়ের কি বিচিত্র লীলা! যখন যেটী আচরণ করিতেছেন তাহাতেই যেন আনন্দের পাথার বহিয়া যাইতেছে। ভোজন করিতে করিতে এক একটী দ্রব্য এক একজনের হাতে দিতে লাগিলেন। হঠাৎ কি খেয়াল হইল—কোন কোন জিনিস দূরস্থিত এক একজন ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া উর্দ্ধদিকে ফেলিয়া দিবামাত্র তাঁহারা লুফিয়া

লইতে লাগিলেন। ইঁহার ভিতরে এমন একটী ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাইল যে, ইনি যাহাকে লক্ষ্য করিয়া যে বস্তুটি নিক্ষেপ করিতেছেন, ঠিক সে ছাড়া আর কেহই সেই বস্তুটি ধরিতে সমর্থ হইতেছে না। এইরূপ পরমানন্দে কিছুক্ষণ ভোজন-বিলাসরঙ্গ করিয়া আচমন করিলেন। বাহিরে একখানা চৌকির উপর একখানি চেয়ার সুসজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল; ভক্তগণের প্রার্থনানুসারে তাহার উপর আসিয়া বসিবামাত্র একজন পঞ্চপ্রদীপ লইয়া আরত্রিক করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ মনপ্রাণমাতান স্বরে "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম"॥ এই নাম করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। উলুধ্বনি, হরিধ্বনি, জয়ধ্বনি, শঙ্খ, ঘণ্টা, ভেরী, তুরী, ঝাঁজ, খোল, করতাল প্রভৃতির ধ্বনিতে দশদিক্ মুখরিত হইতে লাগিল। দুইপার্শ্বে দুইজন চামর ব্যজন করিতে লাগিল। আরত্রিক সমাপনপূর্ব্বক সকলে সমবেত হইয়া জন্মোৎসব কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রভু রাধাকৃষ্ণদাদার হৃদয়ে প্রেরণা করিয়া যে পদটী স্ফুরণ করাইয়াছিলেন, সেইটী গীত হইতে লাগিল। পদটী এই—

"আজু কিবা অপরূপ মনের উল্লাস॥
পুলকে পূরিত অঙ্গ ভাবের বিকাশ॥
দেখ উষা রসাবেশে করিতে প্রচার।
নিদ্রিতা ধরায় তুলি দিছে সমাচার॥
জীবের বিষাদ-নিশি চিরকাল তরে।
দূরে গেল শুভদিন উদিল অম্বরে॥
নিতাইগৌরাঙ্গ-প্রেমে গঠিত শরীর।
জীবের দুঃখেতে যাঁর চোখে বহে নীর॥

প্রেমাবেশে মাতোয়ারা গর গর ভাব।
নহে সম্বরণ প্রেমে উদ্দণ্ড স্বভাব ॥
নবীনত-সুকুমার কোমল হৃদয়।
পলকে পলকে ভাব তরঙ্গ উদয় ॥
নামের অশেষ শক্তি কীর্ত্তন-প্রভাব।
আচরি শিখান জীবে যেই মহাভাগ ॥
চণ্ডাল যবন ম্লেচ্ছ পামর অশেষ।
(যাঁর) সবারে সমান দয়া নাহি ঘৃণালেশ।
কলিহত পতিত পাষণ্ডী আমা সবে।
উদ্ধারিলা যেই নিজ করুণা-প্রভাবে ॥
চরণ-পরশে যাঁর সুপবিত্র ধরা।
কি কব দয়ার সীমা যার সাক্ষী মোরা ॥
অদোষদরশী যেন দয়াল নিতাই।
জনম লভিলা জয় জয় দাও ভাই ॥
চৈত্রমাসে বৃহস্পতিবারে উষাকালে।
পবিত্রিতে ধরা জন্ম সংক্রান্তি বাসরে ॥
আনন্দে মাতিয়া বল অন্তর বিশ্বাস।
(মোদের) শ্রীগুরু গৌরাঙ্গনিত্যানন্দ পরকাশ ॥
হেন দয়াময় প্রভুর চরণ-কমলে।
না লয় আশ্রয় জীব নিজ কর্ম্মফলে ॥”

এইরূপে বহুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন হইতে লাগিল। সকলেই প্রেমানন্দে মাতোয়ারাভাবে নিঃসঙ্কোচে বাবাজী মহাশয়ের সম্মুখে তাঁহারই গুণগান করিতেছে। একবার মাত্র ইনি ললিতাদাসীকে বলিলেন—“ভগবৎ

নাম, লীলাগুণ পরিত্যাগ করিয়া ও কি গান হইতেছে ? লোকে পাগল বলিবে যে!” ললিতাদাসী একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—“আজ্ঞে! পাগলই বলুক বা যাহাই বলুক আজ আর কেহ কাহারও কথা শুনিবে না। আপনি সম্মুখে রহিয়াছেন। তাহাই কাহারও খেয়াল নাই। অন্যপরে কা কথা ?” ইনি আর কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া গৃহাভ্যন্তরে গমনপূর্ব্বক পালঙ্কে শয়ন করিলেন। ভক্তগণ চারিদিক ঘেরিয়া কেহ হস্ত, কেহ পদ, কেহ কেহ বা সর্ব্বাঙ্গ সম্বাহন করিতে লাগিলেন। আনন্দে আত্মহারা হইয়া কেহ বাতাস করিতেছেন, আর নয়নজলে ভাসিয়া যাইতেছেন।

এদিকে রান্না শেষ হইলে যথাসময়ে ঠাকুরের অন্নভোগ হইয়া গেল। বাবাজী মহাশয় কয়েক মূর্ত্তি অভ্যাগত বৈষ্ণব সঙ্গে লইয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক আচমনান্তে বাহিরে চৌকীর উপর আসিয়া বসিলেন। আহূত এবং অনাহূত বহু বহু লোক মহাপ্রসাদ পাইতেছে। আনন্দের অবধি নাই। চারিদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার। সেবকগণ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতেছেন। আজ আর কেহই পরাঙ্মুখ নহে। দুঃখী কাঙ্গালী প্রভৃতি সকলকেই পরম আদরের সহিত মহাপ্রসাদ সেবা করান হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বাবাজী মহাশয় আজ ঠিক যেন বালকের ন্যায় হইয়াছেন। বেলা অনুমান চারিটার সময় জনৈক ভক্ত একজোড়া পট্টবস্ত্র আনিয়া ইঁহাকে পরাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলে, বাঞ্ছাকল্পতরু একটু মৃদু হাসিয়া তাহার বাঞ্ছা পূর্ণ করতঃ পূর্ব্ববৎ উপবেশন করিলেন। হঠাৎ গদাধরদাস বাবাজী পাঁচটী টাকা বাবাজী মহাশয়ের সম্মুখে রাখিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ একটু ক্ষুব্ধচিত্তে বলিলেন—“পূর্ণচন্দ্রে কলঙ্কের ন্যায় পরমানন্দের মধ্যে একটী বড়ই দুঃখের বিষয়

উপস্থিত হইয়াছে।" শুনিয়া বাবাজী মহাশয় ব্যগ্রভাবে বলিলেন— "কিরে! কি দুঃখের বিষয় হইল বল্ দেখি?"

গদাধর। আজ্ঞে! কি আর বলিব? সে সব হইয়া গিয়াছে, আর বলিলে কি হইবে?

বাবাজী। কেন, বল্ না কি হইয়াছে?

গদাধর। গদাধর রথে, গণেশ মহাপাত্র, ধূলি রথে প্রভৃতি মুক্তি-মণ্ডপে বসিয়া বলাবলি করিতেছিল যে—"বড় বাবাজী সমস্তই করিলেন; কিন্তু একটী কার্য্য ভাল হইল না। রঘুনাথ গোস্বামীর জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা বিগ্রহ আনিয়া একজন বৈষ্ণব দ্বারা কি একটু করিয়া অমনি বসাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ ডাকা নাই, হোম, গায়ত্রী জপ প্রভৃতি কিছুই করা নাই। এটা বড়ই অবিধি।"

বাবাজী। বটে! বৈষ্ণবের উপর কটাক্ষ! আমি জোর করিয়া বলিতেছি, যে কোন বৈষ্ণব যে সে ভাবে যদি একখানা পাথরও বসাইয়া দেন তবে সে কথা বলিবে, আর মুক্তিমণ্ডপস্থ যাবতীয় ব্রাহ্মণগণ হোম, গায়ত্রী জপ করিয়া কি করিতে পারেন, আমি একবার বুঝিব। বৈষ্ণবের উপর কটাক্ষ! তাঁহারা আসিয়া শাস্ত্রদৃষ্টে বিচার করতঃ যদি এই মত স্থাপন করিতে পারেন তবে বুঝিব পণ্ডিত। কি আশ্চর্য্য! নিতাইচাঁদ কত কত মহাপাপী, পতিত পাষণ্ড, নাস্তিক, খৃষ্টান, মদ্যপায়ীদিগের উদ্ধার করিলেন, মতিপরিবর্ত্তন করিলেন, আর এই ব্রাহ্মণ দুইজন এই মঠে থাকিয়া কিছুই গ্রহণ করিতে পারিল না। যাক্, তুমি এখনই উঁহাদিগকে ডাকিয়া আন ত।

বলিবামাত্র গদাধরদাস উহাদিগকে ডাকিয়া আনিলে ইনি একে একে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ ভীতচিত্তে বলিতে লাগিলেন—"দেখুন, আমরা প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া মনে কল্পনা

করিয়াছি। মোট কথা—আমাদের চিত্ত লোভযুক্ত ছিল, সেই স্বার্থের হানি বশতঃই ঐরূপ কথা হইয়াছে।”

বাবাজী। যদি সেইরূপ মনে ছিল, তাহা ত আমাকে বলিলেই হইত।

এই বলিয়া তিনজন ব্রাহ্মণকে তিন জোড়া কাপড় এবং এক একজনকে পাঁচটী করিয়া টাকা প্রণামী দিবামাত্র উঁহারা হৃষ্টচিত্তে—“চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ। হরিভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥ বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচো বরিষ্ঠঃ।” ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে করিতে গমন করিলেন। বাবাজী মহাশয়ও কাম, ক্রোধ, লোভাদি রিপুগণের বশীভূত হইলে মানুষের যে মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত লোপ হইতে পারে বা তাহাদের অসাধ্য কিছুই থাকে না এই বিষয় লইয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দের নিকট নানারূপ সিদ্ধান্ত করিতে লাগিলেন।

এদিকে আশ্রমবাসীগণ অপরাহ্ণ অনুমান সাড়ে পাঁচটার সময় দিনের ব্যাপার শেষ করিয়া আবার রাত্রের বৈষ্ণব-সেবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সমস্ত মঠবাসী বৈষ্ণব ও মহান্তগণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ আসিয়া উপস্থিত হইলে সমস্ত বৈষ্ণবগণকে ডাকান হইল। যথাসময়ে বৈষ্ণবগণ উপস্থিত হইলে পঙ্গত আরম্ভ হইল। বৈষ্ণবগণ শ্রীমহাপ্রসাদের সুঘ্রাণ পাইয়া বলিতে লাগিলেন—“আমরা জন্মাবধি শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু এইরূপ সু-ঘ্রাণ ত আর কখনও অনুভব করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইহার কারণ কি?” তখন শ্রীরাধাকান্ত মঠের অধিকারী শ্রীহরিভজনদাস বাবাজী মহাশয় এবং গঙ্গামাতা মঠের শ্রীবিহারীদাস পূজারীজী সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—“এই ব্যাপারটী আমরাও মনে মনে বিচার করিতেছিলাম। আমাদের বিশ্বাস—

আজিকার ভোগের মধ্যে কিছু বিশেষত্ব আছে।" এই কথা শুনিয়া একমূর্ত্তি প্রাচীন বৈষ্ণব বলিলেন—"আজ্ঞে! ভোগের বস্তুগত কোন বিশেষত্ব ত দৃষ্ট হইতেছে না!" পূজারীজী বলিলেন —"বস্তুগত ভেদ না থাকিলেও ভোগের কালগত বা ভগবদধরগত কোন না কোন বিশেষত্ব নিশ্চয়ই হইয়াছে। ভগবদধরামৃত-লবলেশ সঞ্চারিত না হইলে এরূপ সুঘ্রাণ জন্মিতে পারে না। এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত দেখুন—শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রত্যহই শ্রীজগন্নাথদেবের উপলভোগ অর্থাৎ বল্লভভোগ দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক মন্দির হইতে বাহিরে গমন করেন। একদিন তিনি ভাবাবেশে বিভোর হইয়া উৎকণ্ঠিতভাবে সেবক পাণ্ডার নিকট কৃষ্ণদর্শন প্রার্থনা করায় পাণ্ডা শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে জগমোহনে লইয়া গেলে, মহাপ্রভু জগন্নাথদেবকে সাক্ষাৎ মুরলীবদন ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে দর্শন করিলেন। আনন্দের অবধি নাই। অশ্রু, কম্প, পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দেহকে অধিকার করিয়া ফেলিল। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই মহাপ্রভুর ধৈর্য্যলোপ হইয়া গেল। অতি কষ্টে এবং বহু সন্তর্পণে মহাপ্রভু অর্দ্ধ বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলে সেবক পাণ্ডা উপলভোগের মহাপ্রসাদ আনয়নপূর্ব্বক যৎকিঞ্চিত আস্বাদন করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু এক কণিকা জিহ্বায় স্পর্শ করিবামাত্র ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। অবশেষ প্রসাদ গোবিন্দের আঁচলে রহিল। সন্ধ্যার পরে নিজগণ সঙ্গে বসিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতে করিতে গোবিন্দকে ইঙ্গিত করিবামাত্র গোবিন্দ সেই মহাপ্রসাদ আনিলে মহাপ্রভু সকলকে কণিকা কণিকা প্রদান করিলেন।

প্রসাদের সৌরভ্য মাধুর্য্য করি আস্বাদন।
অলৌকিক আস্বাদে সবার বিস্ময় হইল মন॥

প্রভু কহে এই সব হয় প্রাকৃত দ্রব্য।
ঐক্ষব কর্পূর মরিচ এলাচি লবঙ্গব॥
রসবাস গুড়ত্বক্ আদি যত সব।
প্রাকৃত বস্তুর স্বাদ সভার অনুভব॥
সে সে দ্রব্যে এত স্বাদ গন্ধ লোকাতীত।
আস্বাদ করিয়া দেখ সবার প্রতীত॥
আস্বাদ দূরে রহু গন্ধে মাতে মন।
আপনা বিনা অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মরণ॥
তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধর স্পর্শ হইল।
অধরের গুণ সব ইহা সঞ্চারিল॥
অলৌকিক গন্ধ স্বাদু অন্য বিস্মরণ।
মহামাদক হয় এই কৃষ্ণাধরের গুণ॥

তবেই ভাবিয়া দেখুন, মহাপ্রভু এই ভোগের প্রসাদ পাইয়া থাকেন, কিন্তু সেদিনকার ন্যায় অন্য কোন দিন বলিয়াছেন কি? বা আস্বাদন করিয়াছেন কি? বোধ হয়—না।"

বৃদ্ধ। তবে কি অন্যান্য দিন জগন্নাথ ভোগ গ্রহণ করেন নাই জানিতে হইবে?

পূজারীজী। না, তাহা নহে, তবে সেদিনকার বস্তুগত বা তৎসময়গত একটু বিশেষত্ব ছিল, যাহা দ্বারা জগন্নাথদেব পরম হৃষ্টচিত্তে সেইটীকে গ্রহণ করিয়া নিজ অধরের অমৃত-কণা তাহাতে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। এইটি সর্ব্বক্ষণ সম্পাদিত হয় না। আজও এই ভোগের মধ্যে কোন না কোন বিশেষত্ব ছিল যাহাতে জগন্নাথ পরম প্রীতি-সহকারে গ্রহণ করিয়াছেন।

হরিভজনদাস অধিকারী মহাশয় বলিলেন—"দেখুন, আজ যে

মহাপুরুষের আবির্ভাব দিন তাহাতে জগন্নাথদেব কেন না আনন্দিত হইবেন? কারণ জীব-উদ্ধার কার্য্যটী ভগবানের নিজ কর্ম্ম; সুতরাং সেই কার্য্য যে মহাপুরুষ দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তিনি তাঁহার নিত্য পরিকর বা বিশেষ অন্তরঙ্গ।" ইত্যাদি নানা কথাবার্ত্তার পর পরমানন্দে মহাপ্রসাদ সেবা শেষ করিয়া সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। আশ্রমবাসীগণও নিজ নিজ সেবা-কার্য্য শেষ করতঃ বিশ্রাম করিলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে উঠিয়া সকলে নিজ নিজ সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। বাবাজী মহাশয় স্নানবেদীর উপর উপবেশন করিয়াছেন, ভক্তগণ শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধি তৈল মর্দ্দন করিতে করিতে নানাভাবে ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতেছেন। ইনিও হৃষ্টচিত্তে সুসিদ্ধান্ত দ্বারা সকলের মনস্তুষ্টিবিধান করিতেছেন। এই সময় নগেন দাদা (নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) আসিয়া ইঁহাকে প্রণাম করিবামাত্র ইনি একটু মৃদু হাসিয়া উপহাসছলে বলিলেন—"কি হে নগেন! কাল কত মহামারী ব্যাপার হইয়া গেল, তোমাকে ত দেখি নাই?"

নগেন। আজ্ঞে! আমি সরকারী কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম। আর একটী কথা, কালকের ব্যাপার (জন্মোৎসব)টী কি হিন্দু শাস্ত্রমতে হইল না খৃষ্টানমতে হইল, আমি বুঝিতে পারিলাম না।

বাবাজী। যাহারা সে ব্যাপারের অনুষ্ঠানকারী তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর।

নগেন। আমি তাহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাদের হিন্দুশাস্ত্রমতে জন্মতিথি এবং নক্ষত্র অবলম্বনে উৎসব অর্থাৎ সেই তিথিনক্ষত্রের পূজা হইয়া থাকে, আর খৃষ্টানদের মতে সেই তারিখ ধরিয়া হয়। এইটী যখন তারিখ ধরিয়া হইল তখন আমার মনে বড়ই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।

ললিতা। আচ্ছা, এ সম্বন্ধে অন্য সময়ে আলোচনা করা যাইবে।

বাবাজী। (একটু মৃদু হাসিয়া বিদ্রূপভাবে) বোধ হয় সে কথা বা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত আমরা শুনিবার অধিকারী নহি! বেশ ত, আমি না হয় চোখ কান বন্ধ করিয়া থাকি, তোমাদের যাহা বলিবার বল না কেন।

এই বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করতঃ দুই হস্তে কর্ণ আচ্ছাদন করিবামাত্র সকলে আনন্দে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

ললিতা। আমি কোন শাস্ত্রসিদ্ধান্ত জানি না, তবে আমরা যে ধারণায় কাল উৎসব করিয়াছি তাহাই বলিতে পারি।

নগেন। বেশ, আমিও তাহাই শুনিতে চাই।

ললিতা। ব্যবস্থাপক পূর্ব্বাচার্য্যগণ কেহ কেহ বা জন্মনক্ষত্রের প্রাধান্য করিয়াছেন; কেহ কেহ বা তিথির প্রাধান্য করিয়াছেন; কিন্তু কালকে অর্থাৎ জন্মসময়টীকে সকলেই একবাক্যে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। নব্যস্মৃতিকার শ্রীরঘুনন্দন তৎকালব্যাপী নক্ষত্রযুক্তা তিথি যেদিন হইবে, সেই দিনেই জন্মোৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বৈষ্ণব স্মৃতিকারগণ যেদিনে জন্মতিথির উদয় হইবে, সেই দিনেই উৎসবের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে নক্ষত্রসংযুক্তা হইলে ভালই হইল। অভাবে তিথিকেই ধরিয়াছেন; কিন্তু ইহার মধ্যে যদি কোন নৈমিত্তিক যোগ বা কোনরূপ বিশেষত্ব থাকে তবে সেই বিশেষটিকেই ধরিতে হইবে। অবশ্য রাধাকৃষ্ণ, নিতাইগৌরাঙ্গ, শিবদুর্গা, নৃসিংহ, বামন প্রভৃতির আবির্ভাবদিনে নৈমিত্তিক কোনও বিশেষত্ব না থাকা হেতু নক্ষত্রযুক্তা তিথিকেই ধরা হইয়াছে; কিন্তু এই জন্মদিনটী 'মহাবিষুব সংক্রান্তি'। সুতরাং যাবতীয় তিথি, নক্ষত্র, বার প্রভৃতি আছে, সে সমস্ত হইতে এই মহাবিষুব সংক্রমণটির বিশেষত্ব রাখিতে হইবে। তাহার প্রমাণ দেখা যায়, এই সংক্রান্তিদিনে ভক্তচূড়ামণি মহাবীরের জন্মদিন। অবশ্য কোন

না কোন তিথি নক্ষত্রাদিতে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল ; কিন্তু তাহা না ধরিয়া আচার্য্যগণ সংক্রান্তিকেই প্রধানভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। আর শাস্ত্রও বলিয়াছেন—"নিত্যনৈমিত্তিকয়োর্নৈমিত্তিকস্থৈব শ্রেষ্ঠত্বম্।" তিথিনক্ষত্রাদির যোগ সর্ব্বদা অসম্ভব ; কিন্তু মহাবিষুব সংক্রান্তির কদাচ অভাব হইতে পারিবে না। সুতরাং আমরা ঐ সংক্রান্তিকেই প্রধান করিয়া এই কার্য্য করিয়াছি এবং ভবিষ্যতে করিবার অভিপ্রায়ও রহিয়াছে। এখন তোমাদের যাহা অভিপ্রায় বল।

নগেন। আমি যে নূতনভাবে কোন একটা অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে আসিয়াছি তাহা নয়। কারণ আমি এ বিষয়ে কোনও শাস্ত্রপ্রমাণ জানি না, মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে বলিলাম। এখন যাহা শুনিলাম তাহাতে এখনকার মত মনের সন্দেহ দূর হইল, জানি না ভবিষ্যতে আবার কি হইবে। (বাবাজী মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া) আচ্ছা এ বিষয়ে আপনার মত কি ?

বাবাজী। কোনও ভগবৎসম্বন্ধ লইয়া উৎসব নয়, এ সমস্ত বাজে বাজে লইয়া এত বাদানুবাদ করিবার প্রয়োজন কি ? এসব উৎসবের মধ্যেই গণ্য নহে, করিবারই বা আবশ্যকতা কি ?

ললিতা। আপনি আপনার নিজ সম্বন্ধ লইয়া বলিতে পারেন ; কিন্তু নিরপেক্ষভাবে আমি জিজ্ঞাসা করি—"যদি কাহারও গুরু বা মাতাপিতার উৎসব এইদিনে পড়ে তবে তাহার কর্ত্তব্য কি ? তিথিনক্ষত্র ধরিয়া করিবে, না মহাবিষুব সংক্রান্তি ধরিয়া করিবে ?"

বাবাজী। সে বিষয়ে আমার মতে সংক্রান্তি ধরিয়া করাই যুক্তিসঙ্গত।

এইরূপ নানা কথাপ্রসঙ্গ হইতে লাগিল। এদিকে তৈলমর্দ্দন শেষ হইলে ইনি কেশর, চন্দন, কস্তুরি প্রভৃতি দ্বারা সুবাসিত জলে স্নান

করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ সূক্ষ্ম, শুভ্র গামছা দ্বারা শ্রীঅঙ্গ পরিমার্জিত করিয়া দিতে লাগিলে রসময় কৌতুকাবিষ্ট হইয়া পার্শ্বস্থিত ভক্তগণের মধ্যে একজনকে লক্ষ্য করতঃ জল ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপ জলকেলি হইতে লাগিল। স্নানান্তে ইনি ডোরকৌপীন বহির্ব্বাস চাহিলে শ্রীমান্ নন্দ একযোড়া দেশী ধোলাই করা ধুতি আনিয়া সম্মুখে ধরিল। ইনি বলিলেন—"আজ আবার কেন ?"

নন্দ। আজ্ঞে ! ঠাকুরের প্রসাদী, ঘরে ছিল, ইহা ত আর দোকানে ফেরৎ হইবে না ; সুতরাং আজই পরা হউক।

বাবাজী। (একটু মৃদু হাসিয়া) আজ পয়লা বৈশাখ, বৎসরের প্রথম দিন, আজ নূতন কাপড় পরিলে অন্ততঃ একমাস কাল প্রত্যহ নূতন কাপড় পরা দরকার। একদিন পরিলে কি হইবে ?

নন্দ। (ললিতাদাসীর ইঙ্গিত পাইয়া) আচ্ছা, আপনার অনুগ্রহ থাকে ত সে আর বেশী কথা কি ?

এই বলিয়া কাপড়খানি ইঁহার হাতে দিল, ইনিও ভক্তের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া কাপড় পরিলেন। 'একমাস নূতন কাপড় পরা দরকার' এই কথাটি পরিহাসচ্ছলে বলা হইলেও কার্য্যে পরিণত হইল। ভক্তগণের উৎসাহে প্রত্যহই একযোড়া করিয়া নূতন ধুতিচাদর আসিতে লাগিল। নূতন বস্ত্র ইঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র ইনি পরিধেয় পুরাতন বস্ত্রখানি সম্মুখবর্ত্তী যে কোনও ভাগ্যবানের প্রতি কৃপাদৃষ্টি পতিত হয়, তাহাকেই অর্পণ করেন। আনন্দের অবধি নাই। এইরূপভাবে একমাস পর্য্যন্ত নিত্যই নূতন লীলাখেলায় ভক্তগণ যেন সর্ব্বদা আনন্দসাগরে নিমগ্ন থাকিয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

—*—

রাজর্ষি বনমালীবাবুর পুরী আগমন

জ্যৈষ্ঠমাস বাবাজী মহাশয় একদিন স্নানাহ্নিকাদি শেষ করতঃ বসিয়া আছেন, বেলা অনুমান সাড়ে আটটা, এই সময় বৃন্দাবন হইতে শ্যামদাদা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্যামদাদা দণ্ডবৎ করিবামাত্র বাবাজী মহাশয় উঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক নিজপার্শ্বে বসাইয়া ব্রজের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। শ্যামদাদাও সাশ্রুগদগদ-কণ্ঠে ব্রজবাসীদিগের সুখদুঃখের কথা বর্ণনা করিয়া অবশেষে রাজর্ষি বনমালীবাবুর কথা বলিতে লাগিলেন।

বাবাজী। বনমালী এখন কোথায় ?

শ্যাম। সম্প্রতি কলিকাতায় আছেন।

বাবাজী। সঙ্গে বাবাজীরা কে কে আছেন ?

শ্যাম। হরিচরণ পণ্ডিতজী, রসিক দাদাজী, মধুসূদন দাসজী, ছোট নিত্যানন্দ দাসজী। ইঁহারা প্রায় স্থায়িভাবে আছেন, আর কেহ কেহ আসা যাওয়া করেন। বোধ হয় হরিচরণ পণ্ডিতজী এবং পিসিমা গোস্বামিনী খুব শীঘ্রই পুরী আসিবেন।

বাবাজী। পুরী ঐশ্বর্য্যের ধাম, এস্থানে তাঁহাদের আসা খুব সম্ভব কি ? যাক্, তুমি স্নানাদি কর।

এই বলিয়া নিজে জগন্নাথদর্শনে গমন করিলেন। তিন চারিদিন যায়, একদিন হরিচরণ পণ্ডিতজী, ছোট নিত্যানন্দ দাসজী এবং পিসিমা গোস্বামিনী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিসিমা গোস্বামিনীর থাকিবার জন্য পৃথক্ ব্যবস্থা হইল। পণ্ডিতজী, নিত্যানন্দ দাস, শ্যামদাদা প্রভৃতি সকলেই ঝাঁজপীটা মঠে রহিলেন।

কয়েক দিন যায়—একদিন কলিকাতা হইতে বনমালী বাবুর একখানি পত্র আসিল। পত্রখানির মর্ম্ম এই—"শত শত দণ্ডবৎ প্রণামান্তে নিবেদন, দাদা! ভয়ানক প্লেগের অত্যাচারে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদজীউকে লইয়া কলিকাতা আসিতে বাধ্য হইয়াছি। মনের বড়ই সাধ যে এই উপলক্ষে একবার আপনার শ্রীচরণ দর্শন করি। জানি না বিনোদ কি করিবেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা সন্নিকট, 'এক পন্থ মোকামে যব বনযায়তো আচ্ছি হ্যায়।' আপনি কৃপারজ্জু দ্বারা আকর্ষণ না করিলে আর ত কোনই উপায় নাই। রাধাবিনোদজীউর পরিবারগণ প্রায় সকলেই সঙ্গে আছেন। যেরূপ যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন।" ইতি—

পত্রখানি পড়িয়া হৃষ্টচিত্তে সকলকে দেখাইতে লাগিলেন। পণ্ডিতজী রাজর্ষির আসিবার প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বার বার বাবাজী মহাশয়কে বলিতে লাগিলেন—"আজ্ঞে! উঁহাদের থাকিবার কি হইবে?"

বাবাজী। ভাই! আমি কি করিব? তোমরা তাহার ব্যবহার অবগত আছ। কিরূপ করিলে সুবিধা হইবে তোমরা বন্দোবস্ত কর।

পণ্ডিতজী। আমি এ স্থানের ত কিছুই পরিচয় জানি না, কিরূপে কি হইবে?

বাবাজী। আচ্ছা, একজন পরিচিত লোক তোমার সঙ্গে দেওয়া যাইবে।

এইরূপে সেদিন গেল। পরদিবস কামিনীবাবু হরিচরণ পণ্ডিতজীকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিলেন যে—"যত সত্বর হয় আমরা পুরীধামে পৌঁছিবার চেষ্টায় আছি, সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী একটী দোতলা বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিলে ভাল হয়" ইত্যাদি। পত্র পাইয়া পণ্ডিতজী আরও

ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কি করা যাইবে, শ্যামদাদা ও নিত্যানন্দ দাসজীকে লইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ঐ দিনই তিনজনে বাড়ী ভাড়ার জন্য বাহির হইলেন। সমুদ্রের ধারে মাত্র চারিখানি বাড়ী আছে, তাহার দুইখানি আবদ্ধ, অপর দুইখানির ভাড়া অত্যন্ত অধিক বলিয়া ভাড়া করা হইল না। অন্যান্য স্থানের বাড়ী উঁহাদের মনোনীত না হওয়ায় তিনজনই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে ফিরিয়া আসিলেন।

এইরূপ ভাবে তিন চারিদিন বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কোন ফললাভ হইল না। একদিন পণ্ডিতজী একটু প্রণয়রোষভরে বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন—"কোন সময় হয় ত রাজর্ষির আসিবার টেলিগ্রাম আসিয়া পৌঁছিবে; কিন্তু বাসার ত কিছুই ঠিক হইল না, আপনি ত এ বিষয়ে একেবারেই উদাসীন। উঁহারা আসিয়া পৌঁছিলে তখন কি উপায় হইবে?" বাবাজী মহাশয় একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"ভাই! তোমরা ত চেষ্টা করিলে, না মিলিলে আমি কি করিব।"

পণ্ডিতজী। তাহা নয়, আপনি একটু ইচ্ছা করিলেই মিলিতে পারে।

বাবাজী। দেখ ভাই! অযাচিতভাবে নিরাশ্রয় অবস্থায় কত কত রাজা রাজ্‌ড়া, রোগী, ভোগী, যোগী জগন্নাথের বাড়ী আসিতেছে, তিনি ত কাহাকেও তাড়াইয়া দেন না বা অযত্ন করেন না। দেখা যাক্ কি হয়। হয় ত এমনও হইতে পারে যে তাহারা এই আশ্রম ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে রাজীও না হইতে পারে। অত চিন্তার প্রয়োজন কি?

পণ্ডিতজী আর কোন কথা বলিলেন না বটে; কিন্তু বাবাজী মহাশয়ের কথায় বিশেষ সন্তোষ লাভও করিতে পারিলেন না। নানা স্থান ঘুরিয়া বহু চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু কোনই ফললাভ হইতেছে না।

একদিন অপরাহ্ণ অনুমান চারিটার সময় পণ্ডিতজী, শ্যামদাদা, নিত্যানন্দদাস এবং অন্যান্য ভক্তগণ বাবাজী মহাশয়ের নিকট বসিয়া আছেন—নানারূপ ভগবৎপ্রসঙ্গ হইতেছে, এমন সময় পণ্ডিতজীর নামে একখানি টেলিগ্রাম আসিয়া পৌছিলে পণ্ডিতজী শশব্যস্তে খুলিয়া পাঠ করিলেন। কামিনীবাবু লিখিয়াছেন—"হরেকৃষ্ণ*সহ আমরা সকলে হাওড়া আসিয়া পৌছিলাম, টিকিট করা হইল, রাত্রের ট্রেণে রওনা হইয়া সকালবেলা শ্রীধাম পুরী পৌছিব।"

টেলিগ্রাম পড়িয়া পণ্ডিতজী বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন—"এই ত দেখুন, ইঁহারা ত আসিয়া পৌছিলেন; কিন্তু আপনি ত কোনই বন্দোবস্ত করিলেন না, এখন কি হইবে?

বাবাজী। ভাই! অত ব্যস্ত কেন? বড়লোকের আসা ত! হয় ত এখনই আবার টেলিগ্রাম আসিতে পারে যে—"হঠাৎ হরেকৃষ্ণের পেটে ব্যথা হওয়ায় আজ যাওয়া বন্ধ রহিল, আমরা বাসায় ফিরিয়া চলিলাম।"

পণ্ডিতজী। টিকিট পর্য্যন্ত খরিদ করা হইয়া গিয়াছে, আর সেরূপ সম্ভব হইতে পারে কি?

বাবাজী মহাশয় "বিচিত্র কিছুই নয়" বলিয়া অন্যান্য কথা বলিতে লাগিলেন। পণ্ডিতজী উঠিয়া ঠাকুরের সম্মুখ পর্য্যন্ত গিয়াছেন, বেলা অনুমান পাঁচটা, এই সময় আর একখানি টেলিগ্রাম আসিলে পণ্ডিতজী তাড়াতাড়ি টেলিগ্রামখানি পাঠ করতঃ একেবারে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্তম্ভিতভাবে প্রায় পাঁচ মিনিটকাল অবস্থানপূর্ব্বক দ্রুতগতি বাবাজী মহাশয়ের নিকট গিয়া ইঁহার চরণ ধরিয়া সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিতে

---

* বনমালী বাবুকে সকলে হরেকৃষ্ণ নামে সম্বোধন করিয়া থাকেন।

লাগিলেন—"দাদা! আমি না বুঝিয়া আপনাকে অবজ্ঞা করিয়াছিলাম, আমার অপরাধ হইয়াছে, আপনি ক্ষমা করুন।"

বাবাজী। কি হইয়াছে ভাই! ও টেলিগ্রাম কাহার?

পণ্ডিতজী। কামিনী বাবুর।

বাবাজী। সংবাদ কি পড় দেখি!

পণ্ডিতজী। পড়িবার পূর্ব্বেই শুনা হইয়াছে, আবার কি পড়িব?

বাবাজী। শ্যামদাস! তুমি পড় ত কি লেখা আছে!

শ্যাম দাদা পড়িতে লাগিলেন—"হঠাৎ হরেকৃষ্ণের পেটে ভয়ানক ব্যথা ধরায় আজ যাওয়া বন্ধ রহিল। আমরা বাসায় ফিরিয়া চলিলাম।"

যে কথাকয়টী ইতিপূর্ব্বে ইনি বলিয়াছিলেন, ঠিক সেই কথা কয়টীই টেলিগ্রাম আসিল। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ দেখিয়া শুনিয়া অবাক্! ঐ দিন হইতে পণ্ডিতজী স্বতন্ত্রভাবে চেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন। দুইদিন পরে পূর্ব্ববৎ একখানি টেলিগ্রাম আসিল যে—"আমরা রওনা হইলাম।" পণ্ডিতজী টেলিগ্রাম লইয়া বাবাজী মহাশয়কে শুনাইবামাত্র ইনি বলিলেন—"আগামী কল্য প্রাতে উহারা আসিয়া পৌছিবে।" তাহাই হইল, পরদিবস অনুমান বেলা আটটার সময় সকলে আসিয়া পৌছিলেন। যথাযথভাবে সকলকে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক বাবাজী মহাশয়ের থাকিবার ঘরে প্রবেশ করিয়াই বনমালী বাবু, উঁহার স্ত্রী এবং মাতাঠাকুরাণী বলিয়া উঠিলেন যে—"আমরা এই ঘর ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইব না।" তখন ললিতাদাসী বলিল—"আজ্ঞে! এ ঘর খুব ছোট এবং হাওয়া খেলে না, ইহাতে কি আপনাদের থাকিবার সুবিধা হইবে?

বনমালী। দিদি! আমি শ্রীজগন্নাথদর্শনে বা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে এস্থানে আসি নাই। আমার থাকিবার উদ্দেশ্য কেবল আপনাদের

সঙ্গে অবস্থানপূর্ব্বক প্রাণ ভরিয়া কয়েকটী দিন বাবাজী মহাশয়ের মধুময় সঙ্গ করিব। ভাল দোতলা ঘরে আমার কোন প্রয়োজন নাই। তোমরা আমাকে তোমাদের নিজ সঙ্গিনী মনে করিয়া নিকটে রাখ—এই আমার প্রার্থনা।

উঁহার মৃদুমধুর কথায় সকলেই বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। আর কেহ যে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন এ অবকাশ রহিল না।

বাবাজী মহাশয় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় থাকা হইবে এইবার একটা ব্যবস্থা করিলে ভাল হয় না কি ?

বনমালী। দাদা! আমাদের থাকিবার জায়গা ঠিক হইয়া গিয়াছে, এখন আপনার থাকিবার স্থান দেখুন! আমরা এ স্থান ছাড়িয়া আর কোথাও যাইব না।

বাবাজী। ভাই! আমার ত খুবই আনন্দের বিষয়। মা কিংবা অন্যান্য ইঁহাদের কোনও কষ্ট হইবে না ত ?

বনমালী। না দাদা! কাহারই কোন কষ্ট হইবে না। আমা অপেক্ষা বরং উঁহাদেরই এ স্থানে থাকিবার বেশী ইচ্ছা।

বাবাজী। উত্তম কথা। (ললিতাদাসীকে লক্ষ্য করিয়া) দেখ, তোমাদের জিনিষপত্র সরাইয়া ঘর খালি করিয়া দাও।

এই বলিয়া বনমালী বাবুকে লইয়া ঠাকুরবাড়ী গমন করিলেন। এ দিকে ললিতাদাসী যথাসম্ভব ঘর পরিষ্কার করিয়া দিলেন। বনমালী বাবুর শরীর ভাল নয়; আহারাদির কিরূপ কি বন্দোবস্ত হইবে এই কথা বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় ইনি উত্তর করিলেন যে—"যখন ইঁহারা আশ্রমবাসী তখন স্বতন্ত্র কোনওরূপ ব্যবস্থা হইবে না। ঠাকুরের যাহা ভোগ লাগিবে, বৈষ্ণবসেবা অন্তে তাহাই ইঁহার পথ্য। (বনমালী বাবুকে লক্ষ্য করিয়া) দেখ ভাই! আজ হইতে যে কয়দিন

নিতাইচাঁদ আশ্রমে রাখিবেন, তুমি তাঁহার সংসারে অভ্যাগত! তোমার যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে তাহার জন্য তিনি দায়ী। এমন কি এক পয়সার মুড়ী মুড়কীর দরকার হইলেও তুমি স্বতন্ত্র চেষ্টা না করিয়া সরল-প্রাণে নিতাইএর সংসারে জানাইবে, তিনি ব্যবস্থা করিবেন। তুমি তাঁহার আশ্রমে থাকিয়া যদি কোনও বিষয়ে স্বতন্ত্র আচরণ কর, তবে তোমা কর্তৃক আশ্রমস্থ নিতাইএর দাসদাসীগণ অপরাধী হইবে।

বনমালী। দাদা! আমি আপনার নিকট আসিয়াছি, আপনি যাহা ভাল বোধ করেন করিবেন; আমি ত আপনার। আমি রাধাবিনোদজীউর বাড়ীতে যেরূপভাবে থাকি, আশ্রমে প্রবেশ করিয়া আমার তদতিরিক্ত কোনওরূপ কিছু বোধ হইতেছে না। এমন কি হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কোচভাবেরও উদয় হয় নাই।

ইত্যাদি নানা কথাবার্ত্তায় কিছুক্ষণ কাটিয়া গেলে উভয়ে নিজ নিজ নিত্যকৃত্য করিতে গমন করিলেন। এ বৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে নানা স্থান হইতে অনেক মূর্ত্তি অভ্যাগত বৈষ্ণব আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। রথযাত্রার এখনও চারিদিন বিলম্ব আছে। আশ্রমে প্রত্যহ প্রায় আড়াই শত মূর্ত্তির পরিমাণ রান্না হইয়া থাকে; সুতরাং বেলা কিছু অতিরিক্ত হইতেছে দেখিয়া ললিতাদাসী বনমালী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দাদা! বেলা অতিরিক্ত হইবে, কোনওরূপ কিছু ব্যবস্থা করিব কি? তাহা না হইলে ত আপনার বড়ই কষ্ট হইবে?" বনমালী বাবু একটু ব্যস্ত সমস্তভাবে বলিলেন—"দিদি! আমি যথার্থই বলিতেছি, আমার কোনরূপ অসুবিধা বোধ হইতেছে না; বরং অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজ যেন আমার শরীর বেশ সুস্থ বোধ হইতেছে। আপনারা কোনরূপ কিছু মনে করিবেন না, বৈষ্ণবসেবা হইয়া গেলে আমি দাদার সঙ্গে বসিয়া প্রসাদ পাইব।" তাহাই হইল, ঠাকুরের

ভোগান্তে যথাসময়ে বৈষ্ণবসেবা শেষ হইয়া গেলে, বাবাজী মহাশয়, বনমালী বাবু, পণ্ডিতজী, রসিকদাস বাবাজী, শ্যামদাদা প্রভৃতি কয়েক মূর্ত্তি একসঙ্গে বসিয়া মহাপ্রসাদ সেবা করিতে লাগিলেন। অপূর্ব্ব আনন্দ! এক একজন এক একটী রসের কথা বলিতেছেন, আর হাসির তরঙ্গ খেলিতেছে। প্রতি গ্রাসে গ্রাসে যেন আনন্দের উৎস ছুটিতেছে। বেলা প্রায় তিনটার সময় ইঁহাদের মহাপ্রসাদ সেবা শেষ হইল। অন্তরালে থাকিয়া কেহ কেহ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, "যে লোক আট সের জলের মধ্যে কাপড়ে বাঁধিয়া অতি পুরাতন সূক্ষ্ম চাউল সিদ্ধ করতঃ সেই অন্ন গ্রহণ করিয়াও ভালরূপ পরিপাক করিতে পারে না, সে আজ বেলা তিনটার সময় সাধারণভাবে মহাপ্রসাদ পাইতেছে, কি হয় কি জানি!" পরদিবস বনমালী বাবু প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক বাহিরে আসিয়া সকলকে বলিলেন—আজ আমার বেশ কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়াছে, শরীরও অন্যদিন অপেক্ষা খুব সবল এবং সুস্থ বোধ হইতেছে।" কি আশ্চর্য্য মহাপুরুষের শক্তিপ্রভাব! যথার্থই যতদিন পর্য্যন্ত বনমালী বাবু শ্রীধামপুরী ঝাঁজপীটা মঠে ছিলেন, আহারাদির এত অনিয়ম সত্ত্বেও একটী দিনের জন্যও উঁহার শরীরে কোনওরূপ অসুস্থতা প্রকাশ পায় নাই।

দেখিতে দেখিতে রথযাত্রা আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ নবযৌবন দর্শন। শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির লোকে লোকারণ্য। পনের দিন পরে আজ শ্রীজগন্নাথের শ্রীমুখচন্দ্র দর্শন হইবে, আবাল-বৃদ্ধ-যুবা, স্ত্রী-পুরুষ সকলের মনে আনন্দ আর ধরে না—কাহারও ঘরের কথা মনে নাই; সকলেই বিভোরভাবে একমাত্র শ্রীমন্দিরের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতঃ দর্শন-অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিতভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। এমন সময় গগনভেদী মনপ্রাণমাতান কণ্ঠে "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ

হরে রাম ॥” এই নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে সদলবলে বাবাজী মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডা পূজারীরা অন্যান্য দর্শনার্থী ভক্তগণের ভিড় সরাইয়া ইঁহাদিগকে প্রবেশের রাস্তা করিয়া দিতে লাগিলেন, সুতরাং ইঁহারা নির্ব্বিবাদে শ্রীজগমোহনে উপস্থিত হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

ভক্তবৎসল বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীজগন্নাথদেব এতক্ষণ যেন ইঁহার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন, হঠাৎ কবাট খোলা হইল। হরিধ্বনি, উলুধ্বনি জয় জয় ধ্বনি, শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, ঝাঁজ, তুরী, ভেরী, সিঙ্গা, সানাই প্রভৃতির ধ্বনিতে দশদিক্ মুখরিত হইল। অসংখ্য লোকের দৃষ্টি জগন্নাথদেবের শ্রীমুখের প্রতি। সকলেই আত্মবিস্মৃতভাবে উধাও হইয়া ছুটিতেছে; কিন্তু কোথা দিয়া কি প্রকারে যাইতেছে সে বিষয়ে কাহার লক্ষ্য নাই, লক্ষ্য করিবার অবকাশও নাই, যেরূপ ভিড় তাহাতে দুর্ব্বল, বৃদ্ধ, বালক বা স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ কষ্ট হইবার কথা, কিন্তু সুকৌশলী ম্যানেজারের বন্দোবস্তে কাহারই কোনরূপ বেগ পাইতে হইতেছে না। দর্শনার্থী যাত্রীদিগকে এক দরজায় প্রবেশ করাইয়া দর্শনান্তে অন্য দরজা দিয়া বাহির করাইয়া দেওয়া হইতেছে। বহুক্ষণ কীর্ত্তনান্তে ভক্তগণের ইচ্ছায় ইঁহারাও একবার বাহিরে আসিয়া গম্ভীরা, গঙ্গামাতা, সিদ্ধবকুল, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি প্রভৃতি দর্শনপূর্ব্বক সমুদ্রে স্নান করতঃ ঝাঁজপীটা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যথাসময়ে ঠাকুরের ভোগান্তে সকলে মহাপ্রসাদ পাইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন।

অপরাহ্ণ প্রায় পাঁচটার সময় বাবাজী মহাশয়, বনমালীবাবু, হরিচরণ বাবাজী, রসিকদাস বাবাজী প্রভৃতি কয়েকজন বসিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। নানারূপ লীলাপ্রসঙ্গ হওয়ার পর রসিকদাস বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—“আচ্ছা এই আশ্রমস্থ শ্রীবিগ্রহের সেবার

যেরূপ প্রণালী অর্থাৎ অষ্টকালানুযায়ী লীলাসকল প্রত্যক্ষরূপে যাহা আচরিত হইতেছে, এরূপ ত আর কোথাও দেখা যায় না! তবে কি "এইটী গোস্বামিপাদগণের অভিপ্রেত নহে?" হরিচরণদাস বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"সর্ব্বসাধারণের আচরিত নহে বলিয়াই যে গোস্বামিগণের অভিপ্রেত নহে ইহা কিরূপে বুঝা যায়? তাহা হইলে ত গোবিন্দলীলামৃত প্রভৃতি গ্রন্থোক্ত বাক্য বাদ হইয়া যায়।"

রসিক। না, আমি তাহা বলিতেছি না, আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, রাধাগোবিন্দের অষ্টকালীন লীলা কেবল কি স্মরণীয়, না বাহিরে আচরণীয়ও হয়?

হরিচরণ। দাদা! আপনি বলুন।

বাবাজী। শ্রীমূর্ত্তিরূপে নিত্যলীলার প্রকটতা স্থাপন করিয়া সেবা করাই বিগ্রহসেবার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে কি? নির্জ্জনে বসিয়া স্মরণ করা অপেক্ষা এই প্রণালীতে স্মরণ বেশ সুগম হয় না কি?

রসিক। এ ত অতি সত্য কথা! নানারূপ বিক্ষেপশক্তির মধ্য হইতে মনকে স্থির করিয়া স্মরণ করা সকল সময়ে সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠা খুব কঠিন; কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তদনুযায়ী আচরণ দৃষ্ট হইলে নিজের ত হইবেই, যাহারা দর্শন করিবে তাহাদেরও অনায়াসে লীলাগত চিত্তবৃত্তি হইবে সন্দেহ নাই। এই মনোমুগ্ধকর অতি সুন্দর ভাবটী দেখিয়াই আমার মনে হইতেছিল যে সর্ব্বসাধারণে না হইলেও অন্ততঃ যাঁহারা তদ্ভাবাঢ্য হইয়া স্মরণাদি করেন অথচ শ্রীবিগ্রহসেবাও রহিয়াছে, তাঁহারা এইরূপ ভাবে সেবা করিলে ভাবের বিকাশ হইয়া সুমধুর ব্রজলীলা ক্রমে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

তখন কুসুমমঞ্জরী দাসী সখী, বনমালী বাবুকে লক্ষ্য করিয়া

বলিলেন—"আচ্ছা বনমালী দাদা! রাধাবিনোদ জীউর এইরূপ ভাবে সেবা হয় না কেন? আপনি ত সর্ব্বদা স্মরণনিষ্ঠ?"

বনমালী। অবশ্য এইরূপভাবে সেবা হইলে পরমানন্দের বিষয় এবং লীলা স্মরণের বিশেষ আনুকূল্য হয়—একথা আমি স্বীকার করি, কিন্তু আমার কি এক স্বভাব যে আমি কখনও বিনোদকে একাকী দেখিতে পারি না, একাকী থাকা অবস্থায় উহার মুখখানি দর্শন করিবামাত্র আমার হৃদয় ফাটিয়া কান্না আসে। সুতরাং আমার আর যুগল ভাঙ্গা হইয়া উঠে না।

কুসুম। সর্ব্বদা যুগল রাখিয়া কিরূপে লীলার সমন্বয় করা হয়?

বনমালী। স্মরণের সহিত শ্রীবিগ্রহের সেবার যোগ রাখিতে গেলেই অসুবিধা হয়, নতুবা আর কোনও অসামঞ্জস্য ত দেখা যায় না।

কুসুম। নিরন্তর যুগল রাখিতে গেলেই গোলোকলীলা হইল না কি? পরকীয়া রসে সর্ব্বদা একত্র মিলিত থাকা সম্ভব কোথায়? পরকীয়া-রসের মূল সূত্রই যখন হইল—"কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন।" সর্ব্বদা সঙ্কোচ, গুরুজনভীতি, তখন নিরন্তর যুগল রাখা কিরূপে সম্ভবে?

হরিচরণ। ব্রজলীলার মূল ভিত্তি তুমি যাহা বলিলে তাহাই সত্য, কিন্তু কবিরাজ গোস্বামিপাদ যে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের গুণবর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"রায় কহে কৃষ্ণ হয় ধীর ললিত।
নিরন্তর কামক্রীড়া যাহার চরিত॥
রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে।
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়া রঙ্গে॥"

ইত্যাদি বাক্যের সার্থকতা বা তাৎপর্য্য থাকে কোথায়?

কুসুম। এই বাক্যের অর্থ যদি আপনি নিরন্তর কুঞ্জমধ্যে যুগলের অবস্থান এইরূপ করিতে ইচ্ছা করেন তবে গোষ্ঠগমন, গোচারণ, প্রত্যাগমন, অভিসার প্রভৃতি যাবতীয় দাস্য, সখ্য বাৎসল্য লীলা বাদ পড়িয়া যায় না কি।

হরিচরণ। যেমন অষ্টকালীন লীলা রক্ষা করা প্রয়োজন, তেমনি শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর কলমও ত অন্যথা করা যায় না। যাহাই হউক, দাদা! এ বিষয়ের সুমীমাংসা না করিলে আমাদের সংশয় দুর হইবে না।

বাবাজী। ভাই! তোমরা পণ্ডিত, শাস্ত্রাদি জান, আমি শাস্ত্রের কিছুই বলিতে পারিব না, তবে আমার যেটী যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় আমি সেইটী বলিতে পারি।

হরিচরণ। আমরা তাহাই শুনিতে চাই।

বাবাজী। ব্রজে কৃষ্ণলীলায় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই চারিটী রসই সর্ব্বদা বর্ত্তমান; কিন্তু এই চারিটী ভাবই পরকীয় সুতরাং প্রত্যয়-বিহীন, নিশ্চয়তা-রহিত, সদা সন্দিগ্ধভাব অর্থাৎ—"কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন। পরকীয় ভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।" ব্রজবাসী গোপগোপীগণের সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রাপ্তি বিষয়ে নিশ্চয়তা নাই। দাস্যরসের গোপগোপীগণ মনে করিতেছেন —"কৃষ্ণ আমাদেরই প্রভু, আমাদেরই রাজপুত্র বটে; কিন্তু আমার সেবা গ্রহণ করিবেন কি না কি জানি; কারণ তাঁহাকে সুখী করিবার যোগ্যতা আমার কোথায়? ইত্যাদি।" সখাগণ এইরূপ মনে করিতেছেন—"ভাই কানাইকে পাইয়া গোচারণাদি লীলাখেলা করিতে আমরা যেমন সুখী হই কানাইও তেমনি সুখী হয় বটে; কিন্তু আজ আমাদের সহিত গোচারণে যাইবে কি না কি জানি! আজ

তাহাকে লইয়া খেলা করিতে পারিব কি না বিশ্বাস কি?” ইত্যাদি অর্থাৎ ঠিকই যে আজ কানাইকে নিয়া খেলধূলা করিতে পারিব এইরূপ নিশ্চয়তাবিহীনভাব। আবার মা যশোমতী ও নন্দ মহারাজ একত্র বসিয়া বিচার করিতেছেন, “তাই ত! গোপাল বোধ হয় আমার ঘরে খেয়ে সুখ পায় না; কারণ ঘরে ত ক্ষীর, সর, নবনীর অভাব নাই, তবুও কেন চুরি করিয়া পরের ঘরে খায়? আবার ব্রজগোপীগণকে বলেন, মা সকল! গোপাল আমার তোমাদের স্নেহের এতই বশ যে আমি সহস্র নিষেধ করিলেও তোমাদের ঘরে না খাইলে উহার তৃপ্তি হয় না। তাই বলি, তোমরা আমার গোপালকে যত ভালবাস, আমি তাহার শতাংশের একাংশও পারি না। গোপাল আমার নয়, তোমাদের সকলের। আবার কোন কোন দিন খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করাইতেছেন আর মনে মনে ভাবিতেছেন, তাই ত গোপাল কি আজ এই দ্রব্যটি খাইবে? এইরূপ করিলে কি তাহার সুখ হইবে? ইত্যাদি ভাব ত সর্ব্বদা সন্দেহযুক্ত অর্থাৎ নিশ্চয়তা রহিত। মধুর ভাবে গোপীগণ বংশীধ্বনি-শ্রবণে উন্মত্তভাবে অভিসার করিতেছেন; কিন্তু মনে মনে ভাবিতেছেন যে কৃষ্ণের দেখা পাইব কি? বোধ হয় এতক্ষণ অন্য কোন গুণবতী রমণী, রমণীমোহনকে মোহিত করিয়া কুঞ্জান্তরে লইয়া গিয়াছে। অথবা কোনও গুরুজনের উপলব্ধিভয়ে কুঞ্জ হইতে গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে। অথবা কোনও কার্য্যগতিকে কুঞ্জে যাইতেই পারে নাই। ইত্যাদি নানারূপ সন্দেহ সর্ব্বদা সকলের মনে থাকে বলিয়াই ব্রজে পরকীয় ভাব। আলম্বন এবং উদ্দীপন অনুরাগবর্দ্ধক, রসোৎকর্ষ-সম্পাদক, উৎকণ্ঠাকারক এবং বস্তুপ্রাপক। শ্রীমূর্ত্তিসেবা যদি এই জাতীয়ভাবে না করা হয় তবে আর সেবার সার্থকতা থাকে কোথায়? শ্রীরাধাগোবিন্দ যুগলে অবস্থিত হইয়া সাময়িকভাবে সাধকের অনুকূল

হইতে পারেন ; কিন্তু সর্ব্বদা যে কিরূপে ব্রজরসের সাধকদিগের অনুকূল হন, আমি ধারণা করিতে পারি না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ধীরললিত নায়ক প্রসঙ্গে—

"নিরন্তর কুঞ্জক্রীড়া যাঁহার চরিত ॥
রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধা-সঙ্গে।
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে ॥"

ইত্যাদি যাহা বলিয়াছেন, সেটী সর্ব্বদা শারীরিক বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যাদি লীলাপ্রসঙ্গে যখন যে অবস্থাতেই অবস্থিত হউন না কেন, উঁহাদের পরস্পরের মন, বিলাসাদি ছাড়া অন্য কোনও ভাব আস্বাদন করিতে পারে না বা করে না। তবে যদি কোন রসিক মহাত্মা কোনও এক রসাবিষ্ট ভাবে, কালগত ভেদ উপলব্ধি না করিয়া নিরন্তর কোনও নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় অবস্থিত শ্রীরাধাগোবিন্দকে স্মরণের দ্বারা আস্বাদন করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে যুগল ভাবে রাখাতে ব্রজভাবের কোন ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না ; কিন্তু গ্রীষ্মকালে প্রখর-কিরণ প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডকরপ্রতপ্ত ব্যক্তির পক্ষে তৎকালকে স্নিগ্ধসুশীতল-কিরণ পূর্ণিমা-নিশার্দ্ধ মনে করা যে কত সুগম তাহা কিরূপে বলিব ? আবার সেইরূপ ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বকালোচিত ব্যবহার সম্ভবে কিনা জানি না। আবার গোস্বামীগণ বলিলেন—"সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥" স্বরূপে সর্ব্বসাধারণের নয়নগোচরীভূত অবস্থায় শ্রীরাধাগোবিন্দের যে জাতীয় ভাব, স্বভাব ইচ্ছা, অহঙ্কার এবং লীলাদি আচরিত হইয়াছে, শ্রী-বিগ্রহে নিত্যপ্রকটতা অনুভব করতঃ ঠিক তদ্জাতীয় আচরণ না করা পর্য্যন্ত সেবা হয় বলিয়াই ত আমার ধারণা হয় না এবং সেই সেবাতে সাধকের উপাসনার কোন

আনুকূল্যও হইতে পারে না ; কারণ সাধক সাধনাবস্থায় যেরূপ আচরণ করিবে বা মনে ভাবনা করিবে, সিদ্ধদেহে ঠিক সেইটীই ত প্রাপ্ত হইবে, না সাধকাবস্থায় দ্বারকানাথ, মথুরানাথ বা গোলোকনাথকে সেবা-পূজা ভাবনা করিয়া সিদ্ধাবস্থায় ব্রজেন্দ্রনন্দনকে প্রাপ্ত হইবে ? ভবিষ্যতে এই সব গোলযোগ হইবে বলিয়াই পূর্ব্ব মহাজনগণ স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন—"যুগল-চরণ সেবি, নিরন্তর এই ভাবি, অনুরাগে থাকিব সদায়। সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা, রাগ পথের এই সে উপায়॥ সাধনে যে ধন চাই, সিদ্ধদেহে তাহা পাই, পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার। পাকিলে সে প্রেমভক্তি, অপক্কে সাধনরীতি, ভকতি-লক্ষণ তত্ত্বসার॥" শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমহাশয়ের এই বাক্যের তাৎপর্য্যই হইতেছে শ্রীমূর্ত্তি সেবার নিত্যত্বস্থাপন। "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা" এই বাক্যও সাধকদেহে শ্রীবিগ্রহসেবাপরই জানিতে হইবে। স্মরণের সঙ্গে বিগ্রহসেবার যোগ হইলে যে অতি অনায়াসে ব্রজরস স্ফূর্ত্তি পায় এই কথা বোধ হয় সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। একজন হয় ত প্রাতঃকালে অতি নির্জ্জন স্থানে মালা জপ করিতেছেন, আর নানারূপ চেষ্টা করিয়া নন্দালয়ে শ্রীমতীর রন্ধনলীলাটী স্মরণ করিতেছেন। তাহাতে আবার কত বিঘ্ন! একজন কোনও একটী কথা বলিলে বা মন চঞ্চল হইলে অথবা অন্য কোনওরূপ বিক্ষেপশক্তি উপস্থিত হইলে আর সে দিন স্ফূর্ত্তি হইল না। আবার স্মরণনিষ্ঠ ব্যক্তির বিশেষ পারদর্শিতা থাকা চাই, নচেৎ হয় ত পায়স রাঁধিতে গিয়া সুক্তা রাঁধিয়া ফেলিবেন। আর একজন নিতান্ত সাধারণ লোক, ভজন-বিষয়ে বিশেষ পারদর্শীও নন, কোন শাস্ত্রাদিও অবগত নহেন ; এমন কি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কোন বিষয় ভাবিতে পর্য্যন্তও জানেন না ; কিন্তু সাধুমুখে শুনিয়াছেন, কৃষ্ণসেবার জন্য প্রাতঃকালে শ্রীমতী নন্দালয়ে

রন্ধন করিতে যান। তাই নিজ সেবিত রাধাগোবিন্দবিগ্রহের জন্য রাঁধিতে গিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিবার সময় শ্রীরাধারাণী রন্ধনশালায় বসিয়া আদেশ করিতেছেন, আর আমি তাঁহার আদেশানুযায়ী নানাবিধ দ্রব্য রন্ধন করিব এইটী ভাবিয়া রান্না আরম্ভ করিলেন। পরমানন্দে ছুটাছুটি করিয়া কার্য্য করিতেছেন, নানাপ্রকার লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এঘর ওঘর হইতে বস্তু সংগ্রহ করিয়া আনিতেছেন; কিন্তু প্রফুল্লতা বা আরোপের বিকাশ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে। তিনি পায়স রাঁধিতে গিয়া স্থক্তা বা ডা'ল রাঁধিতেছেন না। এই যে সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণসেবা ইহাকে বড় বলিবে, না কেবল মাত্র মানসে স্মরণ-লীলাকে বড় বলিবে?

হরিচরণ। লীলাবিষয়ক স্ফূর্ত্তি হয় এটা ঠিক; কিন্তু বহু আড়ম্বরের দরকার। গোস্বামীগণ আড়ম্বর পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন; কিন্তু আমরা আবার তাই বিশেষভাবে যোগ করিয়া লইলে চলিবে কেন?

বাবাজী। ভাই! যখনই সেবা আরম্ভ করা হইয়াছে, আড়ম্বরটি ত তখনই অঙ্গীকার করা হইয়াছে। তবে তাই বলিয়া "যিনি যে আশ্রমে অবস্থিত বা যে অবস্থার অধিকারী তাঁহার কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া নানারূপ চেষ্টা করিতে হইবে" এইটীকেই যে সেবার অঙ্গ বলিয়া বলিব তাহা নয়। গোস্বামীগণ বোধ হয় ইহাকেই "আড়ম্বর" বলিয়া পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সতী স্ত্রী যেমন পতির আনীত দ্রব্য দ্বারাই পরমানন্দিতচিত্তে নিজবুদ্ধির কৌশলে নানারূপভাবে পতির সুখবিধান করিয়া থাকেন, সেবকেরাও ঠিক সেইরূপভাবে শ্রীযোগমায়া-প্রদত্ত দ্রব্য দ্বারা নিজ চাতুর্য্য অনুসারে নানারূপ কৌশলে নানাপ্রকার সেবা করিয়া লীলা উদ্দীপন করতঃ সেব্য বিগ্রহের সুখবিধান এবং সাধকগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকেন। আসক্ত, বিরক্ত এবং অনাসক্ত এই

ত্রিবিধ আশ্রমস্থ ব্যক্তির পক্ষেই সেবা অবশ্যকর্ত্তব্য ; কিন্তু আশ্রমোচিত ভাবে সেবাটী ভক্তির অঙ্গ বা সাধক ; তাই বলিয়া আড়ম্বরটী সেবার অঙ্গ বা সাধক নহে, বরং সেবার বাধক হইয়া থাকে। সেবা করিতে হইলেই যদি আড়ম্বর অবশ্যকর্ত্তব্য হইত, তবে আর শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি পরম বিরক্ত মহাপ্রভুর নিত্যপরিকরগণ নিজেরা আচরণ করিয়া আমাদিগকে সেবা শিক্ষা দিতেন না। আমরা হয় ত ভগবৎ-সেবাদি বিশেষ আড়ম্বরের ভয়ে স্মরণে সারিলেও নিজ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ সময়ে নানারূপ চিন্তা বা যাচ্ঞাদি করিতে ততটা কুণ্ঠিত হই না। আচার্য্যপাদগণ নিজ নিজ ভজনোপযোগী দ্রব্য দ্বারা ভগবৎসেবা করিয়া তদ্দ্বারাই নিজ প্রয়োজন নির্ব্বাহ করতঃ আশ্রম এবং সেবা উভয়েরই মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। আমাদের সর্ব্বদা সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কার্য্য করা দরকার। যে কোনও কার্য্যে অধিকার অপেক্ষা অতিরিক্ত অবস্থা দেখাইতে গেলেই সেটা ভজনের বাধক হইয়া থাকে।

ইত্যাদি অনেক প্রকারে সেবা এবং ভগবদ্ভজন যে একই বস্তু ইহাই সকলকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। হরিচরণ দাস বাবাজী, রসিকদাস বাবাজী, বনমালীবাবু প্রভৃতি সকলেই ইঁহার সুসিদ্ধান্ত শুনিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। এইরূপ ভাবে সে দিন কাটিয়া গেল।

আজ প্রতিপদ তিথি—শ্রীগুণ্ডিচামার্জ্জনলীলা। অতি প্রত্যূষে উঠিয়াই বাবাজী মহাশয় ললিতা দাসীকে বলিলেন—দেখ ! যত সত্বর হয় ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দাও। কারণ বেলা শেষ হইয়া গেলে মন্দির-মার্জ্জনাদির অনেক ব্যাঘাত হইয়া পড়ে।' ললিতাদাসী—'যে আজ্ঞা' বলিয়া সেবকবৃন্দ সহ বিশেষ উদ্যোগের সহিত একটার মধ্যেই সমস্ত

কার্য্য শেষ করিয়া গুণ্ডিচা-মার্জ্জনের যোগাড় করিতে লাগিল। এদিকে বাবাজী মহাশয় গম্ভীরা, সিদ্ধ বকুল, গঙ্গামাতা প্রভৃতি মঠ হইতে যাহাতে শীঘ্রই গুণ্ডিচা-মার্জ্জনে বাহির হওয়া হয়, সেইরূপ চেষ্টা করিতে বলিয়া শ্রীপাদ রঘুনাথ দেব গোস্বামী প্রভুকে শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠের নিকট সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করতঃ মহাপ্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে জগন্নাথ বল্লভের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে গম্ভীরা এবং গঙ্গামাতা মঠের কীর্ত্তন আসিয়া পৌছিলে প্রভুপাদকে অগ্রে করিয়া সকলে শ্রীগুণ্ডিচা মন্দিরে রওনা হইলেন। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর লোকসংখ্যা অনেক বেশী ; সুতরাং আনন্দের মাত্রাও অনেক বেশী হইতে লাগিল। শারীরিক অসুস্থতাহেতু বনমালীবাবু, রাণাঘাটনিবাসী ভক্ত-প্রবর শ্রীযুত হেমচন্দ্র পাল চৌধুরী এবং অন্যান্য কয়েকটী ভদ্রলোক একটু দূরে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেছিলেন ; ক্রমে যখন সংকীর্ত্তন-সাগরের মধ্যে, মার্জ্জন-ক্ষালনাদিরূপ উত্তাল তরঙ্গমালা উত্থিত হইয়া চারিদিক প্লাবিত করিয়া ফেলিল, তখন আর ধৈর্য ধারণ করিতে না পারিয়া সকলেই সেই আনন্দ-সাগরে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ ভাবে পরমানন্দ সহকারে মার্জ্জনক্ষালনলীলা আচরণ করিয়া ক্রমে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে জলকেলি এবং মহাপ্রসাদ সেবাদি সমাপনপূর্ব্বক সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে নিজ নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রাত্রে বনমালীবাবু বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন—"দাদা! কাল দর্শনের কিরূপ হইবে? শুনিতে পাই নাকি ভয়ানক লোকসংঘট্ট হইয়া থাকে।"

বাবাজী। হ্যাঁ, রথের সম্মুখে লোকের ভিড় কিছু বেশীই হইয়া থাকে। সেরূপ ভাবে দর্শন করা তোমাদের পক্ষে অসুবিধা হইবে।

বনমালী। তবে কিরূপ হইবে? দর্শন করা ত চাই!

বাবাজী। ভাবনা কি! যখন জগন্নাথদেব আনিয়াছেন, তখন দর্শন দিবেন বই কি।

বনমালী। আমি ও জগন্নাথ জানি না, আমাকে যিনি আনিয়াছেন, আমি তাঁহাকেই বলিলাম এবং ভালমন্দ সমস্ত তাঁহারই শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম, তিনিই সব জানেন।

বাবাজী। ভাই! যাঁহার ধাম তিনি ছাড়া কে আনিবে?

এইরূপ নানাপ্রকার কথা-বার্ত্তায় সে রাত্রি কাটিয়া গেল। পরদিবস প্রাতেই সকলে স্নানাহ্নিকাদি শেষ করতঃ নাম করিতে করিতে দর্শনার্থ গমন করিলেন। সিংহদরজায় তিনখানি রথ রহিয়াছে; চারিদিক লোকে লোকারণ্য দেখিয়া ইনি সিংহদরজার সন্মুখবর্ত্তী একটি কোঠার ছাদের উপর হইতে বনমালী বাবুদের দর্শনের ব্যবস্থা করতঃ নিজে কীর্ত্তনে গমন করিলেন।

যথাসময়ে শ্রীবলদেব জীউ এবং সুভদ্রাদেবী সহ জগন্নাথদেব রথে শুভবিজয় করিলেন। আনন্দের অবধি নাই। শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, ভেরী, তুরী, ঝাঁজ, মৃদঙ্গ, করতাল প্রভৃতির ধ্বনির সহিত হরিধ্বনি ও উলুধ্বনি মিশ্রিত হইয়া দশদিক্ মুখরিত করিয়া তুলিল। রথটান আরম্ভ হইলে বাবাজী মহাশয় রথাগ্রে ভাবাবেশে সগণে নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। জগন্নাথদেব যেন মৃদু-মধুর হাসিমাখা মুখে কীর্ত্তন শুনিতেছেন, আর মন্থরগতিতে গমন করিতেছেন। ইচ্ছাময়ের সে দিন আর বেশী দূর যাইতে ইচ্ছা হইল না, তাই কিছুদুর যাইয়াই রথ দাঁড়াইল। ভক্তগণ প্রাণের সাধ মিটাইয়া নানাবিধ দ্রব্য জগন্নাথদেবকে ভোগ দিতে লাগিলেন। ইঁহারা কীর্ত্তন করিতে করিতে আশ্রমে উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক নানারূপ ভগবৎ-প্রসঙ্গে

দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। যাত্রিকসংখ্যা সেই দিনই অনেক কমিয়া গেল। বনমালীবাবু সগণে রথযাত্রার পরেও কয়েক দিন পুরীতে থাকিয়া যথাসময়ে কলিকাতায় গমন করিলেন।

বহুরূপী উদ্ধার

এই ঘটনাটী সম্বন্ধে ছোট বিহারীদাস বাবাজী মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই এইস্থানে উদ্ধৃত করা হইল। তিনি লিখিয়াছেন :—

সন ১৩১২ সালে রথযাত্রা উপলক্ষে আমরা শ্রীধাম পুরী গিয়াছিলাম।

সপরিবারে রাজর্ষি বনমালী বাবুও সেই সময় তথায় উপস্থিত। যাত্রা-কালীন শ্রীজগন্নাথদেব যখন যেরূপ ভাবে যেখানে থাকেন, বাবাজী মহাশয়ও সেইখানে সেইরূপ ভাবেই প্রায় দিন কাটান। জগন্নাথ যখন রথের উপর বড় রাস্তায় থাকেন, ইনিও তখন সেই রথের কাছি মাথায় দিয়া রাস্তায় শুইয়া থাকেন। দুই দিন হইল তাঁহার দর্শন না পাইয়া বড়ই উৎকণ্ঠিতচিত্তে বাজারের দিকে যাইতেছি, এই সময় হঠাৎ সম্মুখে দেখি করুণাময় গুরুদেব দাসের উৎকণ্ঠা দূর করিবার জন্য উপস্থিত। নূতন চাদর বাঁধা সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত, আজানুলম্বিত চারি পাঁচ গাছা মালতী বকুল প্রভৃতি ফুলের মালায় সুবিশাল বক্ষঃস্থল সুশোভিত, সুবাসিত তাম্বূলরাগে অধরোষ্ঠ সুরঞ্জিত, হাসিমাখা সুধা বিনিন্দিত মৃদু মধুর বাক্যে অধমকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরে বিহারী! কেমন আছিস ?"

আমি। আজ্ঞে! প্রাণহীন দেহ যেরূপ থাকে সেইরূপ আছি।

বলিয়া শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিবামাত্র কৃপাময় প্রভু আমাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন দিলেন। সেই সুশীতল বক্ষঃ স্পর্শে আমার সকল জ্বালা জুড়াইয়া গেল—জন্ম-জন্মান্তরীণ অশেষ পাপ তাপ দূর হইয়া যেন শান্তি-সাগরে ডুবিয়া গেলাম। আর বাজারে যাওয়া হইল না; মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় শ্রীগুরুদেবের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিলাম। প্রাণ-বল্লভ মঠে তখন পরম পূজনীয় প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। ইঁনি মঠের দরজায় উপস্থিত হইয়াই যেমন "প্রভুজী" বলিয়া ডাক দিলেন, অমনি তিনি শশব্যস্তে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয়ে বাহিরের রোয়াকে বসিয়া নানারূপ হাস্য কৌতুক করিতেছেন, এই সময় হঠাৎ একটী বহুরূপী আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহার গলায় একখানি শাণিত ছুরি এমনভাবে রহিয়াছে যে হঠাৎ দেখিবামাত্র হৃৎকম্প হয়! তরলিত লাল রং দেওয়া হইয়াছে, ঠিক যেন দরদরিত ধারে রক্তধারা বহিয়া বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। কপট কান্নায় চোখে জল পড়িতেছে। প্রথমে সকলেই বিস্মিত; ক্ষণকালের মধ্যে উহাকে বহুরূপী অবগত হইয়া বাবাজী মহাশয় সাশ্রুগদগদকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা! তোমার বাড়ী কোথায়?"

বহুরূপী। আজ্ঞে! যশোহর জেলা।

বাবাজী। তোমরা কোন্ জাতি?

বহুরূপী। আজ্ঞে! রাঢ়ীশ্রেণী কুলীন ব্রাহ্মণ।

বাবাজী। কতদিন ধামে আসিয়াছ?

বহুরূপী। আজ্ঞে! তিনচারি দিন হইল।

বাবাজী। কোথায় থাক?

বহুরূপী। যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকি।

বাবাজী। খাওয়া দাওয়া কোথায় হয়?

বহুরূপী। আজ্ঞে সমুদ্রের ধারে রান্না করিয়া খাই।

বাবাজী। কেন জগন্নাথের মহাপ্রসাদ খাও না?

বহুরূপী। আজ্ঞে! একে ত বাজারে বিক্রি, তাহাতে আবার বার জাতির উচ্ছিষ্ট। সুতরাং ও সমস্ত খাইতে প্রবৃত্তি আসে না—তাই নিজে রান্না করিয়া খাই।

বাবাজী। বাবা! ব্রাহ্মণ বলিয়া জাত্যভিমানটাও খুব বড়, যাহার জন্য মহাপ্রসাদ পর্য্যন্ত ত্যাগ। আচ্ছা যে ব্যবসাটী আচরণ করিতেছ, সেইটী কোন্ জাতীয় বল দেখি?

বহুরূপী। বাবা! যদিও বুঝি যে এটী আসুরিক ব্যাপার; কিন্তু কি করিব, লেখা পড়া শিখি নাই, কোনও প্রকারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা চাই ত! সংসারের অভাব চিন্তা করিব, না ভগবৎ-চিন্তা করিব!

বাবাজী। বাবা! যখন মাতৃগর্ভে ছিলে তখন কোন্ বুদ্ধির কৌশলে নিজ-আহার সংগ্রহ করিয়াছিলে? আবার ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র কোন্ বুদ্ধি-বৃত্তি অবলম্বনে মাতৃস্তনের রক্ত ক্ষীর করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলে? বিশ্বম্ভর যদি ভরণপোষণ না করেন, তবে জীবের কি ক্ষমতা যে নিজ চেষ্টায় একগাছি তৃণ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করে? বহু সাধনের ফলে জীব মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়। তাহাতে আবার ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে সর্ব্ববর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম লাভ করিয়া যদি এইরূপ বীভৎস আচারে সেই জন্ম কাটিয়া যায়, তবে ইহা হইতে দুঃখের বিষয় আর কি আছে বল দেখি! ভ্রম ছাড়, ভগবদুপাসনা কর। অনাথ, অন্ধ, আতুর, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদিকে যিনি পালন করিতেছেন, সেই সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বনিয়ন্তা তোমার স্ত্রীপুত্রদিগকে পালন করিবেন।

যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ স কিং ভক্তানুপেক্ষতে ? হা নিতাইচাঁদ ! জীবের দুর্দ্দশা একবার চেয়ে দেখ প্রভু !

বলিয়া ঠিক বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। বহুরূপী এতক্ষণ কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় ইঁহার মুখপানে তাকাইয়া ছিল। ইঁহার জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত বজ্রসম বাক্যবাণে হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। পোষাক ফেলিয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ইঁহার চরণ ধারণ পূর্বক বলিতে লাগিল—"দয়াময় ! আমি ঘোর পাষণ্ড পতিত, আমাকে উদ্ধার করুন। আর ত আমার উপায় নাই। প্রভু ! অনুতাপানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া গেল ! উঃ ! আর যে যাতনা সহ্য হয় না ! করুণাময় ! আপনি নিজগুণে করুণা করিয়া যদি এ মোহ-মদিরাপানাসক্ত ভ্রমান্ধ নারকীকে উদ্ধার না করেন তবে আর আমার কোন গতি নাই।" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তাহার তাৎকালিক অবস্থা দর্শনে বা কাতরোক্তি শ্রবণে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়। রাস্তা দিয়া যে যাইতেছে সে অতি বড় পাষণ্ডী হইলেও উহার ক্রন্দনে না কাঁদিয়া স্থির থাকিতে পারিতেছে না। পরদুঃখে দুঃখী কৃপার্দ্রহৃদয় গুরুদেবের হৃদয় দ্রব হইল—উহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন প্রদান পূর্বক অশেষ জন্মার্জ্জিত পাপতাপ দূর করতঃ চৈতন্যোদয় করাইয়া দিলেন। সে সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিল—"অযাচিত কৃপাকারী বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভুর যদি কৃপা করিয়া গ্রহগ্রস্ত এ পতিতের ব্যাধি দূর করিবার ইচ্ছাই হইয়া থাকে, তবে অবশেষ রোগ বাকি রাখিবেন না। আমার এই বৃথা জাতি-কুলাভিমান পরিত্যাগ করাইয়া যাহাতে আমি ভগবৎপথের পথিক হইতে পারি সেইরূপ করিতে হইবে। আমি আপনার শ্রীচরণে একান্ত শরণাগত, আমায় উদ্ধার করুন।"

তখন বাবাজী মহাশয় প্রভুপাদকে দেখাইয়া বলিলেন—"এই যে

বাবা! তোমার উদ্ধারকর্ত্তা সাক্ষাৎ নিতাইচাঁদ বসিয়া আছেন; ইঁহার চরণে শরণ লও, অভীষ্ঠ পূরণ হইবে।" ব্রাহ্মণটী ঠিক কাষ্ঠের পুত্তলীর ন্যায় ইনি যেমন যেমন নাচাইতেছেন তেমন তেমন নাচিতেছে। ইঁহার আজ্ঞা পাইবামাত্র প্রভুপাদের চরণ ধারণপূর্বক রোদন করিতে লাগিল। দয়ার্দ্রহৃদয় প্রভুপাদও আস্তেব্যস্তে ব্রাহ্মণকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। এদিকে শ্রীগুরুদেব গণেশ ভাণ্ডারীকে ডাকিয়া উহাকে ক্ষৌর করাইবার জন্য আমাকে আদেশ করিলে আমি দ্রুতগতি গণেশকে ডাকিয়া যথাযথরূপে আদেশ পালন করিলাম। ক্ষৌর শেষ হইলে গণেশের দ্বারা জল আনাইয়া ব্রাহ্মণকে স্নান করান হইল। তৎপরে বাবাজী মহাশয় উহাকে মন্ত্র প্রদান করিবার জন্য প্রভুকে বলায় তিনি প্রথমে একটু আপত্তি করিলেন; কিন্তু ইনি যখন কিছুতেই ছাড়িলেন না, তখন অগত্যা উহাকে দীক্ষা প্রদান করতঃ "বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে থাকিয়া ইঁহার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে পারিলে আর কোনও অভাব থাকিবে না—তুমি এক মনে ইঁহার শরণ লও" এইরূপ আদেশ করিলে ব্রাহ্মণ করযোড়ে বলিল—"বাবা! আমি যে কেবল ইহ জন্মেই ঐ অভয় চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তাহা নয়, আমি জন্মে জন্মে ঐ চরণে শরণাগত। ইনিই আমার উদ্ধারকর্ত্তা, ইনি যাহা আদেশ করিবেন আমি প্রাণপণে তাহা পালন করিব" বলিয়া পুনর্ব্বার বাবাজী মহাশয়ের চরণতলে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইল। ইনি তখন মঠ হইতে রামদাদা প্রভৃতিকে নাম করিতে ডাকিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়া নিজের পরিধেয় বহির্বাসখানি উহাকে পরিতে দিয়া উহার সঙ্গে একটী ছাতা, একটী ঘটী এবং দশ আনার পয়সা ছিল তাহা গুরুদক্ষিণাস্বরূপ প্রভুপাদকে দিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ অকাতরে প্রফুল্লচিত্তে ঐ সমস্ত দ্রব্য প্রভুকে দিতে গেলে তিনি কিছুতেই লইবেন

না দেখিয়া বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"প্রভু! আমি বলিতেছি, আপনি এখন লউন পরে দেখা যাইবে।" এদিকে রামদাদা সদলে কীর্ত্তন লইয়া উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণটীকে সঙ্গে করিয়া নাম করিতে করিতে শ্রীজগন্নাথ-দেবের মন্দির পরিক্রমা করিতে বলিয়া নিজে মঠে আগমন করিলেন। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সেই দিন হইতে সেই ব্রাহ্মণটী বিশেষ অনুরাগের সহিত বিশুদ্ধ ভক্তিযাজন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণটীর অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া একবাক্যে মহতের কৃপার জয় দিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীগুরু-পূর্ণিমা

রথযাত্রা উপলক্ষে যে সমস্ত ভক্ত এবং বৈষ্ণবমণ্ডলী আগমন করিয়াছিলেন প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছেন। বাবাজী মহাশয়ের শিক্ষা গুরুদেব রহিয়াছেন। আজ শ্রীগুরু-পূর্ণিমা—মঠে খুব ধুমধাম! শ্রীগুরুপূজা করিবে বলিয়া সকলেরই প্রাণে বিশেষ উৎসাহ। কেহ বা নানাজাতি ফুল সংগ্রহ করিতেছে, কেহ বা নানারূপভাবে মালা গাঁথিতেছে, কেহ বা চন্দন ঘসিতেছে, আবার কেহ কেহ বা নানাবিধ ভোগের দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে। বাবাজী মহাশয়ের মনে কি খেয়াল উদয় হইল—দোকান হইতে এক জোড়া সাদা গরদের কাপড়, একটি গালিচা এবং খুব বড় একখানা সতরঞ্চি খরিদ করিয়া আনাইলেন। কুসুম দিদির দীক্ষাগুরু শ্রীবিহারী পূজারী মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করা হইল। এদিকে কুসুমদিদি এবং নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী এই দুইজনের মধ্যে গুরুতত্ত্ব, গুরুপূজাপ্রণালী লইয়া খুব আলোচনা হইতে লাগিল। একজন বলেন—"গুরু কৃষ্ণ অভিন্ন বস্তু, যেরূপভাবে কৃষ্ণপূজা করা হইবে, গুরুপূজাও ঠিক সেইরূপ ভাবেই

করিতে হইবে। যখন শাস্ত্রে আছে—সর্ব্বাগ্রে গুরুপূজা না করিয়া কোনও পূজার অধিকার হয় না, গুরুর সম্মুখে অন্য দেবতাদিগের বন্দনা পর্য্যন্ত করা নিষেধ, তখন প্রসাদী দ্রব্য দ্বারা গুরুপূজা হইতেই পারে না।" আর একজন বলেন—"গুরু কৃষ্ণ-ভক্ত। আমানীয় দ্রব্য দ্বারা গুরুপূজা হইতে পারে না" ইত্যাদি। উভয়েই শাস্ত্রপ্রমাণ দেখাইতে লাগিলেন। কেহই নিরস্ত হইবার নহে। আশ্রমবাসী অন্যান্য সকলে নিজ নিজ হৃদয়ের ভাবানুসারে উভয়দিকে যোগ দিতে লাগিলেন। অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে, বাবাজী মহাশয় এবং দাদা বাবাজী মহাশয় আছেন, এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাউক। তাহাই হইল, উভয় দল উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ মত প্রকাশ করিতে লাগিলে বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"আমি ওরূপভাবে শুনিতে প্রস্তুত নহি, এক এক দল পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিজনিজ মত স্থাপন করিবার পরে আমার যাহা বক্তব্য হয়, যদি গুরুদেব বলান বলিব। আচ্ছা প্রথমে নিত্যস্বরূপ বল গুরু কে?"

নিত্যস্বরূপ। শ্রীচরিতামৃতে বলিয়াছেন—

"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
গুরু কৃষ্ণ রূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"
শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ॥

কৃষ্ণকর্ণামৃতে—

"চিন্তামণি-র্জয়তি সোমগিরি-র্গুরুর্মে,
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদ-কল্পতরু-পল্লবশেখরেষু,
লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ॥

অন্যত্র—"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু-র্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

ইত্যাদি শত শত প্রমাণে শ্রীগুরু কৃষ্ণ অভিন্নত্ব পাওয়া যায়। এমন কি গুরুপূজা না করিয়া অন্য কোনও পূজাদিতে অধিকার হয় না; সুতরাং সর্ব্বাগ্রে গুরুপূজা কর্ত্তব্য। প্রসাদি বস্তু দ্বারা যে গুরুপূজা করিতে হইবে ইহার প্রমাণ কোথায় পাওয়া যায়? পতিব্রতার যেমন পতিই একমাত্র উপাস্য বা সেব্য, পতির স্থানে যদি শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত বসান হয় তবে তাহার পাতিব্রত্য থাকে না, সেইরূপ নৈষ্ঠিক ভক্তের গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কাহাকেও গ্রহণ করা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? গুরুকে ভগবৎপ্রাপ্তির সহায়কারী বলিয়া ভজনা করা যেন ঠিক উকিলের আনুগত্যে মোকদ্দমা জয় করার ন্যায় হইয়া পড়ে। কার্য্যসিদ্ধির জন্য যত কিছু সেবাশুশ্রূষা, কার্য্যসিদ্ধি হইয়া গেলে আর সম্বন্ধ থাকে না; সুতরাং আমার মতে ভগবৎবুদ্ধিতে যথাযোগ্যভাবে গুরুপূজা করাই শিষ্যের অবশ্যকর্ত্তব্য।

বাবাজী। আচ্ছা! ইহার কথা ত শুনিলাম, তোমাদের কি মত বল।

কুসুম। আমার ত আর পৃথক্ কোন মত নাই। আমি এই কথা বলি—"যদি গুরু এবং কৃষ্ণ এক বস্তুই হয় তবে পৃথক্ কৃষ্ণ-উপাসনা থাকে কোথায়? আমি যেরূপ মানুষ গুরুও ত সেইরূপ মানুষই বটেন; তবে বিশেষত্ব এই যে তিনি ভজনবলে ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ

করিয়াছেন; সুতরাং উপদেশ দ্বারা আমাকে ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে পারিবেন বলিয়াই আমি তাঁহাকে ভক্তি করিয়া থাকি। যদি পৃথক ভাবে ভগবদুপাসনাই না থাকে তবে তিনি আর আমায় কি মন্ত্র প্রদান করিবেন বা কেনই বা আমি তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার অনুগত হইব? শাস্ত্র বলেন—

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ইত্যাদি প্রমাণে গুরুদেবকে ভগবৎপ্রাপ্তির পথপ্রদর্শক বলিয়া যখন উক্ত হইল, তখন 'স্বয়ং' বুদ্ধি কিরূপে হইতে পারে বা তাঁহার স্বতন্ত্র পূজাদিই বা কিরূপে সম্পন্ন হয়? আবার নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—

"গুরুরূপা সখীর বামে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে
চামরের বাতাস করিব।"

গোস্বামিপাদগণ বিধান করিয়াছেন—"মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে গুরুবরং" ইত্যাদি।

বাবাজী। বেশ! তোমাদের দুই পক্ষের মতামত সব শুনিলাম। এখন আমার এ বিষয়ে যাহা বক্তব্য একটু মন দিয়া শুন। এ জগতে উপাসনা-মার্গে যত কিছু বিভ্রাট, যত কিছু মতামত এই গুরুতত্ত্ব লইয়া। কেহ বলেন—"গুরুই ভগবান্।" কেহ বলেন—ভগবান্ই গুরু।" কেহ ভক্ত, কেহ বা মনুষ্য, কেহ বা বোধ স্বরূপ, কেহ বা পিতৃমাতৃরূপ, কেহ বা স্বামীই গুরু, আবার কেহ বা গুরুই স্বামী ইত্যাদি যাঁহার যেরূপ ভাব মনে উদয় হইয়া থাকে, তিনি সেইরূপ ভাবে উপাসনার পথে অগ্রসর

হইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। তবে নিজ নিজ মনোবৃত্তি অনুসারে কেহ বা অগ্রগামী হন, আবার কেহ বা পশ্চাদ্‌গামীও হইয়া থাকেন। জগতে এরূপ কোনও ভাব হইতে পারে না, যাহা শ্রীগুরুতত্ত্বে অসম্ভব; কিন্তু প্রত্যেক ভাবটীই অকপট হওয়া চাই। দম্ভমানমদান্বিত অতি উচ্চভাব হইলেও তাহার ফলে বৈপরীত্য ঘটিবেই ঘটিবে। যে কোন একটী ভাবে যাহার গুরুতে নিষ্ঠা হইয়াছে সে কখনই অন্যের ভাব লইয়া বিবাদ করিতে পারে না। লব্ধপদপ্রতিষ্ঠা, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, অসূয়া প্রভৃতির কোন না কোন একটির আশ্রয় গ্রহণ না করিলে কখনই বিবাদ হয় না। যতক্ষণ অন্যের আশ্রয় রহিল, ততক্ষণ অনন্যভাবে গুরুপদাশ্রয় হইল কৈ? সুতরাং পরমত খণ্ডনপূর্ব্বক নিজের জিগীষা বুদ্ধি পরিত্যাগ করতঃ হৃদয় বেশ সরল স্বচ্ছ করিয়া শুন, বস্তুর ধারণা হইবে। ভগবদ্‌রাজ্যে যাবতীয় বস্তু দুই ভাগে বিভক্ত—একটী লীলাংশ, অপরটী তত্ত্বাংশ। লীলাংশটী প্রত্যক্ষ, তত্ত্বাংশ অনুমেয়। সুতরাং ভেদাভেদ প্রকাশ। ইহার মধ্যে একের সহিত অপরের একত্র সমাবেশ সত্ত্বেও একযোগে অনুভব করিতে গেলেই গোলযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। নিত্যস্বরূপ গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সমস্ত শাস্ত্রপ্রমাণ দেখাইতেছে, তত্ত্বাংশে ইহা শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব প্রভৃতি সর্ব্ববাদিসম্মত; কিন্তু লীলাংশে অবশ্য অন্যথা স্বীকার করিতেই হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মতে উপাসনা-প্রণালীর নাম রাগানুগা পন্থা। এ পথের মূল ভিত্তিই আনুগত্য। এ আনুগত্য উকিলের আনুগত্যের মত কার্য্যসিদ্ধির পরে ছুটিয়া যাইবার নয়। রাগানুগা মার্গে ব্রজভাবের উপাসকগণের পক্ষে "মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে গুরুবরং" এ কথা না মানিলে উপাসনার বিশৃঙ্খলতা হইয়া পড়ে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়াছেন—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

নিকুঞ্জ-যূনো রতিকেলিসিদ্ধ্যৈ যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥" ইত্যাদি

আবার ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

"গুরুরূপা সখীর বামে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে,
চামরের বাতাস করিব॥
শ্রীগুরু-চরণ-পদ্ম, কেবল ভকতি-সদ্ম,
বন্দো মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হইতে॥
শ্রীগুরু-প্রসাদে ভাই, এসব ভজন পাই,
প্রেম ভক্তি সখী অনুচরী।" ইত্যাদি

এই ব্রজভাবের উপাসনার কেমন সুন্দরী প্রণালী! হয় ত কোনও সখী তাহার গুরুরূপা সখীর আনুগত্যে তদাজ্ঞায় শ্রীরাধা-গোবিন্দের যুগল-লীলা-বিলাসাদি দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেছে, এই সময় বনান্তর হইতে কোনও সেবার উপযোগী বস্তু আনয়ন করিবার জন্য গুরু-রূপা সখী যেমন উহাকে আদেশ করিলেন, অমনি সে দ্বিগুণতর আনন্দে আনন্দিতা হইয়া প্রস্থান করিল। কোন সময়ে বা নির্জ্জন স্থানে কৃষ্ণ-দর্শন হইলে কৃষ্ণ উহাকে কামনা করিলেও গুরুরূপা সখীর আজ্ঞা ব্যতিরেকে কৃষ্ণ সহ মিলিতা না হওয়াকেই আনুগত্য বলা হয়। আমার বিশ্বাস—গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবৎ-মূর্ত্তিরূপে আরাধনা করা অপেক্ষা এইরূপ অনুগত-ভাবে আরাধনায় গুরু এবং শিষ্য উভয়েরই সুখাধিক্য হইয়া থাকে। আর একটী প্রধান কথা এই যে "সকল ছাড়িয়া আজ্ঞা বলবান্।" সেবা অর্থ সুখ দেওয়া। আমি হয় ত সাক্ষাৎ বুদ্ধিতে গুরুদেবের সেবাপূজাদি করিলাম; কিন্তু তাহাতে গুরুদেব সুখী হইলেন না। সেই সেবায় আমি

কোন ফললাভ করিতে পারিব কি? শাস্ত্র, প্রমাণ ও যুক্তি থাকিলেও গুরুদেবের আজ্ঞাই সর্ব্বথা পালনীয়া।

নিত্যস্বরূপ। আচ্ছা! গুরুদেব যদি কোন শিষ্যকে ঐরূপভাবে সেবাদি করিতে আদেশ করেন?

বাবাজী! এ বড়ই কঠিন কথা। "তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরববর্জ্জিত।" "আমি সাক্ষাৎ ভগবান্ আমাকে সেইরূপ ভাবে পূজাদি কর।" গুরুদেব নিজমুখে এইরূপ বলিতে পারেন বলিয়া আমার ধারণায় আসে না। তবে যদি কোনও গুরুদেব এরূপ বলেন এবং সেই বাক্যে শিষ্যের সুদৃঢ় বিশ্বাস হয়, গুরুমূর্ত্তি ব্যতীত অন্য কোনও বিগ্রহে বা নামে তাহার মন আকৃষ্ট না হয়, তবে সে যেরূপভাবে ইচ্ছা গুরুদেবের সেবা পূজা করিতে পারে। তাহাতে শিষ্যের কার্য্যের কোনই ব্যাঘাত হইবে না। তবে গুরুদেবের সম্বন্ধে বিচারকর্ত্তা প্রভু।

ইত্যাদি নানারূপ সিদ্ধান্ত এবং সুমীমাংসা শুনিয়া ইঁহার গুরুদেব এবং বিহারী পূজারী মহাশয় প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন "অপূর্ব্ব মীমাংসা বটে; এই জাতীয় সাধনাই সর্ব্বসম্মত। এই পথ অবলম্বন না করিলে গুরু শিষ্য উভয়েরই অনিষ্ট হইয়া থাকে।"

এদিকে বাবাজী মহাশয়ের আদেশে ঠাকুরের সম্মুখে নূতন সতরঞ্চ বিছাইয়া তাহার উপর নূতন গালিচা বিছান হইল। ইঁহার বিশেষ প্রার্থনায় ইঁহার গুরুদেব গরদের কাপড় পরিয়া উহার উপর উপবেশন করিলে ইনি নিজ হস্তে ফুল, তুলসী, চন্দন দ্বারা ভক্তিভরে পূজা করিয়া উঁহার গলায় ফুলের মালা প্রদানপূর্ব্বক নিজ হস্তে আরতি করিতে লাগিলেন। অপরাপর সকলে খোল করতালযোগে "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম" এই নাম করিতে লাগিলেন। আনন্দের অবধি নাই। চারিদিক্ হইতে অনেক

লোক সমবেত হইয়াছে। সকলেই অনিমেষনয়নে বাবাজী মহাশয়ের কার্য্যকলাপ দেখিতেছেন, আর সমকালীন হর্ষ, বিস্ময়, ব্যাকুলতা প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছেন। আরতি অন্তে বাবাজী মহাশয় গুরুবন্দনার পদ ধরিলেন। সে এক অপরূপ কৌতূহল। বাবাজী মহাশয় নিজের ভাবানুযায়ী হৃদয়ের আবেগে নিজ গুরুদেবের নিকট প্রার্থনা, দৈন্য ও আত্মনিবেদন করিতেছেন, সঙ্গীগণও ঠিক সেই সেই কথাতেই নিজ নিজ হৃদয়ের ভাবানুযায়ী তাঁহাদের গুরুদেবের নিকট প্রার্থনা, দৈন্য ও আত্মনিবেদন বিজ্ঞপ্তি করিতেছেন। বাহ্য লক্ষণ কিন্তু সকলেরই এক, সকলেরই চোখে জল, প্রাণ আবেগপূর্ণ, মুখে হা হুতাশ, কণ্ঠ গদগদ, সর্ব্বাঙ্গ সাত্ত্বিক বিকারে পরিপূর্ণ।

বহুক্ষণ কীর্ত্তনের পর কীর্ত্তন সমাপ্তি হইলে ইনি প্রসাদী নানারকম ফলমূল মিষ্টি প্রভৃতি নিজ হস্তে উঁহার মুখে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। তিনিও প্রসন্নচিত্তে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করতঃ সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। সঙ্গীগণের মনের বাসনা তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। অবকাশ পাইয়া নিত্যস্বরূপ, বাবাজী মহাশয়কে ইঁহার ঘরে লইয়া গেলে সঙ্গীগণ যাহার যেরূপ মনের ভাব বা বাসনা তিনি সেইরূপ ভাবে অর্চ্চনা করিয়া নিজ নিজ মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে লাগিলেন! ইনি কিন্তু মুদ্রিতনয়নে নিশ্চল নিস্পন্দভাবে উপবেশন করিয়া আছেন। দেখিলে বোধ হয় যেন এ রাজ্যে নাই। অপূর্ব্ব দৃশ্য! সকলে এককালীন প্রেমাপ্লুতহৃদয়ে মনপ্রাণমাতান কাতর স্বরে সাশ্রু গদগদকণ্ঠে "মদেকপ্রাণনাথায় মদেকত্রাণকারিণে। মৎসর্ব্বস্বপদাব্জায় শ্রীগুরবে নমো নমঃ॥" বলিতে বলিতে পুষ্পাঞ্জলির সহিত দেহ, মন প্রাণাদি সর্ব্বস্ব শ্রীগুরুচরণে অর্পণ করতঃ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। কৃপাময় প্রভুও যেন কৃপার্দ্রচিত্তে নয়ন উন্মীলন

করিয়া প্রসন্নদৃষ্টিতে সকলের প্রার্থনা অঙ্গীকার করিলেন। অবসর পাইয়া ললিতাদাসী নানারূপ প্রসাদী ফলমূলপরিপূর্ণ থালা সম্মুখে উপস্থিত করিবামাত্র নিত্যস্বরূপ ব্যস্তসমস্তভাবে একটি মিষ্টি লইয়া যেমন বাবাজী মহাশয়ের মুখে দিলেন, অমনি একে একে সকলেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মুখে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। ইনিও অম্লানবদনে সকলের অভিলাষ পূর্ণ করতঃ যথাসময়ে শ্রীবিহারী পূজারী প্রভৃতি সকলকে সঙ্গে লইয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন।

শ্রীশ্রীলবঙ্গমঞ্জরী-গুটিকা

বাবাজী মহাশয়ের ঝাঁজপীটা মঠে অবস্থানকালীন কোন একদিনের ঘটনা ধারাবাহিকরূপে অর্থাৎ অষ্টকালীয়ভাবে শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী দাসী নাম্নী কোন একটী ভক্ত মহোদয়া নানাবিধ ছন্দাকারে রচনা করিয়া চরিত-সুধার মধ্যে বাহির করিবার আদেশ করেন; সুতরাং তাঁহার আদেশক্রমে "লবঙ্গমঞ্জরী-গুটিকা" নাম দিয়া সেই ঘটনাটী এইস্থানে উদ্ধৃত করা হইল :—

নমস্কার

শ্রীগুরুচরণপদ্ম করিয়ে বন্দন।
নিতাই গৌরাঙ্গ পদ বন্দি অনুক্ষণ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
শ্রীরূপ অনঙ্গরতিমঞ্জরীর গণ॥
শ্রীমতী রাধিকা সহ শ্রীরাধারমণ।
সবাকার পাদপদ্ম করিয়ে বন্দন॥

নবদ্বীপ নীলাচলবাসী যতজন।
সবাকার শ্রীচরণ বন্দি অনুক্ষণ॥
অভিন্ন শ্রীগুরুদেব নবদ্বীপ দাস।
তাঁর পদধূলি মোর হউক পঞ্চগ্রাস॥
তাঁর পদরজ করু মস্তক ভূষণ।
যাঁহার কৃপায় পাই শ্রীরাধারমণ॥
ওহে নবদ্বীপ দাদা করহ করুণা।
তব কৃপাবলে মোর পূরুক বাসনা॥
তোমার পরাণধন শ্রীরাধারমণ।
অষ্টকাল লীলা তাঁর করহ রচন॥
তুমি না জানালে তাঁরে কে জানিতে পারে।
তুমি ত দিয়াছ যারে সে পেয়েছে তাঁরে॥
তোমা সবাকার সনে যে যে লীলা কৈল।
তাহা লিখিবারে আজ মোর মন হৈল॥
আমার প্রভুর প্রিয় সখী শ্রীললিতা।
তাঁহার চরণ বন্দি হই অনুগতা॥
কুসুম কিশোরী বৃন্দা প্রেম-তরঙ্গিণী।
শ্রীরসরঙ্গিণী আদি যতেক সঙ্গিনী॥
সবার চরণে মোর এই নিবেদন।
কৃপা করি কর মোর বাঞ্ছিত পূরণ॥
তোমাদের প্রাণনাথের অষ্টকাল লীলা।
তোমা সবা সঙ্গে রঙ্গে যাহা আচরিলা॥
তাহা লিখিবারে মোর ভেল অভিলাষ।
করুণা করিয়া সবে পূরাও মন-আশ॥

নীলাচলে গিয়াছিনু তোমাদের কাছে।
যাহা দেখাইয়াছিলে সেই মনে আছে।
ভুল ভ্রান্তি যত কিছু করি সংশোধন।
নিজদাসী জ্ঞানে দোষ করিবে মার্জ্জন॥
লিখিতে না জানি মুঞি জ্ঞান-বুদ্ধি-হীনা।
শকতি সঞ্চার কর করিয়ে করুণা॥

নিশান্তলীলা

শেষ রজনী যব ভেল উপসন্ন।
নিদ্রা ত্যজি প্রভু তব হইল চৈতন্য॥
সময় বুঝিয়া সেবাপরা সখীগণে।
যার যেই সেবা কার্য্য করয়ে যতনে॥
জলদ-গম্ভীর নাদে শ্রীরাধারমণ।
যার যেই নাম ধরি ডাকে নিজগণ॥
শুনে সবে একমনে আমার বচন।
ইহাতে হেলন নাহি কর কদাচন॥
নিতাই গৌরাঙ্গ সহ শ্রীরাধারমণ।
রাধাকান্ত রাধাবিনোদ আর যত জন॥
ইঁহাদের সেবা সবে করহ যতনে।
নিতাই গৌর রাধে শ্যাম বলহ বদনে॥
আমাকে করিতে সুখী যার মনস্কাম।
ইঁহাদের সেবা সেই কর অবিরাম॥

শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবা করে যেই জন।
তাহার নিকট আমি বাঁধা অনুক্ষণ ॥
কৃষ্ণ-বৈষ্ণবেতে যার আন্তরিক প্রীত।
তাহার অধীন সব জানিহ নিশ্চিত ॥
অমিয়া মাখান এই মধুর বচন।
শুনি আনন্দিত ভেল সবাকার মন ॥
যার যেই সেবাকার্য্যে চলে কুতুহলে।
কেহ বা আনন্দে মাতি হরি হরি বলে ॥
মঙ্গল-আরতি-কাল হইল উপনীত।
মন্দিরে আরতি করে অতি হরষিত ॥
প্রসাদী আরতি কেহ করেতে লইয়া।
প্রভুর আরতি করে জয় জয় দিয়া ॥
পঞ্চ প্রদীপ ঐ করে টলমল।
প্রভুর শ্রীমুখখানি করে ঝলমল ॥
শ্রীচরণতলে সবে দণ্ডবত কৈল।
কেহ বা চরণ দু'টি মস্তকে লইল ॥

প্রাতঃকাল

উঠিয়া তখন শ্রীরাধারমণ
ঘরের বাহিরে যায়।
আনন্দিত মনে যত ভক্তগণে
চৌদিকে ঘেরি দাঁড়ায় ॥

ঈষৎ হাসিয়া সবা সম্ভাসিয়া
বহির্দ্দেশেতে চলিলা।
জলপূর্ণ ঝারি লয়ে সহচরী
সঙ্গে সঙ্গেতে চলিলা॥
গমন মন্থর রসিক শেখর
চলে করি কত রঙ্গ।
হাসির হিল্লোলে ভাসয়ে সকলে
উঠয়ে প্রেম-তরঙ্গ॥
বহির্দ্দেশ ঘর প্রবেশি সত্বর
বসিল রাধারমণ।
হেথা সেবাপরা সখী সুচতুরা
করে সব আয়োজন।
মৃত্তিকা ছানিয়া কর্পূর মাখিয়া
থুইল যতন করি।
সুবাসিত বারি ভরিয়া গাগরি
রাখিলেক সারি সারি॥
গামছা আনিয়া জলেতে কাচিয়া
রাখে অতি সযতনে।
যত সখীগণে আনন্দিত মনে
করে প্রেম আলাপনে॥
কিছুক্ষণ পরে আইলা বাহিরে
রসিক মুকুট মণি।
সখী শ্রীললিতা হ'য়ে ত্বরান্বিতা
নিকটে গেলা অমনি॥

স্ুবাসিত মাটি করি পরিপাটি
যতনে রাখিয়াছিল।
কিঞ্চিৎ তুলিয়া যতন করিয়া
বামহস্তে সমর্পিল॥
গন্ধ জল দিয়া শ্রীহস্ত ধুইয়া
মুছল পাতল চীরে।
মুখ প্রক্ষালন করিল তখন
সুগন্ধি শীতল নীরে॥
কোমল চরণ পাখালি তখন
আঁচলে মুছল তায়।
নিজগণ সঙ্গে প্রেমের তরঙ্গে
ভাসয়ে রসিক রায়॥

শৌচক্রিয়া সমাপন করিয়া তখন।
দন্তধাবন করিবারে হইল মন॥
প্রেমালাপে মুগ্ধ করি সবাকার মন।
মন্থর গমনে চলে শ্রীরাধারমণ।
বেদীর উপরে বসি হাসে কুতূহলে।
দন্তধাবনের দ্রব্য আনয়ে সকলে॥

রজত থালায় নিম্ব পত্রচূর্ণ
রজত রসনা শোধনী।
উজ্জ্বল দর্পণ সুবর্ণ খড়িকা
যোগায় যতেক সঙ্গিনী॥

কটোরা পূরিয়া সরিষার তৈল
রাখিল যতন করিয়া।
সুবাসিত জল অতি সুশীতল
সারি সারি রাখে ধরিয়া॥
(কেহ) চূর্ণ সহ আনি বাম হাতে করি
প্রভুর নিকটে বসিয়া।
সুবর্ণ খড়িকা লইয়া তখন
প্রভু হাতে দেয় তুলিয়া॥
খড়িকা পাইয়া হরিষ হইয়া
উজ্জল দর্পণ ধরিয়া।
খড়িকায় খুঁটে দশন সকল
দরপণে মুখ দেখিয়া॥
নিম্বপত্রচূর্ণ অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমা
আঙ্গুলে লইয়া যতনে।
মাজিয়া দশন উজ্জল করিল
জিনিয়া ফটিক দর্পণে॥
সুগন্ধি সলিলে মুখ পাখালিয়া
মুছল পাতল বসনে।
রসনা শোধনী দু'করে ধরিয়া
রসনা শোধয়ে যতনে॥
পুন লইয়া জল আঁখি মুখ সব
ধুইয়া নির্ম্মল করিল।
সূক্ষ্ম গামছায় মু'খানি মুছল
অতি সমুজ্জল হইল॥

সরিষার তৈল কিছু করেতে লইয়া।
অশ্বত্থাম্নে নমঃ বলি ভূমিতে ফেলিয়া॥
চরণ নখরে কিছু করে সমর্পণ।
নাভি বক্ষ কণ্ঠদেশ করয়ে মর্দ্দন॥
আঙ্গুলে লইয়া কর্ণদ্বয়ে সমর্পিল।
নাসিকায় কিছু পুন টানিয়া লইল॥
নয়ন যুগলে তৈল অর্পণ করিল।
মুখেতে লইল অবশেষ যাহা ছিল॥
কুল্লোল করিয়া তবে ফেলায় ডাবরে।
সুবাসিত জলে মুখ প্রক্ষালন করে॥
রসনা শোধয়ে পুন অতি সযতনে।
পুন আঁখি মুখ ধোয় আনন্দিত মনে॥
গামছা লইয়া তবে মু'খানি মুছল।
সেবিকা সে সব দ্রব্য দূরেতে লইল॥
দন্তধাবন কার্য্য করি সমাপন।
স্নান করিবারে ইচ্ছা হইল তখন॥
চারিদিকে সারি সারি ভকত মণ্ডলী।
কৃষ্ণতত্ত্ব কথা পুছে হঞা কুতুহলী॥
কেহ বা আপন দুঃখ করে নিবেদন।
কেহ বা সাধনতত্ত্ব জিজ্ঞাসে তখন॥
যার যেই মত ইচ্ছা পুছয়ে সকলে।
সকলের প্রশ্নোত্তর করেন কুতূহলে॥
অন্তর্য্যামী প্রভু সবার অন্তর জানিয়া।
রুচি অনুসারে কথা কহেন হাসিয়া॥

বাহ্যস্মৃতি নাহি তখন কৃষ্ণকথা-রসে।
তৈল মর্দ্দন করে প্রিয় দাসী দাসে॥
স্নিগ্ধ সুগন্ধি তৈল কেহ দেয় শিরে।
কেহ অঙ্গ মর্দ্দন করয়ে ধীরে ধীরে॥
কোমল চরণ কেহ অঙ্কেতে লইয়া।
সুখে তৈল দেয় প্রেমে ডগমগী হইয়া॥
যে আনন্দ সিন্ধুমাঝে ভাসে ভক্তগণ।
কার সাধ্য তার বিন্দু করয়ে বর্ণন।
কেহ বা ব্যজন লই করয়ে বীজন।
ছত্রে কেহ সূর্য্যাতপ করে নিবারণ॥
মাঝে মাঝে ভক্তগণ দেয় হরিধ্বনি।
পুলকে পূরয়ে তনু গদগদ বাণী॥
তৈল মর্দ্দন তবে সমাপণ করি॥
শীতল সুগন্ধি জল আনে ত্বরা করি॥
ভক্তগণের অনুরোধে স্নান আরম্ভিল।
পূর্ণকুম্ভ কেহ শিরে ঢালিতে লাগিল॥
গামছা লইয়া কেহ অঙ্গ কচালয়।
আপনি স্বহস্তে সর্ব্ব অঙ্গে জল দেয়॥
সূক্ষ্মবস্ত্রে শ্রীঅঙ্গের জল দূর কৈল।
কৌপিন বহির্ব্বাস আনি অগ্রেতে ধরিল॥
পরিয়া বসন তবে হাসিতে হাসিতে।
শ্রীমন্দিরে চলিলেন দর্শন করিতে॥

করি দেব দরশন হই আনন্দে মগন
কিবা করে কেহ নাহি বুঝে।
কারে করে প্রণিপাত কারো বা ধরয়ে হাত
কারে বা তুলসীদলে পূজে॥
রাধাবিনোদিনী সনে করে কত আলাপনে
বিনোদের সনে পরিহাস।
সে লীলা মাধুরী দেখি জুড়ায় তাপিত আঁখি
হেরি হেরি না মিটয়ে আশ॥

দেব দরশন করি সমাপন।
গৃহে চলিলেন শ্রীরাধারমণ॥
সেবাপরা সখী আঁচল লই।
চরণযুগল মুছই দেই॥
আসনে বসিল হরিষ হই।
সকল ভকত মিলল যাই॥
কোন সখী তিলক ঘোরি।
রেখেছিল বাম হাতেতে ধরি॥
অনামা আঙ্গুলে তিলক লই।
দ্বাদশ অঙ্গে তিলক রচই॥
নামাঙ্কিত কৃষ্ণ চরণাঙ্কিত।
ছাপ দেয় সখী মনের মত॥
ইষ্টমন্ত্র স্তবে করিয়া স্মরণ।
আরম্ভিলা প্রভু নাম সংকীর্ত্তন॥

উঠিল মঙ্গল ধ্বনি নিতাই গৌরাঙ্গ।
অতি সুমধুর স্বরে বাজয়ে মৃদঙ্গ ॥
প্রেমানন্দে ভাসে সব ভকত মণ্ডলী।
সঙ্কীর্ত্তন করয়ে হইয়া কুতূহলী ॥
সুমধুর কণ্ঠস্বর মধুর কীর্ত্তন।
মধুর উপদেশ শুনি জুড়ায় শ্রবণ ॥
হা নিতাই হা গৌরাঙ্গ বলিয়া বলিয়া।
আঁখিনীরে মুখ বুক যায় যে ভাসিয়া ॥
ভাবনিধি প্রভু মোর ভাবে মাতোয়ারা।
ভাবাবেশে বলে মুখে গোরা গোরা গোরা ॥
গৌরাঙ্গ চাঁদ হের নয়নের কোণে।
স্মরণ লইনু তুয়া অভয় চরণে ॥
এতেক বলিতে প্রভু ঢলিয়া পড়িল।
যতনে ভকতগণ ধরিয়া তুলিল ॥
কি আনন্দ-সিন্ধু উথলিল সেইক্ষণ।
অভাগী করমদোষে না পাইল এককণ।
কতক্ষণ এইরূপে কীর্ত্তন করিতে।
দর্শনোৎকণ্ঠা সবার হইল মনেতে ॥
হরি বলি সংকীর্ত্তন কৈল সমাপন।
ললিতা করয়ে হেথা ভোগের আয়োজন ॥
তবে কোন সখী দিল স্থান উপস্করি।
শ্বেত পাথরের গ্লাসে সুবাসিত বারি ॥

———

মনের মতন করিয়া রন্ধন
যতনে রাখিয়াছিল।
সখী শ্রীললিতা হয়ে ত্বরান্বিতা
প্রসাদ লইয়া আইল॥
কহেন তখন শ্রীরাধারমণ
"রাখহ ধরিয়া এবে।
করি দরশন আসিয়া এখন
প্রসাদ পাইব তবে॥"
শুনিয়া তখন দাস দাসীগণ
বিষাদে মগন ভেল।
কাতর হইয়া চরণে ধরিয়া
বহুত মিনতি কৈল॥
প্রেমের বন্ধন ছাড়িতে নারিয়া
ভোজনে বসিলা তবে।
হই কুতূহলী কৃষ্ণতত্ত্ব কথা
পুছিতে লাগিল সবে॥
কৃষ্ণ কথা রসে ডুবল অমনি
অপরূপ ব্যবহার।
হ'য়ে আনমন করিছে ভোজন
বাহ্যস্মৃতি নাহি আর॥
মনোমত সব বাছিয়া ললিতা
শ্রীহস্তে তুলিয়া দেয়।
হাসিয়া হাসিয়া ভোজন করয়ে
যেন বালকের প্রায়॥

রসায় মাখিয়া প্রসাদ সকল
আগে ধরি ধরি দিল।
হয়ে প্রেমাধীন করিয়ে ভোজন
হেরি সবে সুখী হইল॥
ভোজন সমাপি করে জলপান
অতি আনন্দিত মনে।
যতন করিয়া সুবাসিত জলে
করাইল আচমনে॥
আচমন করি মু'খানি মুছিয়া
তাম্বূল লইয়া করে।
আনন্দে মগন শ্রীরাধারমণ
বসিল পালঙ্ক 'পরে॥
প্রসাদ সকল একত্র করিয়া
ভক্তগণে বাঁটি দিল।
সে অধরামৃত পাইয়া সকলে
আনন্দে মগন ভেল॥
চাদর বাঁধিয়া বাহিরে আসিয়া
হরিবোল ধ্বনি কৈল।
শুনি হরিধ্বনি ভকত সকল
আসিয়া একত্র হৈল॥
ভোজন বিলাসে যে আনন্দ ভেল
কার সাধ্য কেবা বলে।
যে জন দেখিল সে কিছু বুঝিল
তাঁহার করুণা-বলে॥

নিতাই গৌর রাধে শ্যাম কীর্ত্তন ধরিয়া।
চলিলা ভকতগণ সঙ্গেতে লইয়া॥
আগে আগে চলে প্রভু পিছে ভক্তগণ।
নিতাই চলিল যেন সঙ্গে নিজগণ॥
চলিয়া যাইতে যার সঙ্গে দেখা হয়।
দণ্ডবৎ করি সেই চরণে পড়য়॥
পরম করুণ প্রভু তারে কোলে করি'।
পাপ তাপ দুঃখ শোক দেন দূর করি'॥
এই মত প্রেমানন্দে নাচিতে নাচিতে।
উপনীত হইলেন সিংহদ্বারেতে॥
পতিত পাবন মূর্ত্তি করি দরশন।
বাহ্য নাহি ভাবাবেশে হইল মগন॥
হা নিতাই হা গৌরাঙ্গ বলিতে বলিতে।
বাহু দোলাইয়া যায় ঢুলিতে ঢুলিতে॥
শ্রীজগমোহনে যাই উপনীত ভেল।
জগন্নাথ-মুখ হেরি বিভোর হইল॥
চারিদিকে ভক্তগণ করয়ে কীর্ত্তন।
চরণে চরণ প্রভু, করেন নর্ত্তন॥
কিবা সে নৃত্যের ভঙ্গি কিবা ভাবোদ্গম।
কি মধুর পদাবলী অতি-মনোরম॥
শ্রীজগমোহন আজু হইল প্রেমময়।
যে শুনে যে দেখে তারও হয় প্রেমোদয়॥

জগমোহনেতে লোক অসংখ্য গণন।
সবেই কীর্ত্তন রসে হইল মগন॥
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ কাঁদে হাসে।
কেহ ভূমে গড়াগড়ি যায় ভাবাবেশে॥
কেহ কারো গলা ধরি কাঁদে উভরায়।
কর যুড়ি প্রভু ঠাঁই কেহ ভক্তি চায়॥
এই মতে কিছুক্ষণ করিয়া কীর্ত্তন।
ভক্তগণের শ্রম জানি কৈল সমাপন॥
সেবক প্রসাদী মালা চরণ-তুলসী।
আনি' প্রভু হাতে দিল হইয়া উল্লাসী॥
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু শ্রীরাধারমণ।
বিশ্রাম করয়ে হই' আনন্দে মগন॥

দেখিয়া প্রভুর শ্রান্তি, করিতে তাহার শান্তি,
নানা সেবা করে ভক্তগণ।
পাথরের মেজে ছিল, বসনে ঝাড়িয়া দিল,
তদুপরি করিল শয়ন॥
কেহ বস্ত্র ভাঁজ করি, বীজয়ে দুহাতে ধরি',
কেহ কর চরণ চাপয়।
কোন কোন ভাগ্যবানে, অতি হরষিত মনে,
পীঠা পানা প্রসাদ আনয়॥
কোন দাসে আজ্ঞা হৈল, সকল একত্র কৈল,
যার হয় যেমত বিধানে।

তবে মণ্ডলী বন্ধনে, বসাইয়া ভক্তগণে,
পরিবেশি করে সমাধানে ॥
সাশ্রু পুলক ভরে, প্রসাদ সেবন করে,
কি আনন্দ কহনে না যায়।
কেহ কারে তুলি দেয়, কেহ কারো কাড়ি খায়,
কেহ কারে যাচিয়া বেড়ায় ॥

প্রসাদ সেবন, সমাপি তখন,
অতি আনন্দিত মনে।
সকলে মিলিয়া, হরি হরি বলি,
চলে সমুদ্র সিনানে ॥
নাটুয়া ঠমকে, চলি যায় পথে,
সঙ্গে পারিষদগণ।
ব্যাকুল হৃদয়, যাইতে যাইতে,
গম্ভীরা হ'ল দর্শন ॥
ভাবের আবেশে, ভিতরে প্রবেশি,
হা গৌরাঙ্গ বলি' কাঁদে।
স্বরূপ রামরায়, দেহ দরশন,
চিত্ত স্থির নাহি বাঁধে ॥
সবারে ডাকিয়া, মরম উঘারি,
কহে তবে ধীরে ধীরে।
এই গম্ভীরায়, গৌরাঙ্গ আমার,
কত মত লীলা করে ॥

বিরহে ব্যাকুল, হঞা কোনদিন,
ভিতে মুখ সংঘর্ষণ।
কোনদিন কৃষ্ণে, দেখিয়া স্বপনে,
করে রাত্রি জাগরণ॥
স্বরূপের গান, রায়ের কবিতা,
দোঁহে প্রভুকে নাচায়।
কভু হাসে কাঁদে, কভু নাচে গায়,
কভু গড়াগড়ি যায়॥
অভাগা জনম, তখন না পাইনু,
এবে কিবা ফল হ'ল।
না দেখি সে লীলা, বিদরয়ে বুক,
কেমনে পাইব বল॥
এই ত গম্ভীরা, এই ভক্তগণ,
কাঁহা শচীর নন্দন।
পরাণ পুতলী, গৌরাঙ্গ আমার,
কেন হৈল অদর্শন॥
কাঁহা মোর প্রাণ, স্বরূপ গোসাঞি,
গৌর-লীলা-সহচর।
কাঁহা রামানন্দ, রসের মূরতি,
রসময় কলেবর॥
এই নিবেদন, দোঁহার চরণে,
তোমা দোঁহাকার সনে।
দেখাও একবার, পরাণ গৌরাঙ্গ,
কৃপা করি দীনহীনে॥

বিষাদে মগন, শ্রীরাধারমণ,
ভূমেতে পড়িল ঢলি’।
ভাবে অচেতন, দেখি ভক্তগণ,
কোলেতে লইল তুলি ॥
হা গৌরাঙ্গ বলি, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
ডাকয়ে কাতরে সবে।
কর্ণমূলে কেহ, শ্রীগৌরাঙ্গ নাম,
কহে অতি উচ্চ-রবে ॥
ক্ষণেক অন্তর, চমকি উঠিয়া,
বলে হায় কিবা হইল।
এই যে পাইনু, পরাণ রতন,
কেবা তারে হরি নিল ॥
কহে কোন এক, ভাবের ভাবুক,
সঙ্গে স্বরূপ রামরায়।
ভাবের আবেশে, গৌরাঙ্গ নাটুয়া,
সমুদ্র সিনানে যায় ॥
শুনিয়া অমনি, শ্রীরাধারমণ,
ভাবে বেয়াকুল হঞা।
বলে চল সবে, দেখিব গৌরাঙ্গে,
সমুদ্র সিনানে যাঞা ॥
ভাবের আবেশে, নাচিতে নাচিতে,
সঙ্গে সব ভক্তগণ।
গম্ভীরা হইতে, সমুদ্রের পথে,
সুখে করয়ে গমন ॥

ভাবে বিভাবিত প্রভু চ'লে যায় পথে।
কখন কি ভাব কেহ না পারে বুঝিতে॥
কভু দ্রুতগতি কভু চলে ধীরে ধীরে।
কভু হা গৌরাঙ্গ বলি ডাকে সকাতরে॥
কভু উর্দ্ধ দৃষ্টি কভু ইতি উতি ধায়।
কভু বা নয়ন মুদি থমকি দাঁড়ায়॥
বালুকা পর্ব্বত এক সম্মুখে দেখিয়া।
আকুল হইয়া তথা উঠিলেন গিয়া॥
তাহার নিকটে এক বট বৃক্ষ আছে।
আবেশে মগন দাঁড়াইল তার কাছে॥
আথে ব্যথে যাই তার তলেতে বসিয়া।
ভক্তগণে ডাকি কহে কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
স্বরূপের সনে হেথা গৌরাঙ্গ দেখিনু।
আসিতেই আর তারে লাগি না পাইনু॥
এই বনে বৃন্দাবন দেখে গোরা রায়।
এই বটে বংশীবট ভাবয়ে সদায়॥
এই গিরি গোবর্দ্ধন ভ্রম জন্মাইল।
শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে হেথা আকুল হইল॥
ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে ভোরা।
দিবানিশি কাঁদে ভাবে হঞা মাতোয়ারা॥
স্বরূপের সনে হেথা গৌরাঙ্গ-আবেশ।
কোন দাসে পড়িবারে করেন আদেশ॥
তবে সেই ভাগ্যবান্ প্রভুর প্রিয় দাসে।
চরিতামৃতের কথা পড়য়ে উল্লাসে॥

"প্রভু কহে কৃষ্ণ মুঞি এথানে পাইনু।
আপন দুর্দ্দৈব দোষে পুনঃ হারাইনু॥
চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের না রহে একস্থানে।
দেখা দিয়া মন হরি করে অন্তর্দ্ধানে॥
স্বরূপ গোসাঞিকে কহে গাও এক গীত।
যাহাতে আমার চিত্ত হয় ত সম্বিত॥

শুনিয়া স্বরূপ গোসাঞি মধুর করিয়া।
গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভুকে শুনাইয়া॥
"রাসে হরিমিহ বিহিত বিলাসম্।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্॥"
স্বরূপ গোসাঞি যবে এই পদ গাইলা।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু নাচিতে লাগিলা॥
অষ্ট সাত্ত্বিক অঙ্গে প্রকট হইল।
হর্ষ আদি ব্যভিচারী সব উথলিল॥
ভাবোদয় ভাবসন্ধি ভাবশাবল্য।
ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ সবার প্রাবল্য॥
এক এক পদ পুনঃ পুনঃ করায় গায়ন।
পুনঃ পুনঃ আস্বাদয়ে বাড়য়ে নর্ত্তন॥
এই মত নৃত্য যদি হইল বহুক্ষণ।
স্বরূপ গোসাঞি পদ কৈল সমাপন॥
বোল বোল বলি প্রভু বলে বার বার।
না গায় স্বরূপ গোসাঞি শ্রম জানি তাঁর॥
বোল বোল প্রভু কহে ভক্তগণ শুনি'।
চৌদিকে সবে মেলি' করে হরিধ্বনি॥

রামানন্দ রায় তবে প্রভুকে বসাইল।
ব্যজনাদি করি প্রভুর শ্রম দূর কৈল॥
প্রভু লইয়া গেলা সবে সমুদ্রের তীরে।"
এত শুনি ভাবাবিষ্ট শ্রীরাধারমণ।
বিরহে ব্যাকুল চিত্ত বিষাদে মগন॥
তরুতলে কিছুক্ষণ করিয়া কীর্ত্তন।
সমুদ্র সিনানে তবে করেন গমন॥
তরঙ্গ দেখিয়া রঙ্গে বলয়ে তখন।
সমুদ্রের মহাভাগ্য দেখ ভক্তগণ॥
পূর্ব্বেতে সমুদ্র এই মহাতীর্থ ছিল।
প্রভু-স্পর্শে মহামহা তীর্থরাজ হইল॥

মহাপ্রভুর শ্রীচরণ করি আলিঙ্গন।
তরঙ্গের ছলে সুখে করিছে নর্ত্তন॥
এই তীরে মহাপ্রভুর বিহার দেখিয়া।
তীরে গড়াগড়ি দেয় প্রেমাবিষ্ট হইয়া॥

এ হেন ভকত রাজের করুণা হইলে।
শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্গ তার অনায়াসে মিলে॥
এত বলি প্রেমাবেশে শ্রীরাধারমণ।
ঊর্দ্ধ বাহু করি নৃত্য করি কতক্ষণ॥

পুলকাশ্রু-ভরে তীরে দেন গড়াগড়ি।
আনন্দে করেন স্নান বলি গৌরহরি॥
তরঙ্গের মাঝে সবে যায় সাঁতারিয়া।
কেহ বা কাহারও পায় ধরয়ে ডুবিয়া॥

কেহ কারে কাঁধে করি নাচে উভরায়।
কেহ বা কাহারে ধরি দূরে লইয়া যায়॥
এ হেন আনন্দে সবে করয়ে সিনান।
সবেই বিভোর নাহি ভেদাভেদ জ্ঞান॥
এই মত কতক্ষণ আনন্দে মাতিয়া।
তীরে উঠিলেন জলকেলি সমাপিয়া॥
অঙ্গ মুছি শুষ্ক বস্ত্র করি পরিধান।
সবে মেলি তীর্থরাজে করয়ে প্রণাম॥
দেখিবারে হরিদাসের সমাধি-মন্দির।
প্রভুর হৃদয় অতি হইল অথির॥
চরণে চরণ চলে নাচিতে নাচিতে।
হরিদাস ঠাকুরের দর্শন করিতে॥
উচ্চৈঃস্বরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলি।
দণ্ডবৎ পরিক্রমা করে কুতূহলী॥
নিতাই গৌর সীতানাথ করি দরশন।
ভাবেতে বিভোর করে কীর্ত্তন নর্ত্তন॥
এই মত কিছুক্ষণ করি সংকীর্ত্তন।
ভক্তগণের শ্রম জানি কৈল সমাপন।
মহাপ্রভুর অগ্রে তবে দণ্ডবৎ কৈল।
পূজারী প্রসাদী মালা আনি গলে দিল॥

আনন্দে মগন, সবাকার মন,
আনন্দময়ের সঙ্গে।
যেখানে যখন, যায় তারা সব,
ভাসয়ে প্রেমতরঙ্গে॥
তথায় হইতে, বাহির হইলা,
সঙ্গে লঞা ভক্তগণে।
চলিতে চলিতে, উত্তরিলা যাই,
শ্বেত গঙ্গা সন্নিধানে॥
শ্বেত গঙ্গাজল, পরশ করিয়া,
হাত মুখ পাখালিলা।
সার্ব্বভৌমালয়, শোভে তার তীরে,
সকলে প্রবেশ কৈলা॥
কীর্ত্তন-আনন্দে, দরশন করি,
বন্দি সবার চরণ।
জগন্নাথ দেবে, প্রদক্ষিণ করি,
সবে করয়ে গমন॥
হেনমতে চলি, বড় দাণ্ড বাটে,
কুণ্ডাইবেণ্টসাহি দিয়া।
ভক্তগণ লই, ঝাঁজপীটা মঠে,
প্রবেশ করিলা গিয়া॥

মধ্যাহ্ন-লীলা

সেবাপরা সখী শীতল নীরে।
পাখালি চরণ মুছল চীরে॥

প্রেমভরে প্রভু মুচকি হাসি।
মন্দির নিকটে দাঁড়াল আসি॥
মধ্যাহ্ন মিলন হইল যবে।
শ্রীকুণ্ড আরতি দেখিয়া তবে॥
আসন উপরে বসিলা যাই।
ব্যজনে বীজয়ে সখিনী আই॥
কেহ বা চরণ চাপয়ে ধীরে।
কেহ বা শ্রীঅঙ্গ মর্দ্দন করে॥
সুবাসিত তৈল দেয়ল শিরে।
স্নিগ্ধ করয়ে শীতল নীরে॥
শৌচক্রিয়া তরে চলয়ে তবে।
জলপাত্র লই চলিলা সবে॥

———

শৌচক্রিয়া সমাপন, করি শ্রীরাধারমণ,
ধীরে ধীরে আসিলা বাহিরে।
করেতে মৃত্তিকা দেই, জল দিয়া পাখালই,
চরণ ধোয়ায় যত্ন ক'রে॥
আঁখি মুখ পাখালিয়া, গামছায় মুছাইয়া,
কৌপীন বহির্ব্বাস আনি দিল।
বস্ত্র পরি হাসি হাসি, শ্রীরাধারমণ শশী।
গৃহে আসি উপনীত হইল॥

কেহ স্থান উপস্করি, রেখেছে আসন করি,
ধীরি ধীরি তাহাতে বসিল।
হেথা সখী শ্রীললিতা, হ'য়ে অতি ত্বরান্বিতা,
মহাপ্রসাদ আনি ধরি দিল॥
আনন্দে রাধারমণ, করে প্রসাদ সেবন,
হেরি সবে সুখেতে মগন।
ভাসি' প্রেমসিন্ধু-নীরে, কেহ বা বীজন করে,
করি কত রস আলাপন॥

ভোজন সারিয়া প্রভু কৈল আচমন।
খড়িকায় করিলেন দন্ত শোধন॥
মু'খানি মুছিয়া যাই পালঙ্কে বসিল।
সেবাপরা সখী করে তাম্বুল দেয়ল॥
তাম্বুল চর্ব্বণ করি শ্রীরাধারমণ।
পালঙ্ক উপরে সুখে করেন শয়ন॥
নানামতে সেবা করে যত সখীগণ।
কেহ মৃদু মৃদু করে চরণ সেবন॥
স্নিগ্ধ সুবাসিত তৈল কেহ দেয় শিরে।
কেহ বা ব্যজনে মৃদু বীজন করে॥
স্নিগ্ধ তৈল দেয় কেহ শ্রীচরণতলে।
শীতল করয়ে কেহ সুশীতল জলে॥
পালঙ্কে শুতিয়া প্রভু সুখে নিদ্রা যায়।
হেরিয়া ভকতগণ আনন্দে মাতয়॥

প্রভুর অধরামৃত লইয়া ললিতা।
সবারে বাঁটিয়া দেয় হই' হরষিতা॥
সবাকারে করাইয়া প্রসাদ সেবন।
অবশেষে লই নিজে করয়ে ভোজন॥
ভোজন সারিয়া সবে বিশ্রাম করিল।
যার যেই সেবাকার্য্য করিতে লাগিল॥

———

অপরাহ্ণ-লীলা

বেলা অবসান জানি শ্রীরাধারমণ।
নিদ্রা ত্যজি উঠিলেন আনন্দিত-মন॥
শৌচক্রিয়া পূর্ব্ববৎ সমাধান করি।
বসিলেন হাসিমুখে চৌকির উপরি॥
ঠাকুর মন্দিরে হেথা শীতল ভোগ হইল।
শীতলী প্রসাদ আনি সম্মুখে ধরিল॥
নানাবিধ ফলমূল করি দরশন।
আনন্দে কিছু কিছু করেন গ্রহণ॥
সুগন্ধি শীতল জল কিছু পান কৈল।
সুবাসিত জলে হাত মুখ পাখালিল॥

———

তাম্বূলে পূরিত, রজতের ডিবা
কেহ বা আনিয়া দিল।
উজ্জ্বল পিক্‌দানি, লইয়া যতনে,
বাম দিকে কেহ থুইল॥

হাসিয়া হাসিয়া, তাম্বুল লইয়া
সুখে করয়ে সেবন।
চারিদিকে ঘেরি, ভকত-মণ্ডলী
করে প্রেম আলাপন॥
তারকা-মণ্ডল, বেষ্টিত কিবা
পূর্ণ শশধর রাজে।
অথবা ভকত, মণ্ডলী লইয়া,
রঙ্গিয়া নিতাই সাজে॥
আহা মরি মরি, কিরূপ মাধুরী
ভুবনমোহন রূপ।
কি দিব তুলনা, জগতে মিলে না,
(যেন) অমিয়-রসের কূপ॥
কেহ বা পুছয়ে, কৃষ্ণতত্ত্ব-কথা,
আশ্রয় বিষয় ভাব।
কেহ বা পুছয়ে, গৌরাঙ্গ সুন্দর,
কেমনে হইবে লাভ॥
কেহ কর যুড়ি, বলয়ে কাতরে,
মোর এই নিবেদন।
ভাবনিধি হয়, গৌরাঙ্গ সুন্দর,
কি ভাব করি গ্রহণ॥
হাসিয়া বলেন, শুন ভক্তগণ,
গৌরাঙ্গ-ভজন কথা।
নিতাই গৌরাঙ্গ, মিলিবে সহজে,
ঘুচিবে মনের ব্যথা।

তিন বাঞ্ছা পূরাইতে যবে মন হৈল ।
শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার কৈল ॥
অবতারী কৃষ্ণ যবে অবতীর্ণ হৈল ।
সর্ব্ব অবতার ভাব তাহাতে মিশিল ॥
ভক্ত আবরণে তারে রাখিল ঢাকিয়া ।
অনল রাখয়ে যৈছে বস্ত্র আচ্ছাদিয়া ॥
বিদ্যারসে নবদ্বীপে কিছুদিন গেলা ।
সংকীর্ত্তন-লীলা প্রভু প্রকট করিলা ॥
কিছুকাল পরে তবে সন্ন্যাস করিয়া ।
নীলাচলে করে বাস মাতৃ-আজ্ঞা লঞা ॥
দ্বাদশ বৎসর ভক্ত সঙ্গে নানা লীলা ।
তীর্থ ভ্রমণ আদি কত আচরিলা ॥
দ্বাদশ বৎসর শেষ রাধা-ভাবাবেশে ।
গম্ভীরায় কাটা'লেন রজনী দিবসে ॥
মধুর ভাবের উপাসক যেই জন ।
গৌরাঙ্গের রাধাভাব করিবে গ্রহণ ॥
ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গে ভাবের শাবল্য
সব ভাব হইতে রাধাভাবের প্রাবল্য ॥
ললিতা বিশাখা হয় স্বরূপ রামরায় ।
শ্লোক গীতে মহাপ্রভুর সুখ উপজয় ॥
অন্যভাবে ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তন নর্ত্তন ।
দোঁহা সনে রাধাভাবে কৃষ্ণ আস্বাদন ॥
সব ভাব হইতে গোরার রাধাভাব সার ।
রাধিকার ভাবে হয় সুখ পারাবার ॥

গোপীভাব নিজদেহে অঙ্গীকার করি।
গুরু-আনুগত্যে সদা চিন্ত গৌরহরি॥
গৌরাঙ্গ শ্রীরাধারাণী শ্রীগুরু মঞ্জরী।
তাঁর দাসীভাব সদা অঙ্গীকার করি॥
এইভাবে গৌরলীলা করিলে ভাবন।
হেথায় গৌরাঙ্গ পাবে ব্রজে কৃষ্ণধন॥
কারো কোন ভাব কভু নিন্দা না করিবে।
নিন্দা-শূন্য নম্রভাবে গৌরাঙ্গ ভজিবে॥
যার যেই ভাব সেই হয় সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তারতম॥
এই মত কথামৃত সিন্ধু উথলিল।
যার যত তৃষ্ণা সেই তত পান কৈল॥
সৎসঙ্গ-প্রভাবে সেই তরঙ্গে ডুবিনু।
আপন স্বভাব দোষে বিন্দু না পাইনু॥

সায়ংকাল-লীলা

এই মত কতক্ষণ, করি কৃষ্ণ আলাপন,
তবে প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভিলা।
ভাবে মাতোয়ারা হঞা, খোল করতাল লইয়া,
হরি বলি বাহিরে চলিলা॥
অতি দ্রুতবেগে ধাই, জগন্নাথ বল্লভে যাই,
বসিয়া বকুল তরু তলে।
ভক্তগণে ডাকি বলে, এই না তরুর তলে,
বসি গোরা ভাসে অশ্রুজলে॥

এ হেন সময়কালে, রামানন্দ আসি মিলে,
সঙ্গে লইয়া স্বরূপ দামোদর ।
বলে ঐ দেখ গোরা, বিরহে হয়ে বিভোরা
কাঁদে অতি আকুল অন্তর ॥
আগে দেখি দুইজন, প্রভু বলে সখীগণ,
শুন মোর মরম বেদন ।
না দেখি সে চাঁদমুখ, বিদরিয়া যায় বুক,
কাঁহা সেই মুরলী বদন ॥
কৃষ্ণরূপামৃত সিন্ধু, তাহার তরঙ্গ-বিন্দু,
সেই বিন্দু জগত ডুবায় ।
ত্রিজগতে যত নারী, তার চিত্ত উচ্চগিরি,
তাহে ডুবায় আগে উঠি ধায় ॥
কৃষ্ণ-বচন-মাধুরী, নানা-রস-নর্ম্ম-ধারী,
তার অন্যায় কহনে না যায় ।
জগত-নারীর কাণে, মাধুরী গুণে বাঁধি টানে,
টানাটানি কাণের প্রাণ যায় ॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ সুশীতল, কি কহিব তার বল,
ছটায় জিনে কোটীন্দু চন্দন ॥
সশৈল নারীর বক্ষ, তাহা আকর্ষিতে দক্ষ,
আকর্ষয়ে নারীগণ মন ॥
কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভ্যভর, মৃগমদ-মদ-হর,
নীলোৎপলের হরে গর্ব্বধন ।
জগত-নারীর নাসা, তার ভিতর করে বাসা,
নারীগণে করে আকর্ষণ ॥

কৃষ্ণের অধরামৃত, তাতে কর্পূর মন্দস্মিত,
স্বমাধুর্য্যে হরে নারীগণ।
অন্যত্র ছাড়ায় লোভ, না পাইলে মনঃ-ক্ষোভ,
ব্রজনারীগণের মূলধন॥
এত কহি গৌরহরি দু'জনার কণ্ঠে ধরি,
বলে সখি কহ না উপায়।
কাঁহা করো কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
কৃষ্ণ বিনে প্রাণ মোর যায়॥

———

প্রদোষ-লীলা

তখন স্বরূপ, গায় অপরূপ
(ঐ বাজে) গোকুল-মঙ্গল-বংশী।
চলহ ত্বরিতে, দেখিবে সাক্ষাতে,
মনচোরা কালশশী॥
এতেক বলিয়া, ভাবাবিষ্ট হইয়া,
প্রভু শ্রীরাধারমণ।
(বলে) ঐ যায় গোরা, চল যাই মোরা,
দেখি যুগল মিলন॥
(বলি) দুটি বাহু তুলি, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি,
ভক্তগণ করি সঙ্গে।
অভিসারিণীর, ভাবে বিভাবিত,
চলে করি কত রঙ্গে॥
যাইতে যাইতে, অতি আচম্বিতে,

দেখে টোটা-গোপীনাথে।
অপরূপ সাজে, মন্দিরে বিরাজে
রাধিকা ললিতা সাথে॥
(বলে) ঐ দেখ মোর, গৌরাঙ্গ সুন্দর,
অতি উৎকণ্ঠিত হঞা।
অতি সসম্ভ্রমে, দাঁড়াইল বামে,
পরাণ-নাথেরে পাঞা॥
ঐ যে ললিতা, অতি গরবিতা,
স্বরূপ হইলা আসি।
রায় যে বিশাখা, হইয়া উৎসুকা,
কাননে চলিলা হাসি॥
গাঁথি ফুলহার, গলে দোঁহাকার,
পরাইতে সযতনে।
উৎকণ্ঠিত মতি, অতি দ্রুতগতি,
গেল পুষ্প অন্বেষণে॥

কি আশ্চর্য্য হেনকালে উড়িয়া এক নারী।
পুষ্পমালা হাতে লই আইল ত্বরা করি॥
অতি ব্যাকুলিতা হই বলয়ে তখনে।
দুঁহু গলে দেহ মালা দেখিব নয়নে॥
মালা দেখি আনন্দিত শ্রীরাধারমণ।
সে নারীকে দণ্ডবৎ করে ভক্তগণ॥
আনন্দে পূজারী মালা দুঁহু গলে দিল।
হেরিয়া ভকতগণ আনন্দে মাতিল॥

তবে খোল করতাল সুমেলি করিয়া।
গাইতে লাগিল সবে প্রেমেতে মাতিয়া ॥
"নব অনুরাগিণী নব অনুরাগ।
তনু তনু মিলল গলে গল লাগ ॥
তঁহি এক রঙ্গিণী পরম রসাল।
দুঁহু গলে দেয়ল এক ফুল মাল ॥
টুটব ভয়ে দুঁহু পড়ু এক বন্ধ।
দৈবে ঘটায়ল প্রেম আনন্দ ॥
মরম সোহাগিনী (তার) রাখিল নাম।
দূর হইতে সোই সখী করু পরণাম ॥
সখীমুখ হেরইতে উলসিত ভেল।
দুঁহু মেলি মালা সখীগলে দিল ॥"
এত বলি সবে মিলি নাচিতে লাগিল।
পূজারী প্রসাদী মালা আনি গলে দিল ॥
মালার পরশে প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা।
ভূমেতে পড়িল ঢলি 'জয় রাধে' বলিয়া ॥
আথে ব্যথে ভক্তগণ কোলেতে তুলিয়া।
কর্ণমূলে কৃষ্ণ কহে উচ্চ করিয়া ॥
ভাবে অচেতন প্রভু বোল বোল বলে।
চারিদিকে ভক্তগণ গায় কুতূহলে ॥
এই মত কতক্ষণ আনন্দে মাতিয়া।
উঠিয়া বসিলা কিছু চৈতন্য পাইয়া ॥
পুলিন ভ্রমণ কথা হইল স্মরণ।
সমুদ্রের তীরপানে করেন গমন ॥

সমুদ্রের তীর হয় অতি সুখময়।
নিরজন, সুশীতল-সমীরণ বয় ॥
যমুনা-পুলিন ভাণে লাগিল ভ্রমিতে।
আনন্দে ভকতগণ লাগিল গাহিতে ॥
"যমুনা-পুলিন কেশীঘাট বংশীবট রে।
তীরে নীরে বিহরই রমণী-লম্পট রে ॥"
এই মত করিতেই পুলিন ভ্রমণ।
ভাগ্যবান্ কোন ভক্ত কৈল আকর্ষণ ॥
চলিলেন ভক্তগৃহে কীর্ত্তন লইয়া।
চরণে চরণ দেই নাচিয়া নাচিয়া ॥
কতক্ষণে ভক্তগৃহে উপনীত হইল।
ভক্ত আসি সবাকারে দণ্ডবৎ কৈল ॥
প্রেমানন্দে মাতি করি কীর্ত্তন নর্ত্তন।
বসিলেন মহাপ্রসাদ করিতে সেবন ॥
আনন্দের অবধি নাই প্রসাদ সেবনে।
নিতাই-গৌরাঙ্গ-গুণ গায় ভক্তগণে ॥
কেহ বা গৌরাঙ্গ-গুণ করয়ে বর্ণন।
নিতাই-গুণ গায় কেহ আনন্দিত মন ॥
অভিন্ন নিতাই মোর শ্রীরাধারমণ।
নিতাই-গৌর-গুণ শুনি ব্যাকুলিত মন ॥
অবিরত প্রেমধারা বহে দু'নয়নে।
পুলকে পূরয়ে তনু গদগদ বচনে ॥
ভাবেতে বিহ্বল প্রভু বসিয়া রহিল।
প্রসাদ ভোজন কথা বিস্মৃত হইল ॥

হেরিয়া ভকতগণ বিষাদিত মন।
স্থির করিবারে সবে করয়ে যতন॥
অতি সন্তর্পণে কিছু বাহ্য প্রকাশিয়া।
কিঞ্চিৎ প্রসাদ পায় আনমনা হইয়া॥
মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া সমাপন।
হরি বলি উঠি সবে করে আচমন॥
খড়িকায় করিলেন দন্তশোধন।
পাতল চীরে মুখ মুছল তখন॥
বাসিত তাম্বুল কেহ করে সমর্পিল।
হাসি হাসি প্রভু সুখে চর্ব্বণ করিল॥
মিষ্ট-বাক্যে সবাকার মন সন্তোষিয়া।
হরি বলি চলিলেন নিজগণ লইয়া॥
স্থাবর জঙ্গম পশু পক্ষী আদি করি।
সবাকার মন তোষে শুভ-দৃষ্টি করি॥

নিশার্দ্ধ-লীলা

'নিতাই গৌর রাধে শ্যাম' বলিতে বলিতে।
ভকত-মণ্ডলী লই নাচিতে নাচিতে॥
নিশার্দ্ধ সময়ে প্রভু আশ্রমে আইল।
শীতল-জলে ললিতা পদ পাখালিল॥
কুসুম-আঁচলে মুছে যুগল-চরণ।
পালঙ্ক উপরে সুখে করিল শয়ন॥
সুবাসিত-স্নিগ্ধ-তৈল করেতে লইয়া।
মস্তকেতে দেয় কেহ যতন করিয়া।

কেহ পদতলে দেয় অতি সযতনে।
করতলে দেয় কেহ উল্লাসিত মনে॥
কেহ ব্যজন লই করয়ে বীজন।
নানামত ভাবে সবে করয়ে সেবন॥
সুখে নিদ্রা যায় প্রভু পালঙ্ক উপরে।
হেরিয়া সকলে ভাসে আনন্দ-সাগরে॥
নিজ নিজ স্থানে সবে সুখে নিদ্রা যায়।
ভাবের সাগরে কেহ ভাসিয়া বেড়ায়॥
এই ত কহিলাম প্রভুর অষ্টকাল লীলা।
নীলাচলে ভক্ত-সঙ্গে যাহা আচরিলা॥
মুঞি ক্ষুদ্র একদিন যে লীলা দেখিনু।
শক্তি অনুসারে তার কিঞ্চিৎ লিখিনু॥
আমি লিখি এহো হয় বৃথা-অভিমান।
অবলা আমার কিছু নাহি ভক্তিজ্ঞান॥
যাহা লিখাইল তাঁর পরিকরগণ।
কাষ্ঠের পুতলী তাহা করিনু লিখন॥
সব ভক্তগণের পায় এই নিবেদন।
ইথে অপরাধ মোর না কর গ্রহণ॥
নিজ পরিচয় দিতে বড় লাজ বাসি।
প্রভুদত্ত নাম লবঙ্গ-মঞ্জরী-দাসী॥
বাসস্থানের কিছু নাহিক নিয়ম।
নীলাচল নবদ্বীপ কভু বৃন্দাবন॥
সবার চরণে মুঞি করি এ মিনতি।
দয়া কর গুরুপদে থাকে যেন মতি॥

সুখে বা দুখেতে থাকি যে ভাবে যখন।
গুরুকৃপা কভু যেন না হয় বিস্মরণ॥
দয়ার আধার গুরু অপার মহিমা।
এ তিন ভুবনে যাঁর নাহিক উপমা॥
সংসার-অন্ধকূপে আছিনু পড়িয়া।
কেশে ধরি উদ্ধারিলেন করুণা করিয়া॥
অযাচিত কৃপাকারী হেন কেবা আছে।
পাপ বিনিময়ে আর কেবা প্রেম যাচে॥
শ্রীগুরুচরণ-পদ্ম করিয়া বন্দন।
অষ্টকাল লীলা এবে কৈল সমাপন॥

দ্বিতীয়বার দুর্গাপূজা

কাল কাহারও বাধ্য নহে—দেখিতে দেখিতে শরৎকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। মহাধূমধামের সহিত শারদীয়া দুর্গাপূজার আয়োজন হইতে লাগিল। ইঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইল জানি না, অধিবাসের দিন আশ্রমস্থ গণেশ মহাপাত্র নামক ব্রাহ্মণটীকে ডাকিয়া বলিলেন— "আগামী কল্য হইতে তিন দিবস মা যোগমায়ার আরাধনার ভার আপনার উপর দেওয়া হইল। আপনি বিশেষ ভক্তিভাবে মায়ের আরাধনা করিবেন।"

মহাপাত্র। এ ত আমার পরম সৌভাগ্য! কোন্ পুরাণান্তর্গত প্রণালীতে মায়ের আরাধনা হইবে?

বাবাজী। যদিও পূজাটী বৃহন্নন্দীকেশ্বর পুরাণান্তর্গতই বটে; কিন্তু পূজার ক্রম বা মন্ত্রাদির কিছু পার্থক্য আছে।

মহাপাত্র। কিরূপ পার্থক্য বা ক্রম আমাকে বলিয়া না দিলে ত আমি করিতে পারিব না।

বাবাজী। হাঁ, আমি যেরূপ বলিয়া দিব, সেইরূপভাবে আপনি কার্য্য করিবেন।

মহাপাত্র। আজ একবার শুনাইলে ভাল হইত না কি?

বাবাজী। ব্রজগোপীগণ যেরূপে কাত্যায়নী দেবীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত মন্ত্র যাহা গোস্বামীপাদগণ উদ্ধার করিয়াছেন, সেই মন্ত্র এবং পুরাণীয় কিছু কিছু মন্ত্র দ্বারা পূজা করিতে হইবে। সর্ব্বাগ্রে শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা করিয়া তন্নিবেদিত বস্তু দ্বারা এবং আতপ তণ্ডুল নৈবেদ্য দ্বারা সপরিকর যোগমায়ারূপিণী দেবীর আরাধনা করিতে হইবে। অর্থাৎ একমাত্র গোপীভাবে ব্রজেন্দ্র-নন্দন-কৃষ্ণপ্রাপ্তি কামনা করিয়া যথোপস্থিত দ্রব্য দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক মায়ের আরাধনা করা এইটী আমার উদ্দেশ্য।

শুনিয়া মহাপাত্র বড়ই আনন্দিত হইলেন। পরদিবস যথাসময়ে পূজা আরম্ভ হইল। বাবাজী মহাশয়ের মুখ হইতে গোপীদিগের প্রার্থনা মন্ত্রসকল শুনিয়া মহাপাত্রের হৃদয় গলিয়া গেল। পূজা-অন্তে কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন—"বাবাজী মহাশয়! আমি বহুদিন বহু বহু কাম্য বা নিষ্কাম কর্ম্মাদি করিয়াছি; কিন্তু এরূপ সারগর্ভ ভগবৎ-কামনাপূর্ণ নিষ্কাম কর্ম্ম আজ পর্য্যন্ত আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। আজ আপনার কৃপায় আমি যে কিরূপ আনন্দলাভ করিলাম, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার সাধ্য আমার নাই। আজ আমার জীবন সার্থক হইল।"

বাবাজী। বাবা! আপনারা ত আমাদের গোস্বামিপাদগণের গ্রন্থ অনুশীলন করেন না; করিলে দেখিতে পাইবেন যে উপাসনা-পদ্ধতি কত আনন্দপ্রদ।

মহাপাত্র। বাবা! আপনার কৃপা হইলেই হইতে পারিবে, নচেৎ আমরা এমন কি ভাগ্য করিয়াছি যে সেই সমস্ত দেখিতে পাইব?

এইরূপ নানা কথোপকথনে কিছু সময় কাটিয়া গেল। এ দিকে অন্নভোগের সময় হইলে মায়ের অন্ন ভোগ দিবার পর মানসে শয়ন অর্থাৎ মন্ত্রশয়ন দেওয়া হইল। এইরূপ ভাবে তিন দিন মায়ের আরাধনা করতঃ পূর্ব্ববৎ বিজয়াকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক মাকে সমুদ্র দর্শন স্পর্শন করাইয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীপাদ রঘুনাথ দেব গোস্বামীর ব্যাধিমোচন

একদিন বাবাজী মহাশয় ঝাঁজপীটা মঠে বসিয়া আছেন—বেলা অনু-মান চারিটা; বহু ভক্তগণসঙ্গে নানারূপ ভগবৎপ্রসঙ্গ হইতেছে, এই সময় একজন আসিয়া বলিল—"আজ্ঞে! রাজগুরু রঘুনাথ দেব গোস্বামীর শরীর খুব খারাপ, বহুমূত্র রোগে বড়ই কষ্ট পাইতেছেন। ডাক্তার কবি-রাজ একপ্রকার নিরাশ হইয়া গিয়াছেন। এ যাত্রা জীবন রক্ষা পাওয়া দুষ্কর। আহার একেবারেই নাই। ঘণ্টায় পাঁচ ছয়বার প্রস্রাব হইতেছে। ডাক্তারী, কবিরাজী, হাকিমী প্রভৃতি কোনরূপ ঔষধে কিছু ফল হইতেছে না দেখিয়া সকলেই হতাশ হইয়াছে।" কথাটী শুনিবামাত্র বাবাজী মহাশয় একটু ব্যস্তসমস্তভাবে বলিলেন, "এমন কঠিন পীড়া হইয়াছে আমি ত শুনি নাই। নিতাইএর ইচ্ছায় চল একবার দেখিয়া আসি।" বলিয়া প্রভুপাদের বাড়ী গমন করিলেন। ইঁহাকে দেখিবামাত্র প্রভুপাদ অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন—"দাদা! আমার উঠিবার বা কথা কহিবার সাধ্য নাই, এই জীবনের শেষ অবস্থা; একবার দর্শন পাইয়া আনন্দিত হইলাম, এইক্ষণ চিরবিদায় প্রার্থনা।"

বাবাজী মহাশয় নিমীলিতনেত্রে প্রভুপাদের বুকের উপর দক্ষিণ হস্ত-

খানি রাখিয়া স্থিরভাবে উঁহার কথা শুনিতেছিলেন, প্রভুর কথা শেষ হইতে না হইতেই কম্পিতকলেবরে "জয় নিতাই" বলিয়া হুঙ্কার করতঃ গদগদকণ্ঠে বলিলেন—"ভয় কি ভাই! তুমি সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ, তোমার দেহে রোগাগ্নি আসে কেবল কৃপালাভের জন্য, ভাল হইয়া যাইবে, নিতাইএর ইচ্ছায় কোন চিন্তার প্রয়োজন নাই।" ইঁহার মুখের আশ্বাসবাণী শুনিয়া প্রভুপাদের বাটীস্থ আত্মীয় স্বজনগণের নিরাশ প্রাণে যেন কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল। ইনি সাশ্রুগদগদকণ্ঠে "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এই নাম ধরিলে উপস্থিত ভক্তগণ কাতরস্বরে ইঁহার সঙ্গে সঙ্গে নাম করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ নাম হইতে লাগিল, হঠাৎ বাবাজী মহাশয় প্রভুপাদের দক্ষিণ হস্তখানি নিজ বক্ষঃস্থলে এবং নিজ দক্ষিণ হস্তখানি প্রভুপাদের বক্ষঃস্থলে রাখিয়া মুদ্রিত নয়নে কি প্রার্থনা করিতেছেন, আর নয়নজলে মুখবুক ভাসিয়া যাইতেছে। প্রায় পনের মিনিট পরে স্বেদ, কম্প, পুলকাদি-পরিব্যাপ্ত কলেবরে প্রভুকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিলেন—"আরে পাগলা নিতাইএর দেহে আবার রোগ! ও কিছু নয়। ওঠ ভাই, তোমার প্রিয় নামসংকীর্ত্তনে নৃত্য কর।" বলিয়া উঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক উভয়ে উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। ক্ষণকাল পূর্ব্বে যে লোক কথা বলিতে বা উঠিয়া বসিতে অসমর্থ ছিলেন, তিনি দুইটী বাহু তুলিয়া বিভোরভাবে সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতেছেন। হঠাৎ প্রভুপাদের বাড়ী সংকীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণে অনিষ্ট-আশঙ্কায় বহুলোক সমবেত হইয়াছে। সকলেই প্রভুপাদের তাৎকালিক অবস্থা দর্শনে একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—"ধন্য বাবাজী মহাশয়ের শক্তি! ধন্য নামের প্রভাব! ধন্য ধন্য নিতাইচাঁদের করুণা! আরও দুই দিন পূর্ব্বে যদি বাবাজী মহাশয়কে আনান হইত, তাহা হইলে আর প্রভুকে অত কষ্ট

ভোগ করিতে হইত না! যাউক, আমাদের নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইল।" বলিয়া সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতে লাগিলেন।

এ দিকে কিছুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তনের পর বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন সমাপ্তি করতঃ প্রভুকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বিছানার উপর বসাইলেন। প্রভুপাদের আনন্দ আর ধরে না; স্বেদ, কম্প, পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারে দেহ বিভূষিত হইতে লাগিল। সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"দাদা! আজ আপনার স্পর্শে আমি ধন্য হইলাম। অশেষ জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়াইয়া গিয়া পরম শান্তি লাভ করিলাম। সম্প্রতি আমি এত সুস্থ ও সবল যে আমার কখন অসুখ হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে না।"

বাবাজী। ভাই! তুমি সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ, তোমার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। রোগ, শোক, জ্বালা, যন্ত্রণাদি তোমার দেহকে কখনও স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। তবে যে প্রাকৃত দৃষ্টিতে দেখা যায়, সে কেবল তোমাদের কৃপাশক্তি দ্বারা উহাদিগকে কৃতার্থ করা মাত্র। যাউক, এখন কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলে ভাল হইত না কি?

প্রভু। আমারও মনে ঐ কথাই হইতেছিল। বড়ই ক্ষুধা বোধ হইয়াছে।

বাবাজী। কি খাইবার ইচ্ছা হইতেছে?

প্রভু। জগন্নাথদেবের কিছু মহাপ্রসাদ হইলে ভাল হয়।

তৎক্ষণাৎ বাড়ীর মধ্য হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ আসিলে প্রভুপাদের বিশেষ অনুরোধে বাবাজী মহাশয় এবং প্রভু উভয়ে মহাপ্রসাদ পাইতে বসিলেন। বহু দিন প্রভু ওরূপভাবে অত মহাপ্রসাদ পান নাই বা পাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। আজ অতি পরিতৃপ্তির সহিত মহাপ্রসাদ পাইয়া পরম শান্তিলাভ করিলেন। যথাসময়ে বাবাজী মহাশয়

শ্রীজগন্নাথদর্শনে গমন করিলেন। সেই দিন হইতেই প্রভুপাদ ক্রমে সুস্থ ও সবল হইতে লাগিলেন ; কিন্তু মূল রোগ (প্রস্রাবের পীড়া) একেবারে নির্দ্দোষ হইয়া সারিল না। তবে চলাফেরা প্রভৃতি করিতে কোনরূপ অসুবিধা বোধ করিতেন না।

মহারাস-প্রসঙ্গ

বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই ললিতাদাসী, বৃন্দাদাসী, কুসুমদাসী প্রভৃতি সখীগণের উপরে রাত্রে রূপ, অভিসার ও মিলন কীর্ত্তনের আদেশ হইয়াছে। কোনদিন বা ইনি নিজে উপস্থিত থাকিয়া শ্রবণ, কীর্ত্তন ও আস্বাদন করেন, আবার যেদিন উপস্থিত না থাকেন উহারাই অভিসারে মিলন করাইয়া ঠাকুরের ভোগ দেয়। এইটী নিত্যলীলাভাবে মূর্ত্তিতে প্রকটরূপে আচরিত হইয়া থাকে। কোন নৈমিত্তিক লীলা উপস্থিত হইলে তদনুযায়ী ঠাকুরের বেশভূষা করতঃ তত্তৎলীলা বিলাস সম্বলিত মহাজনের পদ গান হইয়া থাকে। শরৎপূর্ণিমা আগতপ্রায়। একদিন ইনি ঠাকুরমন্দিরের বারান্দায় বসিয়া আপনমনে কি ভাবিতেছিলেন, হঠাৎ মধুদাদা ও উদ্ধবদাদাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“হ্যাঁরে! তোরা বাঙ্গলার ন্যায় ঘরের চাল ছাইতে পারিস কি ?”

উভয়ে। আজ্ঞে! আমরা জানি।

বাবাজী। আমার ইচ্ছা যে এই মন্দিরের সম্মুখে একখানি বড় ঘর প্রস্তুত হয়। ঘরখানি এমন হওয়া চাই, যাহাতে মণ্ডলী-আকারে মহারাসলীলা সাজান যাইতে পারে। ঠিক মানব-পরিমিত ষোলটী সখী, তদনুরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতীর মূর্ত্তি করিতে হইবে, ষোলটী খুঁটী হইবে। ভিতর খোলা হইবে, তোমরা করিতে পারিবে কি ?

উভয়ে। আজ্ঞে! আমরা সব সাজসরঞ্জাম পাইলে বেশ সুন্দর

করিয়া প্রস্তুত করিতে পারিব। এমন ভাবে ছাউনি হইবে যে তিন চারি বৎসর আর কোনওরূপ মেরামত করিতে হইবে না।

শুনিয়া ইনি বিশেষ হৃষ্টচিত্তে বাঁশ প্রভৃতির জন্য গণেশকে কিছু টাকা দিবার জন্য ললিতাদাসীকে আদেশ করিলেন। এদিকে শোলা দ্বারা শ্রীমূর্ত্তি প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। ঘর আরম্ভ হইল। ইনি নিজে বিধুবাবু সুরেনবাবু প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত উকীল বাবুদের বাড়ী হইতে খবরের কাগজ আনাইয়া উহা দ্বারা নানারূপ নক্সায় গেট করিয়া এবং ঘরের ভিতরে সব স্থানে লাগাইতে নন্দ প্রভৃতিকে আদেশ করিলেন। সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে ব্যস্ত, মহা হুলস্থুল ব্যাপার আরম্ভ হইল। ললিতাদাসী, বৃন্দাদাসী, কুসুমদাসী প্রভৃতি সখীদিগকে লীলাগান, নৃত্য এবং নানারূপ যন্ত্রবাদ্য শিক্ষা করিবার আদেশ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে শ্রীপাদ রঘুনাথদেব গোস্বামী একটি সেতার, একটী এসরাজ, একটী বেহালা, একটী তানপুরা এবং একজোড়া ডাইনে বাঁয়া আনিয়া সখীদিগকে উহা শিক্ষা করাইতে হইবে বলিয়া বাবাজী মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছিলেন। তাঁহারই অভিপ্রায় অনুসারেই যেন আজ উহাদিগের প্রতি ঐরূপ আদেশ হইল। একদিন প্রেমদাদা ইঁহাকে বলিলেন—"আজ্ঞে! সখী সাজাইয়া ঐ সমস্ত যন্ত্রাদি সহযোগে গান করিলে ঠিক যাত্রার দল হইল যে!"

বাবাজী। দেখ, লীলার অনুকরণ করিয়া অনধিকারী বা অনুপাসক গণ রাজস তামস ভাবে ব্যবসা করে বলিয়াই উহাকে যাত্রা বলা হয় এবং সেটি রজস্তমোগুণবর্দ্ধক; সুতরাং অনিষ্টকারী বলিয়া পরিত্যাজ্য। আর উপাসকগণ লীলা রসাস্বাদন মানসে কায়মনোবাক্য দ্বারা নিত্য-নৈমিত্তিক লীলার যে অনুকরণ করিয়া থাকেন, উহা দ্বারা লীলারস-বৈচিত্র্য স্ফূর্ত্তি, নিজ নিজ ভাবের বিকাশ এবং আবিষ্টতা জন্মায়; সুতরাং

উহা দ্বারা সাধনার উন্নতি ছাড়া অবনতি হইতে পারে না। একই বস্তু আস্বাদনের বা আস্বাদকের তারতম্যে ফলের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। উপস্থিত এই যন্ত্রগুলির মধ্যে কেবল তবলা বাঁয়াটি লীলাগত নহে ; সুতরাং ঐটীর স্থলে মহাপ্রভুর প্রদত্ত খোল করতাল হইবে। এক এক জনকে সব রকম যন্ত্রাদি শিখা আবশ্যক।

ললিতা। আজ্ঞে! একজনে আর কয়টা ব্যবহার করিবে?

বাবাজী। তাহা নয়, সকলের সব জিনিষ অভ্যাসের উদ্দেশ্য হইল এই যে, কোন একজনের অভাবে লীলার অঙ্গহানি হইবার সম্ভব হয় না।

ললিতা। এতগুলি যন্ত্র একজনে শিক্ষা করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তবে আপনার কৃপা হইলে হইতে পারে।

বাবাজী। এক একটী বিষয়ে চিত্তের অভিনিবেশপূর্ব্বক লীলাগত হইয়া অর্থাৎ নিজ সিদ্ধদেহ আরোপ করতঃ স্বীয় যুথেশ্বরীর নিকট প্রার্থনা করিলে তাঁহাদের কৃপায় অসম্ভব কার্য্যও অতি অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। একমাত্র কৃপাভিন্ন স্বাধীনভাবে চেষ্টা করিতে গেলে কার্য্যসিদ্ধি ত হইবেই না, ফলতঃ স্বতন্ত্রতাদোষে দূষিত হইতে হইবে। ব্রজ-উপাসনার মূল ভিত্তিই আনুগত্য। আনুগত্য না আসিলে প্রাপ্তি ত দূরের কথা, লীলাস্ফূর্ত্তিই হইবে না। লক্ষ্মীদেবীর কোন বিষয়ে ক্ষমতার বা ঐশ্বর্য্য শক্তির অভাব ছিল কি? তবে তাঁহার ব্রজেন্দ্রনন্দন সহ রাসাদি লীলা-বিলাসাদি প্রাপ্তি যখন হইল না—এমন কি, তপস্যা করিয়াও একমাত্র আনুগত্য না থাকায় যখন প্রাপ্তি হইল না, তখন অপরের কা কথা।

ললিতা। আজ্ঞে! শাস্ত্র একস্থানে বলিলেন যে—"শ্রীগুরুতে আত্মসমর্পন করিয়া শ্রীগুরু-আনুগত্যে উপাসনা না করিলে কোটি

কোটি জন্ম সাধন ভজন করিলেও তাঁহার ভগবৎপ্রাপ্তি অসম্ভব।” আবার স্থানান্তরে বলিলেন—“মুখেও যে জন বলে মুঞি নিত্যানন্দ দাস। সে নিশ্চয় দেখিবে গোরার স্বরূপ প্রকাশ॥ গোপীগণের যেই প্রেম কহে ভাগবতে। একলা নিত্যানন্দ হইতে পাইবে জগতে॥” সুতরাং নিত্যানন্দের আনুগত্য চাই। অন্যত্র বলিলেন “শ্রীগৌরাঙ্গদেবই জীবগণকে অবিচারে অনর্পিত গোপীভাবপ্রেম বিতরণ করিয়া থাকেন; সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ পদাশ্রয় গ্রহণ করতঃ তাঁহার আনুগত্য স্বীকার না করিলে ব্রজরসের অধিকার জন্মে না।” আবার বলিতেছেন—“গোপী অনুগত বিনা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে। ভজিলেও নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥ ইত্যাদি। মোট কথা শ্রীগুরুপদাশ্রয় ভিন্ন নিতাই পাওয়া যায় না, নিতাইএর চরণ আশ্রয় না করিলে গৌরাঙ্গ মিলে না, গৌরাঙ্গ পদাশ্রয় ভিন্ন ব্রজপ্রাপ্তি হয় না, গোপী আনুগত্য বিনা ব্রজেন্দ্র-নন্দন পাওয়া যায় না তাহা হইলে জীব কতজনের আনুগত্য স্বীকার করিবে?

বাবাজী। বেশ কথা। তাহা হইলে তোমার মতে নিতাইকে না পাওয়া পর্য্যন্ত গুরুর আবশ্যক, আবার গৌরাঙ্গ না পাওয়া পর্য্যন্ত নিতাইএর প্রয়োজন, সেইরূপ গোপী পদাশ্রয় পাইলে গৌরাঙ্গের সঙ্গে সম্বন্ধ ফুরাইয়া গেল। কৃষ্ণ পাইলে গোপীদিগের আর প্রয়োজন নাই। কেমন এই নয়?

ললিতা। আজ্ঞে! প্রায় সেইরূপ বই কি।

বাবাজী। ইহাকে আশ্রয় বলা যায় না। নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্ম আশ্রয়ের ভান মাত্র বলা যাইতে পারে। এই আশ্রয় ঠিক মকদ্দমা জয়ের জন্য উকীল মোক্তারের আশ্রয়ের ন্যায়। পরমার্থপথে এইরূপ আশ্রয়ে অবনতি ভিন্ন উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না। আশ্রয় অর্থ তাঁহার হইয়া যাওয়া, যেমন পিতা মাতা উপযুক্ত কন্যাকে অগ্নি,

শালগ্রাম, গুরু, পুরোহিত, ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে সাক্ষী করিয়া কোনও যোগ্য পাত্রের হস্তে অর্পণ করিলেন। কন্যাও পিতৃবাক্যে স্বীকৃতা হইয়া সর্ব্ব-সমক্ষে সেই পাত্রকে আত্মসমর্পণ করিল। সেই দিন হইতে সেই সমর্পিতা কন্যার প্রতি পিতা মাতার কোনও অধিকার রহিল না; এমন কি পিতৃগোত্র পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া সে স্বামীগোত্রে গোত্রী হইল। পিতার জ্ঞাতির মৃত্যুতে কন্যার অশৌচ ভোগ করিতে হইবে না। কিন্তু স্বামীর জ্ঞাতির মৃত্যুতে পূর্ণাশৌচ। পতিব্রতা স্ত্রীর পতিই একমাত্র আশ্রয়, পতিই আরাধ্য, পতিই সেব্য, পতিই পরমগুরু, পতিই পরম দেবতা। পতি ভিন্ন অন্য কোনও পুরুষের মুখাবলোকনে বা স্পর্শে নরকগামী হইতে হইবে এই শাস্ত্রবাক্য। আচ্ছা! তাহা হইলে কন্যা-সম্প্রদানের পরমুহূর্ত্তেই কন্যার পক্ষে গুরু, পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, পিতা, ভ্রাতা, শ্বশুর, ভাসুর, দেবর প্রভৃতির সেবাপরিচর্য্যা বা দর্শন-স্পর্শনে পাতিব্রত্যহানি—সুতরাং নরকের দ্বারস্বরূপ হইবে কি?

প্রেম। আমি ত এ বিষয় কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। অনুগ্রহ পূর্ব্বক সুসিদ্ধান্ত দ্বারা ভ্রম দূর করিতে আজ্ঞা হউক।

বাবাজী। পতি-পত্নী বা গুরু-শিষ্য ইহার মধ্যে যে কোনও একটী বেশ মনোযোগের সহিত বুঝিলেই অপরটী বোধগম্য হইবে, কারণ দুইটীই একধর্ম্মাবলম্বী। পতিব্রতা স্ত্রীর পতিসেবাই একমাত্র কর্ত্তব্য; কিন্তু শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর, ভাসুর প্রভৃতির সেবাও পতিসেবার অঙ্গ বলিয়া সর্ব্বদা করণীয়। সেব্য বস্তুকে সুখী করার নামই সেবা। এইরূপ পতিসেবাপরায়ণা অর্থাৎ পতিসুখাভিলাষিণী পত্নী, সময়ে পতিশুশ্রূষাদি পরিত্যাগ করিয়াও পতির পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী প্রভৃতি প্রিয়জনের শুশ্রূষাদি দ্বারা পতির বিশেষ স্নেহের পাত্রী হইয়া থাকেন। মোট কথা—পতিসম্বন্ধীয় যাবতীয় সেবাকেই পতিসেবা মনে করিয়া আত্মসুখ-

বিবর্জ্জিত ভাবে আচরণ না করিলে যেমন পাতিব্রত্যের হানি হইয়া থাকে, সেইরূপ গুরুসেবাপরায়ণ ব্যক্তি গুরুদেবের সুখাভিলাষী হইয়া শ্রীগুরুচরণে সমর্পিত কায়, মন, প্রাণ, বাক্য দ্বারা আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত স্থাবর, জঙ্গম, চেতন, অচেনাত্মক যাবতীয় বস্তুর সেবা—এমন কি নিতাই-গৌরাঙ্গ, রাধাকৃষ্ণ সেবা কিংবা আনুগত্যাদিকে পর্য্যন্তও গুরু-অনুমোদিত—সুতরাং তাঁহার সুখসাধক বলিয়া আচরণের নামই পূর্ণভাবে গুরুসেবা। গুরুদেবের অনভিপ্রায়ে বৈকুণ্ঠ, দ্বারকা, মথুরা, নবদ্বীপ, বৃন্দাবন প্রভৃতি ধামাশ্রয় বা ধামেশ্বরের আশ্রয় করিয়া উপাসনাদি যথাযথরূপে আচরিত হইলেও তাহা সাধনপথের অনুকূল না হইয়া প্রতিকূলই হইয়া থাকে। শাস্ত্রও বলিয়াছেন—"কৃষ্ণে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।" ইত্যাদি।

প্রেম। আর একটী কথা—পতিব্রতা স্ত্রীর পুরুষান্তর দর্শনস্পর্শে পাতিব্রত্য থাকে কিরূপে ?

বাবাজী। যেমন কৃষ্ণের সহিত দেবতান্তরের সমত্ব, আধিক্য বা ঈশ্বরত্ব কল্পনায় অপরাধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ পতি বা গুরুদেবের সহিত তদ্ভাবাঢ্যভাবে পুরুষান্তরের সমত্ব, আধিক্য বা তত্যোগ্যত্ব কল্পনায় দর্শন, স্পর্শন বা আশ্রয়কেই পতনের কারণ বা মহা অপরাধের হেতু বলিয়া পরিত্যাজ্য বলা হইয়াছে। দুঃশীলতা, দৌর্ভাগ্য, বৃদ্ধত্ব, জড়তা, রোগ, নির্ধনতা প্রভৃতি দোষদুষ্ট পতিও যেমন স্ত্রীর পক্ষে পরিত্যাজ্য না হইয়া সেব্যই হইয়া থাকে, পতির দোষদৃষ্টি বা বিচার করিবার যেমন স্ত্রীর অধিকার নাই, করিলেও মহা অপরাধ হইয়া থাকে, সেইরূপ গুরুদেবের যোগ্যাযোগ্যত্ব দৃষ্টি করা শিষ্যের পক্ষে ঘোর অপরাধের কারণ। তাই শাস্ত্রকারগণ ভূয়োভূয়ঃ বলিতেছেন—

"সত্যজ্ঞানে গুরুবাক্যে যাহার বিশ্বাস।
অবশ্য তাহার হয় ব্রজভূমে বাস॥
যার প্রতি গুরুদেব হন পরসন্ন।
কোন বিঘ্নে সেহ নাহি হয় অবসন্ন॥
কৃষ্ণ রুষ্ট হ'লে গুরু রাখিবারে পারে।
গুরু রুষ্ট হ'লে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে॥
গুরু মাতা গুরু পিতা গুরু হন পতি।
গুরু বিনা ত্রিসংসারে নাহি আর গতি॥
গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান না কর কখন।
গুরুনিন্দা কভু কর্ণে না কর শ্রবণ॥
গুরুনিন্দুকের মুখ কভু না হেরিবে।
যথা হয় গুরুনিন্দা তথা না যাইবে॥
গুরুর বিক্রিয়া যদি দেখহ কখন।
তথাপি অবজ্ঞা নাহি কর কদাচন॥
গুরু পাদ-পদ্মে রহে যার নিষ্ঠা ভক্তি।
জগৎ তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি॥"

ইত্যাদি আচার্য্যবাক্য অনুসারে সাধন না করিলে কেবল পণ্ড-শ্রমমাত্র হইয়া থাকে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে কোনও পথ অবলম্বন করিলেই ফললাভ হইবে।

প্রেম। আজ্ঞে! শ্রদ্ধা কাহাকে বলে?

বাবাজী। শাস্ত্র এবং গুরুবাক্যে বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। বিশ্বাস না থাকিলে দৃশ্য বস্তুরও অদর্শন এবং প্রত্যক্ষ বস্তুরও অপলাপ ঘটিয়া থাকে। তাই বলি, বিশ্বাসপূর্ব্বক সাধনপথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা কর, অনায়াসে ভগবৎপথের পথিক হইয়া মানবজীবন ধন্য করিতে পারিবে।

এইরূপ নানা কথাবার্ত্তায় অনেক সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। ইনি দয়ালদাসকে শোলার পুতুল গড়িবার জন্য কারিগরকে সংবাদ দিতে বলিলে দয়ালদাস বলিল—"আজ্ঞে! আমি ইতিপূর্ব্বেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে বলিল 'অন্ততঃ দুইমাস সময় না পাইলে আমি কিরূপে কি করিব?' রাস পূর্ণিমার মাত্র সাতদিন বাকি আছে, ইহার মধ্যে কোনরূপেই হইতে পারিবে না।"

বাবাজী। আচ্ছা, তাহাকে একবার ডাকিয়া আন ত!

শুনিবামাত্র দয়ালদাস যাইয়া কারিগরকে ডাকিয়া আনিলে ইনি যথাযথ বৃত্তান্ত তাহাকে বলায় সে বলিল, "আজ্ঞে! আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অন্ততঃ দুইমাস সময় না পাইলে, কিছুতেই সম্পন্ন হইতে পারিবে না। আপনি এবারকার মত অন্যকোনরূপভাবে কার্য্য সমাধা করুন, আমি আগামী বৎসর বেশ মনের মতন করিয়া সমস্ত সাজাইয়া দিব।"

বাবাজী মহাশয় "আচ্ছা, নিতাইচাঁদের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে" বলিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে অন্যরূপ ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ছয়দিন কাটিয়া গেল। পূর্ণিমার দিন সকাল হইতেই ইনি যেন কেমন বিভোরভাবে কথাবার্ত্তা বা ব্যবহার করিতে লাগিলেন। রাত্রে ঠাকুরের পুরী পায়স মোহনভোগ প্রভৃতি ভোগ হইবে, ললিতাদাসীকে সমস্ত প্রস্তুত করিতে আদেশ করতঃ কিরূপভাবে কীর্ত্তন হইবে, বৃন্দাবনদাসীকে লইয়া সেই সমস্ত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এদিকে সেবকগণ সন্ধ্যা-আরতির পর হইতেই ঠাকুরদিগের নানারূপ বেশ করিতে লাগিলেন। ইঁহার অভিপ্রায়ানুরূপ নৃত্য এবং কীর্ত্তনকারী-দিগকে সাজাইয়া দেওয়া হইলে ইনি হৃষ্টচিত্তে গুরুবন্দনা শেষ করিয়া রাসের অভিসার কীর্ত্তন ধরিলেন—

শারদ চন্দ, পবন মন্দ, বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ,
ফুল্ল মল্লিকা মালতী যুথি মত্ত মধুকর ভোরণী।
হেরত রাতি, ঐছন ভাতি, শ্যাম মোহন মদনে মাতি,
মুরলী গান, পঞ্চম তান, কুলবতী চিত চোরণী॥
শুনত গোপী, প্রেম রোপী, মনহি মনহি আপনা সোঁপি,
তাহি চলত, যাহি বোলত, মুরলী কল লোলনী।
বিছুরি গেহ, নিজহি দেহ, এক নয়নে কাজর রেহ,
বাহে রঞ্জিত, কঙ্কণ এক, এক কুণ্ডল দোলনী॥
শিথিল ছন্দ, নীবিক বন্ধ, বেগে ধাওত যুবতী বৃন্দ,
খসন বসন, রসন চোলি, দোলিত বেণী লোলনী।
এতহুঁ বেলি, সখিনী মেলি, কেহু কাহুকো পথ না হেরি,
কৈছে মিলব, গোকুল চন্দ, গোবিন্দ দাস গায়নী॥

জয় জয় জয় বিজই কুঞ্জে কুঞ্জর বরগামিনী।
প্রেম তরঙ্গে ভরল অঙ্গ, সঙ্গে বরজ রমণী॥
গগন মণ্ডল, অতি নিরমল, শারদ সুখদ যামিনী।
শ্বেত বসন, হাটক বরণ, ঝটকত চাঁদ যামিনী॥
তানা নানা নানা, সুললিত বীণা, গান করত সজনী।
রুণু ঝুণু ঝুণু নূপুরে নূপুরে, বোলত নূপুর কিঙ্কিণী॥
বাজে রবাব, বীণা পাখোয়াজ, ঠমকি ঠমকি চলনী।
যন্ত্র তন্ত্র, তান মান ধনি ধনি নব যৌবনী॥
মিলল শ্যাম, কুঞ্জধাম, নিরুপম রস সায়নি।
গোবিন্দ দাসের, সুখের নাহি ওর, হেরি শ্যাম মনোমোহিনী॥

বিপিনে মিলল গোপনারী, হেরি হসত মুরলীধারী,
নিরখি বয়ান, পুছত বাত, প্রেম সিন্ধু গাহিনী।
পুছত সবক গমনক্ষেম, কহত কিয়ে করব প্রেম,
ব্রজক সবহু কুশল বাত, কাহে কুটিল চাহনি॥
হেরি ঐছন রজনী ঘোর তেজি তরুণী পতিক কোর,
কৈছে আওলি কানন পর, থোর নহত কাহিনী।
গলিত ললিত কবরী বন্ধ, কাহে ধাওত যুবতীবৃন্দ,
মন্দিরে কিয়ে পড়ল দ্বন্দ্ব, বেঢ়ল বিপথ বাহিনী॥
কিয়ে শারদ চাঁদনী-রাতি, নিকুঞ্জে ভরল কুসুম পাঁতি,
হেরত শ্যাম ভ্রমর ভাতি, বুঝি আওলি সাহিনী।
এতহুঁ কহত না কহ কোই, রাখত কাহে মনহি গোই,
ইহই আন না হোই কোই, গোবিন্দ দাস গায়নী॥

ঐছন বচন কহল যব কান।
ব্রজ রমণীগণ সজল নয়ান॥
টুটল সবহুঁ মনোরথ করণী।
অবনত আননে নখে লিখু ধরণী।
আকুল অন্তর গদ গদ কহই।
অকরুণ বচন বিশিখ নাহি সহই॥
শুন শুন সুকপট শ্যামর চন্দ।
কৈছে কহসি তুহু ইহ অনুবন্ধ॥
ভাঙ্গিল কুল শীল মুরলীক সানে।
কিঙ্করীগণ জনু কেশে ধরি আনে॥

অব কহ কপটে ধরম যুত বোল।
ধার্ম্মিক হয়য়ে কি কুমারী নিচোল॥
তোহে সোঁপিত জীব তুয়া রস পাব।
তুয়া পদ ছোড়ি অব কো কাঁহা যাব॥
এতহুঁ কহল ব্রজ যৌবত মেল।
শুনি নন্দনন্দন হরষিত ভেল॥
চৌদিকে বেড়ল যুবতীর বৃন্দ।
রাস রভসরস করলি আরম্ভ॥

———

কাঞ্চন মণিগণ, জনু নিরমাওল,
রমণী মণ্ডল সাজ।
মাঝহি মাঝ, মহা মরকত সম,
শ্যামর নটবর রাজ॥
ধনি ধনি অপরূপ রাস বিহার।
থির বিজুরি সঞে, চঞ্চল জলধর,
রস বরিখয়ে অনিবার॥
কত কত চান্দ, তিমির পর বিলসই,
তিমিরহি কত কত চান্দে।
কনক লতা সঞে, তমালহুঁ কত কত,
দুঁহু দুঁহু তনু তনু বান্ধে॥
কত কত পদুমিনী, পঞ্চম গাওত,
মধুকর ধরু শ্রুতি ভাষ।
মধুকর মেলি কত, পদুমিনী গাওত,
মুগধল গোবিন্দ দাস॥

নব নায়রী নব নায়র নৌতুন নব-লেহা ।
আঁখে আঁখে নিমিখে নিমিখে বিছুরল নিজ দেহা ॥
নৌতুনগণ নৌতুন বন নৌতুন সখী গানে ।
তা দিগ্ দিগ্ থো দিগ্ দিগ্ তাল ফুকরই বামে ॥
নৌতুন রস কেলি রভস নৌতুন গতি ভালে ।
দ্রিমি ধো দ্রিমি ধো দ্রিমি দ্রিমি বাওল সখী ভালে ॥
চঞ্চল মণি কুণ্ডল চল চঞ্চল পটবাস ।
দুঁহে দুঁহে কর ধরিয়া নাচয়ে সখীগণ চৌপাশ ॥

বাজে বলয়া নূপুর মণি কিঙ্কিণী ।
রাস রসে রতি রণে কি মধুর শুনি ॥
করয়ে নর্ত্তন রাস হরিষে মুরারি ।
গোবিন্দ সহিত নাচে গোপের সুন্দরী ॥
কোন গোপী কৃষ্ণ সঙ্গে গায় উচ্চৈঃস্বরে ।
সাধুবাদ দেন তারে শ্যাম নটবরে ॥
কোন গোপী রাস রসে শ্রমযুত হৈয়া ।
আবেশে কৃষ্ণের অঙ্গে পড়ে মূরছিয়া ॥
তাহারে ধরিয়া কৃষ্ণ দেন আলিঙ্গন ।
বদনে বদন শশী করেন চুম্বন ॥
রাস হাটে গোপীগণের পশরা যৌবন ।
তাহাতে গাহক ভেল মদন মোহন ॥
রাস হাট উপরে পতাকা শশধরে ॥
কোকিলা কোটাল হইয়া জাগায় কামেরে ॥

বলয়া নূপুর মণি কিঙ্কিণী রোল।
তাহে অতি সুমধুর মুরলীক বোল॥
যুথে যুথে পাটোয়ারা নটিনী গোপিনী।
নটবর তাহাতে আপনে গুণমণি॥
কোন গোপিকারে লইয়া নন্দের কুমার।
অধরে অধর দিয়া চুম্বন বিথার॥
রতিরণে পণ্ডিতা যতেক গোপনারী।
বঙ্ক বিলোকনে সবে তুষিলা শ্রীহরি॥
ভ্রমরা কোকিলাগণ আনন্দেতে ভাসে।
গোবিন্দ সহিত গোপী মত্ত রাস রসে॥

———

জলদ হি জলদ, বিজুরী দিঠি তাপক,
মরকত কনয় কঠোর।
এ দুঁহু তনু মন, নয়ন রসায়ন,
নিরুপম নওল কিশোর॥
রাধা মাধব ভাঁতি।
কো বিহি নিরমিল কোন ঘটাওল,
শ্যামর গোরী সাঙ্গাতি॥
যব হি দুঁহু দুঁহু, নয়ন অঞ্জলি ভরি,
দুঁহু দুঁহু পিবইতে চাহ।
তনু তনু পৈঠত, সঘনে আলিঙ্গত,
কৈছে হোয়ব নিরবাহ॥

আরতি অধর, সুধারস পিবি পিবি,
দুঁহুক পিরীত উনমাদ।
সহচরীগণ কহ, অধিক রসাবেশে,
কিয়ে না করু পরমাদ॥

রাস অবসানে, উলসিত মনে, রসবতী রসরাজ।
রতন আসনে, বসিলা যতনে, রতন মন্দির মাঝ॥
সুচামর লেই, বীজন বীজই, সেবা-পরায়ণা সখী।
সুবাসিত জলে, বদন পাখালে, বসনে মুছাঞা দেখি॥
থারি ভরি কোই, বিবিধ মিঠাই, ধরি দুঁহু সম্মুখে।
সখীগণ সঞে, কতই কৌতুকে, ভোজন করয়ে সুখে॥
চিনি ফেণী কলা, মথনি রসালা, বেউড়ী কদম্বাতিলা।
পুরী পুয়া গজা, পেড়া সরভাজা, যতেক আনিয়াছিলা॥
অমৃত কেলিকা, আদি সে লড্ডুকা, এ সুপ মুগদ ঝুরী।
জিলিপী কচুরী, অমৃত মহুরি, সাকরা মিঠিরি ক্ষিরী॥
নানাবিধ ফল, মিষ্টান্ন সকল, তুলি তুলি দেয় মুখে।
কিশোরা কিশোরী, আপনা পাশরি, ভোজন করয়ে সুখে॥
লবঙ্গ মঞ্জরী, সুবাসিত বারি, দোঁহার বদনে দেল।
কিশোরা কিশোরী, সুখে পান করি, অতি তিরপিত ভেল॥
লেই স্বর্ণ ঝারি, শ্রীগুণ মঞ্জরী, পাখালে বদন চাঁদে।
মুছিয়া বসনে, নিরখি সঘনে, পড়ল পিড়ীতি ফাঁদে॥
তাম্বূল সাজাঞা, কোন সখী লইঞা, দোঁহার বদনে দিল।
এ কেশ কুসুমে, আপাদ বদনে, নিছিয়া নিছিয়া নিল॥

রাত্রি প্রায় তুইটা পর্যন্ত পরমানন্দে কীর্ত্তন হইতে লাগিল। কাহারই যেন দেহস্মৃতি নাই। সকলেই বিভোর ভাবে নৃত্য কীর্ত্তন করিতেছেন। কে বলিবে নিত্যলীলা প্রকটরূপে বর্ত্তমান নয়? জানি না সকলের অভিপ্রেত না হইলেও কেন যেন ইনি কীর্ত্তন সমাপ্তি করিলেন। যথা-সময়ে ঠাকুরের ভোগান্তে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে আশ্রমবাসী এবং বিশেষ অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সহ ইনি মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতঃ বিশ্রাম করিলেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপ গমন

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। শ্রীপাদ রঘুনাথদেব গোস্বামী প্রত্যহই বাবাজী মহাশয়ের নিকট আগমন করেন এবং তুই ভাই মিলিয়া নানারূপ ভাবে মন প্রাণ খুলিয়া আলাপাদি করেন। অগ্রহায়ণ মাস, রাত্রে বেশ হিম পড়ে। প্রভুপাদ বাবাজী মহাশয়কে একদিন বলিলেন- "দেখুন দাদা! আমার শরীরটা ক্রমেই যেন কেমন ক্ষয়োন্মুখ বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। রাত্রে অনেকবার প্রস্রাবের বেগ হয়; সুতরাং ঠাণ্ডা লাগে, তাই শরীরে আর পূর্ব্বৎ জোর পাইতেছি না।"

বাবাজী। ভয় কি ভাই! চল একবার গঙ্গাতীরে যাওয়া যাক্। তোমাদের ভজিবার ধন, প্রাণ ভরিয়া ভজ, ব্যাধির জন্য ভাবনা করিয়া কি হইবে? চল ভাই! গঙ্গাতীরে যাইয়া জলে জল মিশাইয়া দেওয়া যাইবে।

বাবাজী মহাশয়ের গঙ্গাতীরে যাইবার কথা শুনিয়া প্রভুপাদ বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং কবে যাওয়া হইবে জিজ্ঞাসা করায় ইনি বলিলেন —"আগামী সোমবার অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় রওনা হইলে ভাল হয়।"

সোমবারের আর পাঁচদিন বাকি, প্রভুপাদ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয়ের মুখে জলে জল মিশাইবার কথাটা

শুনা অবধি ললিতাদাসীর মনে বড়ই আতঙ্ক উপস্থিত হইল। সে অবকাশমতে ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি যে প্রভুকে জলে জল মিশাইবার কথাটা বলিলেন উহার অর্থ কি ?"

বাবাজী। তোমাদের ও সমস্ত শুনিবার প্রয়োজন নাই। তোমরা বেশ মন প্রাণ দিয়া সেবা কর। সেবাই সাধন, সেবাই সাধ্য।

ললিতা। আজ্ঞে! আপনার ঐ কথাটা শুনিয়া আমার মনে বড়ই আশঙ্কা হইয়াছে, আমি কিছুতেই মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেছি না।

বাবাজী। কেন, তোমার মনে ঐ কথাটায় কি বোধ হইল ?

ললিতা। আমার মনে বোধ হইতেছে আপনি গঙ্গাতীরে গিয়া প্রভুর অসুখটা নিজে গ্রহণ করিবেন।

বাবাজী। মনে কর তাহাই যদি হয় তাহাতেই বা দোষ কি ? এই পুরাতন, পচা, নগণ্য একটা দেহ দ্বারা যদি কোনও ভাল বস্তু রক্ষা পায় সে ত মহাভাগ্যের কথা।

শুনিয়া ললিতাদাসী এবং উপস্থিত যে যে ছিল সকলেই কাঁদিতে লাগিলে ইনি একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"তোরা এত অলীক আশঙ্কা করিয়া দুঃখ করিতেছিস্ কেন ? নিতাই চাঁদ এই পুতুল যতদিন নাচাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন নাচাইলেন, আর যদি নাচাইতে ইচ্ছা না করেন কে কি করিবে ? আর যদি আরও কিছুদিন নাচাইবার ইচ্ছা থাকে নাচাইবেন। ও সমস্ত ভাবিয়া অমূল্য সময় নষ্ট করা কেন ? নাম কর, আর প্রাণ ভরিয়া সেবা কর, মঙ্গলময় যখন যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই হইয়া থাকে।" ইত্যাদি স্তোভবাক্যে সকলকে প্রবোধ দিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনে গমন করিলেন। ঐ দিন হইতে প্রায় সর্ব্বদাই হাসিতে হাসিতে এমন এক একটী কথা ব্যবহার করেন যেন উহা দ্ব্যর্থসূচক এবং উদাসভাবব্যঞ্জক। কাতরভাবে ঐসমস্ত কথার আর একটী ভাব ধরিয়া

কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেন। ইতিপূর্ব্বে যখন বাবাজী মহাশয় ঝাঁজপিটা মঠস্থ শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেবের সেবার ভার গ্রহণ করেন, তখন ইঁহার ধারণা ছিল যে রাধাকান্তদেবের স্থানটী নিষ্কিঞ্চন কিন্তু ক্রমে যখন উহার নানারূপ ভাবের সম্পত্তি বাহির হইল, সঙ্গে সঙ্গে দেনাও বাহির হইতে লাগিল, তখন একদিন শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ও ঠাকুর! আমি ভাবিয়াছিলাম তুমি বুঝি খাঁটি গোয়ালা! এখন দেখি তাহা নহে—তুমি জমিদার! তা বেশ তুমি জমিদারী কর, আমি কাঙ্গাল, আমার দ্বারা জমিদারী ভোগ করা পোষাইবে না।" যতদিন পর্য্যন্ত আশ্রমের দেনাগুলি পরিশোধ করিয়া তোমাকে নির্দ্বন্দ্ব ভাবে রাখিতে না পারিব, ততদিন পর্য্যন্তই আমি তোমার নিকট ঋণী। তোমাকে নিশ্চিন্ত করিয়া কোনও মহতের হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে পারিলেই আমি খালাস।" মাঝে মাঝে প্রায়ই সঙ্গীগণকে বলেন—"দেখ, এই মঠ তোমাদের ভোগের জন্য নহে, কারণ ইহাতে বিষয় আছে। খোল করতাল বাজাইয়া ভিক্ষালব্ধ বস্তু দ্বারা যেখানে সেবা চলিবে, তোমাদের জন্য সেই স্থান নির্দিষ্ট থাকিবে। নিশ্চিন্তভাবে শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেবকে কোনও উপযুক্ত লোকের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিলেই আমি খালাস।" ক্রমে বৃন্দাবনমিশ্র মহাশয়ের দেনা শোধ করা হইল। কেবলমাত্র হরিশ্চন্দ্র ঘোষ (ছোট হরিশবাবু) দেনার জন্য জজকোর্টে ডিক্রি করিয়া রাখিয়াছেন, ঐ টাকা বাকী। বিশেষ অন্তরঙ্গ ভক্ত প্রিয় বলরামবাবু ও নগেনবাবুকে পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে বাবাজী মহাশয় একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"দেখ বলরাম! হরিশবাবুর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করিলে হয় না কি? কারণ কলিকাতায় তোমাদের অনেক লোক রহিয়াছে, খরচাদিও অনেক কম লাগিবে। তোমাদের মত হয় ত বল আমি কলিকাতা

গিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করি।” পরম ভক্ত সুবুদ্ধি বলরাম একটু বিস্মিত ভাবে বলিলেন—“আজ্ঞে! সামান্য একটা মকর্দ্দমা করিবার জন্য আপনাকে আমরা শ্রীধাম ত্যাগ করিতে দিব না। আপনি ত শ্রীমুখে সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন—“নিতাই নাগর রসের সাগর, সকল রসের গুরু। যে যাহা চায়, তারে তাহা দেয়, বাঞ্ছা কল্পতরু॥” তখন তাঁহার নিকট একজন যদি কিছু টাকা চায় তিনি কেন দিবেন না? মোট কথা ঐ সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার আশীর্ব্বাদে এবং শ্রীশ্রীনিতাইচাঁদের কৃপায় এ সমস্ত বিষয়ের জন্য আমরা আছি, যত টাকা কড়ি লাগে আমরা ব্যবস্থা করিয়া দিব।”

বলরামের কথাটা শুনিয়া ইনি পরমানন্দ লাভ করতঃ প্রফুল্লচিত্তে বলিলেন—“বলরাম! তোমরা ঐ সমস্ত ভার নিলে? তবে আজ হইতে আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।”

বলরাম। আজ্ঞে! আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকুন। যাহা করিতে হয় আমরা করিব।

বাবাজী (শ্রীরাধাকান্তকে লক্ষ্য করিয়া) ঠাকুর! তবে আজ হইতে আমি খালাস। তোমার যাবতীয় ভার বলরাম ও নগেনের উপর রহিল, আজ হইতে আমি নিশ্চিন্ত।

এই বলিয়া বগল বাজাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে ললিতা দাসীকে বলিলেন—‘দেখ, ঠাকুরের দেনা পরিশোধের জন্য যে টাকা ঘরে আছে সে সমস্ত আনিয়া বলরামের হাতে দাও।” ললিতাদাসী সমস্ত টাকা আনিয়া বলরামবাবুর হাতে দিল।

ইতিপূর্ব্বে শ্রীধাম নবদ্বীপ যাইবার জন্য শ্রীপাদ রঘুনাথদেব গোস্বামীর সহিত যে পরামর্শ হইয়াছিল, সেই ইচ্ছাটী অত্যন্ত প্রবল হইল। আগামী

কল্যই রওনা হইবেন সঙ্কল্প স্থির করিলেন, শুনিয়া বলরামবাবু বলিলেন —"আজ্ঞে! এ কিরূপ হইল আপনি কালই চলিয়া যাইবেন কিরূপে?"

বাবাজী। একবার বাবাজী মহাশয়ের দর্শন এবং গঙ্গাস্নানের জন্য মন বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, তোমরা বাধা দিও না। আমি এখন নিশ্চিন্ত, আমাকে আর পায় কে?

এই বলিয়া শ্রীজগন্নাথদর্শনে গমন করিলেন।

বলরামবাবু প্রভৃতি সকলে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন— "এ যে হিতে বিপরীত হইল। আমরা ভাবিলাম বাবাজী মহাশয়কে নিশ্চিন্ত করিয়া রাখিতে পারিলে আর ইনি অন্য কোথাও যাইবেন না; কিন্তু এখন দেখি ইঁহার উপর ভার থাকাই ভাল ছিল।" একজন বলিলেন—"ভাই; তোমরা যে যতই বুদ্ধির চাতুর্য্য বা কৌশল কর না কেন ইঁহার যে মুহূর্ত্তে যাহার দ্বারা যে কার্যটী করাইবার ইচ্ছা হইবে, তাহা কেহ বাধা দিতে পারিবে না; সুতরাং ইনি যাহাতে শান্তিতে বা সুখে থাকেন দুঃখ হইলেও সেই কার্যটী প্রাণপণে আচরণ করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।" এইরূপে পরস্পর নানা কথা আলোচনার পর ভক্তগণ নিজ নিজ বাসস্থানে প্রস্থান করিলেন।

বাবাজী মহাশয় জগন্নাথ দেবের দর্শন করতঃ যথাসময়ে আসিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে হরিদাদা একখানি কালরঙ্গের সার্জ্জের শীতবস্ত্র ইঁহার ব্যবহারের জন্য দিয়াছিলেন। গুরুদাস ব্রহ্মচারী নামক জনৈক শিক্ষিত ভদ্রলোক উক্ত কাপড়খানির দ্বারা বিশেষ যত্নের সহিত একটী অলেষ্টার প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইনি আশ্রমে আসিবামাত্র উক্ত মহাত্মা আগ্রহাতিশয্যে সেই অলেষ্টারটী ইঁহাকে পরাইয়া দিলে ইনি একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"বা! বেশ শোভা হইয়াছে। নেড়া মাথা, পরিধানে ডোর কৌপীন, গায়ে অলেষ্টার,

মরি মরি কি মাধুরী !" এই বলিয়া নানারূপ ভঙ্গি করিতে লাগিলেন। ইনি অলেষ্টার গায়ে দিবামাত্রই ললিতা দাসীর মনে কি ভাব হইল, কৃষ্ণদাসকে পাঠাইয়া ইঁহার মাথায় বাঁধিবার জন্য একখানি ভাল কাপড় আনাইয়া মাথায় বাঁধিয়া দিলেন। অতি অপূর্ব্ব শোভা হইল।

এইরূপভাবে সেদিন কাটিয়া গেল। পর দিবস প্রাতে নিজ নিত্যকৃত্য শেষ করতঃ শ্রীধাম নবদ্বীপ যাইবার জন্য সমস্ত প্রস্তুত করিতে আদেশ করিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনে গমন করিলেন। শ্রীমন্দিরে বা রাস্তা ঘাটে ইঁহার সহিত যাহারই দেখা হইতেছে, প্রত্যেকের নিকট শ্রীধাম নবদ্বীপ যাইবার জন্য বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীপাদ রঘুনাথদেব গোস্বামী প্রভুকে সঙ্গে করিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। আশ্রমবাসীগণ সকলেই বিষণ্ণ ভাবে অবস্থান করিতেছে। নিজ নিজ কর্ত্তব্যের অনুরোধে সেবার কার্য্য করিতেছে মাত্র; কিন্তু কাহারই মনে আনন্দ নাই। বাবাজী মহাশয় সকলকে ভুলাইবার জন্য নানারূপ কৌশল করিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন ললিতাদাসীকে বলিলেন—'আমার যাইবার সমস্ত ঠিক হইল কি? আমি কিন্তু মহাপ্রসাদ পাইয়াই রওনা হইব।" ললিতাদাসী সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিল—"আপনি স্বেচ্ছাময় স্বতন্ত্র পুরুষ—আপনার ইচ্ছার ব্যাঘাত করে কাহার সাধ্য? এখন মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া একটু বিশ্রাম করুন, পরে যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন। বলিয়া গোস্বামী প্রভুর এবং ইঁহার চরণ ধৌত করিয়া মহাপ্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলে উভয়ে মহাপ্রসাদ পাইতেছেন, এই সময় ললিতাদাসী জিজ্ঞাসা করিল—"আজ্ঞে! সঙ্গে কে কে যাইবে?"

বাবাজী। কেহই না।

ললিতা। কেহই না গেলে কি করিয়া কার্য্য চলিবে?

বাবাজী। নিতাইচাঁদ যখন প্রয়োজন বোধ করিবেন, তখন যোগাড় করিয়া দিবেন। ভিখারী বৈরাগীর সঙ্গে আবার লোকের ব্যবস্থা কেন ?

ললিতা। আপনার না হয় চলিবে, প্রভুপাদের সেবার জন্য ত লোক চাই !

বাবাজী। ভুবনের ছেলে নিতাই যাইবে, তাহার দ্বারাই প্রভুর সেবা চলিবে।

বলরাম। আজ্ঞে ! সে বড়ই অসুবিধা হইবে আমাদের মতে গোবিন্দ দাদাকে সঙ্গে নিলে বেশ ভাল হইবে।

ললিতা। একজনের দ্বারা কার্য্য চলিবে না ; কারণ প্রভুর শরীর ভাল নয়, হয় ত কোথাও তুইটী রান্না করিতে হইবে, তখন বড়ই অসুবিধা হইবে। সুতরাং ফণী এবং গোবিন্দ দাদা এই তুইজনকে সঙ্গে নিতেই হইবে।

বাবাজী মহাশয় সকলের একান্ত ইচ্ছা জানিয়া আর কোনও কথা বলিলেন না। সকলের মহাপ্রসাদ পাওয়া শেষ হইয়া গেল, প্রভুপাদের বিছানাপত্র আনান হইল। অপরাহ্ন সময়ে ষ্টেশনে রওনা হইবার মানসে শ্রীশ্রীরাধাকান্ত, রাধাবিনোদ, নিতাই গৌরাঙ্গ প্রভৃতি আশ্রমস্থ ভগবদ্‌বিগ্রহের নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ নিতান্ত অসহায়া অনাথা অনন্যশরণা ললিতাদাসী প্রভৃতি কয়েকজনকে বিশেষভাবে প্রবোধ দিয়া রওনা হইলেন।

ললিতা দাসী প্রভৃতি কয়েকজন ছাড়া আশ্রমবাসী প্রায় সকলেই সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশনে গমন করিলেন। কলিকাতা যাইবার ট্রেণ সন্ধ্যা সাতটায় ; সুতরাং একপার্শ্বে একখানি কম্বল বিছাইয়া গোস্বামী প্রভু এবং ইনি উপবেশন করিলেন। চারিদিকে ভক্তগণ ঘিরিয়া বসিল।

নানারূপ ভগবৎ-প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন— "আজ্ঞে! কতদিনে প্রত্যাবর্ত্তন হইবে?"

বাবাজী। নিতাইচাঁদের ইচ্ছায় বোধ হয় শীঘ্রই আসিতে হইবে।

ভক্ত। আজ্ঞে! এখন কোথায় যাওয়া হইবে?

বাবাজী। সর্ব্বপ্রথম শ্রীধাম নবদ্বীপ, তৎপরে হয় ত কলিকাতায় আসিতে পারি।

ভক্ত। যতদিন পর্য্যন্ত আপনি শ্রীধাম পুরী প্রত্যাবর্ত্তন না করিবেন, ততদিনই আমাদিগকে নিরানন্দে কাটাইতে হইবে!

বাবাজী। বাবা! সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীজগন্নাথ যে স্থানে নিত্য বিরাজমান, আবার সপরিকরে নিতাই গৌরাঙ্গ যে স্থানে বর্ত্তমান, সে স্থানে সামান্য একটা জীবের জন্য এত অভাব বোধ করা কেন?

ভক্ত। আজ্ঞে! তাঁহারা যে নিত্যবিরাজমান বা সর্ব্বদা লীলা-বিলাস-পরায়ণ এই কথাই ত আপনি না থাকিলে আমাদের অনুভব হইয়া উঠে না। আপনার কৃপায় আমরা অপ্রকট লীলাটীও সাক্ষাৎ রূপে অনুভব করিয়া থাকি। শোক, মোহ, জ্বালা যন্ত্রণার সংসারে থাকিয়াও আমরা আপনার দর্শনে পরমানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যাই; সুতরাং শ্রীচরণে বিনীত প্রার্থনা এই যে, আপনার মধুময় সঙ্গসুখ হইতে যেন বঞ্চিত করিবেন না। যত সত্বর হয় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিবেন।

বাবাজী মহাশয় একটু মৃদু হাসিয়া "নিতাই চাঁদের ইচ্ছা" বলিয়া বলরামকে কয়টা বাজিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন।

বলরাম। আজ্ঞে! পাঁচটা বাজে, আমি একবার মন্দির হইতে আসি, পরে টিকিট করা যাইবে।

বাবাজী। তোমার আসিতে বিলম্ব হইবে না ত?

বলরাম। "আজ্ঞে! আমি এখনই ফিরিয়া আসিতেছি" বলিয়া দ্রুতগতি গমন করতঃ শ্রীজগন্নাথের অনেক রকম মহাপ্রসাদ লইয়া আসিলেন। মহাপ্রসাদ দর্শন মাত্র বাবাজী মহাশয় প্রণাম করিয়া প্রেম-পুলকিত অঙ্গে সাশ্রুগদগদকণ্ঠে "দয়াময়! আমি তোমাকে ছাড়িতে চাহিলেও তুমি আমাকে ছাড়িতেছ না, এইটিই তোমার অহৈতুকী কৃপার চিহ্ন" ইত্যাদি নানারূপ ভাবে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রতি নিজ আর্ত্তি জানাইতে লাগিলেন। এদিকে গোবিন্দ দাদা মহাপ্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা করিয়া প্রভুকে বলিবামাত্র উভয়ে গিয়া মহাপ্রসাদ সেবা করিতে বসিলেন। বলরামবাবু ইঁহাকে কতখানা টিকিট করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করায় ইনি বলিলেন—"সীতারাম, কালিদাস ব্রহ্মচারী, নিতাই, গোবিন্দ, প্রভু এবং আমি এই ছয় জনের জন্য ছয়খানা টিকিট করিয়া আন।" ফণীর টিকিটের খরচ ললিতাদাসী ইতিপূর্ব্বেই বলরাম বাবুর নিকট দিয়াছিল; কাজেই বলরাম দাদা সাতখানি টিকিট করিলেন। কৃষ্ণদাস ইঁহার সঙ্গে যাইবার মানসে পূর্ব্বদিনের কাপড়ের দাম দোকানীকে না দিয়া নিজের নিকট রাখিয়াছিল, সে গোপনে একখানি হাওড়ার টিকিট করিল। নন্দও তাহার কাকার নিকট হইতে টাকা আনিয়াছিল; সুতরাং সেও ইঁহার অজ্ঞাতসারে একখানি টিকিট কিনিয়া আনিল। বাবাজী মহাশয় এবং প্রভুপাদ মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া সকলের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক গাড়ীতে উঠিলেন। নন্দ এবং কৃষ্ণ একটু আড়ালে আড়ালে গাড়ীতে উঠিল। হঠাৎ বাবাজী মহাশয় উহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন—"কিরে! তোরা কেন গাড়ীতে উঠিলি?"

নন্দ। আজ্ঞে! আমি কটক পর্য্যন্ত যাইব মনে করিয়াছি।

বাবাজী। কৃষ্ণ কোথায় যাইবে?

কৃষ্ণ। আজ্ঞে! আমিও নিকটেই যাইব।

এইরূপভাবে কথা হইতে হইতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ক্রমে গাড়ী কটক ষ্টেশনে আসিলে ইনি কৃষ্ণ ও নন্দকে বলিলেন—"তোমরা নাকি কটকে নামিবে ?"

কৃষ্ণ। আজ্ঞে! আমাদের ইচ্ছা যে আপনার সঙ্গে যাইব।

বাবাজী। তাহা হইলে তোমরা ফাঁকি দিয়া গাড়ীতে চড়িয়াছ ?

কৃষ্ণ। আজ্ঞে না, আমরা টিকিট করিয়াছি।

বাবাজী মহাশয় আর কিছুই বলিলেন না। গাড়ী ক্রমে নানাদেশ দেশান্তর অতিক্রম করিয়া রাত্র চারিটার সময় হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল। সকলেই নামিয়া একবার মা গঙ্গার দর্শন স্পর্শন করতঃ ভোর ছয়টার সময় মগরার গাড়ীতে উঠিলেন। এবার আর বাবাজী মহাশয়ের কলিকাতা বা অন্য কোনও স্থানে যাইবার একেবারেই ইচ্ছা নাই। একজন বলিলেন—"আজ্ঞে। এবার কলিকাতা গেলে হইত না কি ?" বাবাজী মহাশয় উহাকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন—"দেখ, যখন যে কার্য্য করিতে হইবে, তাহার গৌণ মুখ্য উদ্দেশ্য বিচার করা প্রয়োজন। আমরা মনে সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছি শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন করিব। নিতাইচাঁদ সেইরূপভাবে আনুকূল্যও করিয়াছেন; কিন্তু যদি আমাদের নিজ বুদ্ধির কৌশলে বা কোনও ভিন্ন উদ্দেশ্যে অন্য স্থানে যাইতে ইচ্ছা করি বা চেষ্টাও হয় সেটাকে স্বতন্ত্রতা বলে। এইরূপ স্বতন্ত্রতার ফলে মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনে অনেক সময় ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে; সুতরাং মুখ্য কার্য্য সাধন না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য কোনরূপ বাসনাই মনে আনিতে নাই। যত সত্বর হয় শ্রীধাম দর্শন করিবার চেষ্টা কর, তৎপরে যাহার যাহা বাসনা থাকে, বাঞ্ছাকল্পতরু পূরণ করিবেন।" ইত্যাদি নানারূপ কথাবার্ত্তায় পরমানন্দে গাড়ীর মধ্যে সময় কাটিতে লাগিল।

বেলা আন্দাজ সাড়ে নয়টার সময় গাড়ী মগরা ষ্টেশনে পৌছিল।

বাবাজী মহাশয় প্রভুপাদকে সঙ্গে লইয়া ঘোড়াগাড়ী যোগে ত্রিবেণী ঘাটে উপস্থিত হইয়া পরমানন্দে গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন এবং যত সত্বর হয় সঙ্গীগণকে স্নান-আহ্নিকাদি শেষ করিয়া লইতে বলিলেন। তাহাই হইল, অন্যান্য সকলেই স্নানাদি করিতে লাগিলেন। এদিকে গোবিন্দ দাদা কিছু বাল্যভোগের যোগাড় করিলেন। ইনি যথাসময়ে প্রভুপাদকে সঙ্গে করিয়া আগমনপূর্ব্বক বাল্য ভোগ মহাপ্রসাদ পাইলেন। যে স্থানে ইঁহারা অবস্থান করিতেছিলেন, সে স্থান হইতে ষ্টীমারঘাট প্রায় আধ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ইঁহারা কিছুদূর যাইতে না যাইতে ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। তখন গোস্বামী প্রভু বলিলেন "দাদা! আর ওদিকে যাইয়া কি হইবে? ষ্টীমার ত আর আজ পাইবার সম্ভাবনা নাই।" ইনি একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"দেখ ভাই! নামে যখন অসাধ্য-সাধন হয়, অসম্ভব সম্ভব হয়, অপ্রাপ্য পাওয়া যায়, তখন কি সামান্য একখানা ষ্টীমার পাওয়া যাইবে না, আচ্ছা দেখাই যাক্ না কেন! বলিয়া উচ্চকণ্ঠে "হরিবোল, হরিবোল" ধ্বনি করিয়া গায়ের চাদরখানা উড়াইতে লাগিলেন। জানি না নিতাইচাঁদের কি খেলা! ষ্টীমার ঘাট ছাড়িয়া অনেক দূর চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেই অঘাটেই আবার থামিলে ইঁহারা পরমানন্দে গিয়া উঠিলেন। ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। সকলেরই নবদ্বীপের টিকিট হইয়াছে। যে যে ঘাটে ষ্টীমার লাগিতেছে ইনি প্রত্যেক ঘাটেরই নাম জিজ্ঞাসা করিতেছেন। সন্ধ্যার সময় ষ্টীমার যেমন গুপ্তিপাড়া ঘাটে লাগিল, অমনি ইনি ব্যস্তভাবে উঠিয়া সঙ্গীগণকে বলিলেন—"দেখ, আজ আর নবদ্বীপ যাওয়া হইবে না, আজ এই ঘাটেই নামা যাক্।" তাহাই হইল, সকলেই গুপ্তিপাড়া ঘাটে নামিলেন। ঘোর অন্ধকার—রাস্তা ঘাট লক্ষ্য হইতেছে না। গোবিন্দ দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখান হইতে কোথায় যাওয়া হইবে?"

বাবাজী। এখান হইতে সাতগাছিয়া কুঞ্জলাল গোস্বামীর বাড়ী যাইবার ইচ্ছা আছে।

গোবিন্দ। আজ্ঞে! সে ত এখান হইতে অনেক দূরে।

বাবাজী। কতটা পথ হইবে?

গোবিন্দ। আন্দাজ এক ক্রোশ হইবে, সে আবার বনপথ—ঘোর অন্ধকার।

বাবাজী। দেখ, হয় ত নিতাইচাঁদের ইচ্ছায় কুঞ্জ এবং বিপিন তোমাদের জন্য ঐ পার্শ্বের ঘাটে অপেক্ষাই বা করিতেছে।

গোবিন্দ। আচ্ছা! দেখা যাইবে নিতাইচাঁদের কেমন ইচ্ছা।

এইরূপ নানা কথাবার্ত্তা হইতেছে; যথার্থই পার্শ্বস্থ একটি ঘাটে বসিয়া কুঞ্জলাল গোস্বামী ও বিপিন বিহারী গোস্বামী বলাবলি করিতেছেন যে "অনেক দিন পর্য্যন্ত বাবাজী মহাশয়ের দর্শন পাওয়া যায় নাই, প্রভুর ইচ্ছায় যদি আজ এই ষ্টীমারে বাবাজী মহাশয় আসিতেন তবে বড়ই আনন্দ হইত। এদিকে বাবাজী মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে "হরিবোল" ধ্বনি করিবামাত্র উঁহারা দুইজন ব্যস্তসমস্তভাবে সেইদিকে ছুটিলেন। বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু কাহারই বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। উঁহারা কিছুদূর যাইতে না যাইতেই উঁহাদের আলোচ্য বা অভিলষিত বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। উভয়েই সাষ্টাঙ্গে ভূতলে পতিত হইলে বাবাজী মহাশয় উভয়কে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিবামাত্র সকলে 'গৌর হরিবোল' ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। আনন্দের আর সীমা রহিল না। কিছু সময় এইরূপ পরমানন্দে কাটিয়া গেলে, বাবাজী মহাশয় ঠিক বালকের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন—"দেখ কুঞ্জ! আমি তোমাদের বাড়ী যাইব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। ভালই হইল, নিতাইচাঁদ তোমাদের লইয়া আসিলেন। এখন আর যাইবার প্রয়োজন বা কি?" তখন কুঞ্জ গোস্বামী গদগদকণ্ঠে

বলিলেন—"দেখুন, আজ কয়েক দিন হইতে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিবার জন্য মন যে কিরূপ উৎকণ্ঠিত ছিল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা আমার সাধ্য নয়। আপনি অন্তর্য্যামী, সকলই জানিতে পারেন। আমার বিশ্বাস যে শ্রীমদনগোপাল জীউ আপনাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন, তাহা না হইলে এরূপ হইবে কেন? যাক, যখন দয়া করিয়া এতদূর আসিয়াছেন, এমন কি নবদ্বীপের টিকিট করিয়া গুপ্তি-পাড়ায় নামা হইয়াছে, তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া চলুন একবার শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালজীউকে দর্শন করতঃ একটু বিশ্রাম করিবেন।" গোস্বামীজীর কথা শেষ হইতে না হইতেই প্রভুপাদ রঘুনাথদেব গোস্বামী বলিলেন—"দাদা! কুঞ্জ দাদা যাহা বলিলেন তাহাই করা যুক্তিসঙ্গত; সুতরাং আজ চলুন উঁহাদের মদনগোপালজীউ দর্শন করিতে যাওয়া যাক্।" তাহাই হইল, সকলেই হৃষ্টচিত্তে নাম করিতে করিতে রওনা হইয়া রাত্র অনুমান সাড়ে সাতটার সময় গিয়া সাতগাছিয়া মদন-গোপালের বাড়ী পৌঁছিলেন; আনন্দের আর অবধি নাই। আবাল-বৃদ্ধ-যুবা সকলেই ইঁহার নিকটে আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক সরল প্রাণে নানারূপ কুশল প্রশ্ন করিতেছে এবং নিজ নিজ সুখ-দুঃখের কথা ইঁহার চরণে নিবেদন করিতেছে।

এইরূপ পরমানন্দে তিন চারি দিন কাটিয়া গেল। ইনি যখনই শ্রীধাম নবদ্বীপ যাইবার কথা বলেন, অমনি কুঞ্জ গোস্বামীর পুত্রকন্যাগণ দাদা মহাশয় বলিয়া আবদার ভাবে আটক করিয়া ফেলে। আজ সকলকে মিষ্টবাক্যে বুঝাইয়া নবদ্বীপ যাইবার মানসে কালনা অভিমুখে রওনা হইলেন। যথাসময়ে কালনার শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং নামব্রহ্ম প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানসকল দর্শন করতঃ ষ্টীমারঘাটে আসিতে কিছু বিলম্ব হইল। এদিকে নবদ্বীপের ষ্টীমার ছাড়িয়া গেল দেখিয়া কুঞ্জ গোস্বামী সেদিনকার

মত সাতগাছিয়া যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ করিতে লাগিলে ইনি কিছুতেই স্বীকৃত না হইয়া অন্ততঃ নৌকাযোগে নবদ্বীপ রওনা হইলেন। নৌকার মধ্যে নানারূপ কথাপ্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। কালিদাস ব্রহ্মচারী ইঁহাকে প্রশ্ন করিলেন—"আচ্ছা, ভগবদ্বহির্মুখ জীবের উন্মুখ হইবার উপায় কি?"

বাবাজী। সাধু এবং গুরুকৃপাই একমাত্র বহির্মুখ জীবের উন্মুখ হইবার সম্বল।

ব্রহ্ম। সাধু এবং গুরুকৃপা পাইবার উপায় কি?

বাবাজী। কৃপা অহৈতুকী; এমন কোনই সাধন নাই, যাহা কৃপার প্রতি কারণ হইতে পারে।

ব্রহ্ম। তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণের প্রতি এই কৃপা হয় না কেন? ইহাতে সাধুদিগের উপর পক্ষপাতিত্ব দোষ বর্ত্তে না কি?

বাবাজী। চন্দ্র সূর্য্য যেমন সর্ব্বত্রই সমভাবে কিরণ বিস্তার করেন, কিন্তু বস্তুবিশেষে শৈত্য বা উষ্ণতা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, আবার মেঘ যেমন সর্ব্বত্রই বর্ষণ করেন; কিন্তু পার্ব্বত্য ভূমিতে জল দাঁড়ায় না, বালুকাময় প্রদেশে জলের ক্রিয়া দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ সাধু-দিগের কৃপা সর্ব্বত্রই সমভাবে বর্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু পাত্রবিশেষে তাহার ক্রিয়ার তারতম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীভগবানে যেমন বৈষম্য দোষ থাকিতে পারে না, সাধু মহাত্মাতেও সেইরূপ পক্ষপাতিত্ব থাকিতে পারে না।

ব্রহ্ম। তাহা হইলে কৃপাশক্তি অপেক্ষা বস্তুশক্তির প্রাধান্য হইল না কি? চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতির কেবলমাত্র কিরণ বিস্তারের ক্ষমতা; সুতরাং যে বস্তুর যেরূপ শক্তি, ক্রিয়াও তদ্‌জাতীয়ই হইয়া থাকে, কিন্তু মহতের

কৃপাশক্তি যদি বস্তুশক্তিকে নষ্ট করিতে না পারেন তবে আর তাঁহার প্রভাব কি হইল ?

বাবাজী। তুমি মহৎকৃপা সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিলে সমস্তই সত্য। মহৎকৃপার অসাধ্য কিছুই নাই; কিন্তু মহাত্মাগণ কৃপা-পরবশ। কৃপা-প্রভাব উঁহাদিগকে যে দিকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে ইচ্ছা করে, উঁহারা অননুসন্ধানে সেইদিকে চলিয়া যান। এই কৃপাপ্রবাহ যে পথে গমন করে, সে পথের মধ্যস্থিত তৃণলতা এমন কি পাহাড় পর্ব্বত পর্য্যন্ত গলিয়া যায়।

ব্রহ্ম। আচ্ছা, এই কৃপার স্রোত কোন্ পথে যাইবে তাহার কোনও নির্দ্দিষ্ট পথ থাকে কি ?

বাবাজী। কিছুই না, কারণ কৃপা স্বতন্ত্র বস্তু, কখন কাহারও অধীন নহে। কৃপার প্রতি কারণ কৃপা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে এটী ধারনা রাখা উচিত যে স্রোত নিম্নগামী। যে কোন কারণেই হউক হৃদয় একটু আর্দ্র, একটু অনুতপ্ত না হইলে, একটু ব্যাকুলিত ভাবে অভিমান মঞ্চ হইতে কিঞ্চিৎ না নামিলে বস্তু প্রায়ই প্রতিফলিত হইতে দেখা যায় না।

ব্রহ্ম। কলিহত মায়ামুগ্ধ অবিদ্যাচ্ছন্ন হৃদয়ে চৈতন্য জন্মাইবার উপায় কি ?

বাবাজী। কলিহত দুর্ব্বল জীবের জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন যজ্ঞের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন,—"হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়। নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥ নামসংকীর্ত্তন হইতে সর্ব্বানর্থনাশ। সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণে পরম উল্লাস॥ সংকীর্ত্তন হইতে পাপ সংসার নাশন। চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদগম॥ কৃষ্ণপ্রেমোদগম প্রেমামৃত আস্বাদন। কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥ খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। কাল দেশ নিয়ম নাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"

ব্রহ্ম। এই নামসংকীর্ত্তনেও ত শ্রদ্ধাভক্তি চাই, তাহা না হইলে ফল হইবে কেন?

বাবাজী। শ্রদ্ধাভক্তি থাকিলে ত ভালই; কিন্তু না থাকিলে যে হইবে না এমন কোনও কথা নাই। শাস্ত্র বলিয়াছে—"সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা। বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥ গুরু এবং শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। কলিহত জীবের হৃদয়ে এই বিশ্বাস জন্মাইবার উপায় একমাত্র নামসংকীর্ত্তন ছাড়া অন্য কিছু আজ পর্য্যন্ত কেহ নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন নাই; সুতরাং মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাক্যই সর্ব্বোপরি বিরাজমান।

ইত্যাদি নানারূপ প্রসঙ্গে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে নৌকা আসিয়া নবদ্বীপের সন্নিকট ঘোলাপাড়ায় উপস্থিত হইলে, বাবাজী মহাশয়ের আদেশক্রমে গোবিন্দ দাদা এবং কৃষ্ণদাস দুইজনে হাঁটা পথে বড়ালঘাটস্থ পরম গুরুদেবের আশ্রমে গমনপূর্ব্বক বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়কে ইঁহার আগমনবার্ত্তা জানাইলেন। বৃদ্ধ বাবাজী মহারাজের মনে আনন্দ আর ধরে না! পরম উৎসাহের সহিত ইঁহাদের আহারাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। রাত্র প্রায় সাতটার সময় নৌকা আসিয়া বড়ালঘাটে পৌছিলে সকলে নাম করিতে করিতে আশ্রমে উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়কে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রভুপাদকে রাখিয়া নিজে বৃদ্ধ বাবাজী মহারাজের সহিত নানা কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। রাত্র অনুমান দশটার সময় ঠাকুরের ভোগ শেষ হইলে সকলে মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন।

গোপাল ঘটকের ব্যাধিমোচন

বাবাজী মহাশয় অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া নিজ নিত্যকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক প্রভুপাদ রঘুনাথদেব গোস্বামীর সেবার কোনওরূপ ত্রুটি না হয় এ বিষয়ে গোবিন্দ দাদা, ফণী প্রভৃতিকে বিশেষভাবে আদেশ করতঃ বাহির হইলেন। সর্ব্বপ্রথমে শ্রীহরি সভায় গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট নানারূপ ভাবের প্রার্থনা, দৈন্য, আত্মনিবেদনপূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ সে স্থান হইতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু এবং শ্রীমহাপ্রভু দর্শন ও দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া শ্রীধামবাসী গোস্বামী বৈষ্ণব এবং অন্যান্য সকলের সহিত যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সকলেই যেন ইঁহাকে পাইয়া কেমন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

বেলা অনুমান দশটা, এই সময় কি যেন মনে হইল, একেবারে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘটক মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহাকে দেখিবামাত্র ঘটক মহাশয়ের ধর্ম্ম মা (বৈষ্ণবদাসী) ব্যাকুল ভাবে রোদন করিতে করিতে বাৎসল্য-প্রবণ হৃদয়ে হাত ধরিয়া ঘটক মহাশয়ের নিকট লইয়া গেলেন। ঘটক মহাশয় আজ কয়েকদিন হইতে জ্বর এবং পেটের অসুখে ভুগিতেছেন। অবস্থা অতীব শোচনীয়। ডাক্তার কবিরাজগণ এক প্রকার নিরাশ হইয়াছে। উঠিবার বা কথা কহিবার সামর্থ্য নাই। অতিকষ্টে অনেকক্ষণ পরে বাবাজী মহাশয়কে চিনিলেন, কিন্তু কোনও কথা কহিবার সাধ্য হইল না; কেবল দুইটি চোখের জলে গণ্ডস্থল প্লাবিত করতঃ উঁহার প্রাণের দাদাকে প্রাণের ভাব যাহা জানাইবার জানাইলেন। ইনিও সাশ্রুগদগদকণ্ঠে "জয় নিত্যানন্দ রাম" বলিয়া হুঙ্কার করতঃ উঁহার বক্ষস্থলে বাম হস্তখানি দিয়া

বলিলেন—“ভয় কি ভাই! তোমার অসুখ হইয়াছে, ইহা নিতাইচাঁদ আমাকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছেন, তাই আমার এত তাড়াতাড়ি আসা। নিতাইএর ইচ্ছায় কাল ভাল হইয়া যাইবে।” বৈষ্ণবদাসীকে বলিলেন—“মা! আজ সন্ধ্যার সময় অধিবাস করিয়া কাল অষ্টপ্রহর নাম করিতে হইবে।” বৈষ্ণবদাসী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—“বাবা! গোপালের ত এইরূপ অবস্থা, আমার ত বুদ্ধিবিবেচনা লোপ হইয়া গিয়াছে, কে কি যোগাড় করিবে?”

বাবাজী। সেজন্য তোমার কোনই চিন্তা নাই। আমরা তোমার ঘরের ছেলে, আমাদের জন্য আবার যোগাড় কি? আমরা আশ্রমে মহাপ্রসাদ পাইয়া এখানে নাম করিব।

বৈষ্ণবদাসী। বাবা! আমি আর কি বলিব! গোপাল তোমা ভিন্ন আর জানে না, যাহাতে উহার মঙ্গল হয় কর। আমি উহাকে তোমার হাতে সমর্পণ করিলাম। রাখ বা মার তোমার ইচ্ছা।

বাবাজী। ভয় কি মা! মঙ্গলময় নিতাইচাঁদের জিনিষ তিনি রক্ষা করিবেন। আমাদের কর্ত্তব্য তাহার নাম করা, আমরা তাহাই করিব।

এই বলিয়া আশ্রমে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক স্নানাদি করতঃ মহাপ্রসাদ গ্রহণান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন। সন্ধ্যার সময় ঘটক মহাশয়ের বাড়ী অধিবাস কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। গৌরদাস বিহারীদাস, উদ্ধবদাস প্রভৃতি চারি পাঁচজন বায়েন আনন্দোৎফুল্লভাবে মৃদঙ্গ বাজাইতেছে। একলা নিতাইএর বাড়ীর মহান্ত শ্রীবিশ্বম্ভরদাস প্রভৃতি অনেক মূর্ত্তি মহান্ত ইঁহার সঙ্গে কীর্ত্তন করিতেছেন। আনন্দের আর সীমা নাই। রাত্র প্রায় সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত অধিবাস কীর্ত্তন হইয়া কীর্ত্তন সমাপ্ত হইল। সকাল বেলা অপেক্ষা ঘটক মহাশয়ের অবস্থা অনেকটা ভাল। বাবাজী মহাশয় উঁহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “কি রকম ভায়া! কেমন আছ?” ঘটক

মহাশয় আস্তে আস্তে বলিলেন,—"দাদা! আপনার কৃপায় অনেকটা সুস্থ বোধ হইতেছে। যাহা হউক, এখন আর আমার কোনই ভাবনা নাই। যখন আপনাকে পাইয়াছি তখন মরিলেও আনন্দ, বাঁচিলেও আনন্দ। আপনার শ্রীচরণে আমার এই প্রার্থনা যেন শেষ সময় একটু লক্ষ্য থাকে। আমার নিজের স্মরণ থাক আর নাই থাক, যেন আপনার শ্রীমুখের মধুমাখা নাম শুনিতে শুনিতে এ দেহ ত্যাগ করিতে পারি।"

বাবাজী। ভাই! ওটা ত সকলেরই কথা। যাহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইবে, যাহাকে নিতাইচাঁদ আকর্ষণ করিবেন, তাহাকে যাইতেই হইবে এবং তাহারই উপরে অপরের শেষের ভারটা রহিল।

এই বলিয়া আশ্রমে চলিয়া গেলেন। পরদিবস অতি প্রত্যূষে নাম আরম্ভ হইল! বেলা অনুমান নয়টার সময় ইনি ঘটক মহাশয়ের কাছে গিয়া দেখেন যে তিনি বসিয়া আছেন। ইঁহাকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলে ইনি উঁহাকে উঠাইয়া দৃঢ় আলিঙ্গন দানে রোগ শোক দুর্ব্বলতা সমস্তই গ্রহণ করতঃ অপ্রাকৃত বলে বলীয়ান্ করিলেন। আর যেন সে ঘটক মহাশয় নাই, বেশ সুস্থ সবল দেহ। উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া নামের নিকট গমন করিলে ইনি বলিলেন—"গায়ের কাপড় খুলিয়া রজে গড়াগড়ি দাও, নিতাইচাঁদের কৃপায় আধি ব্যাধি সমস্ত দূর হইয়া যাইবে।" ঘটক মহাশয় তাহাই করিলেন। দেখিয়া শুনিয়া সকলে অতিশয় বিস্মিত হইলেন; পূর্ব্বদিন যে ব্যক্তির জীবনের আশা করিতে সকলে ইতস্ততঃ করিয়াছেন, আজ সেই ব্যক্তি সুস্থভাবে আসিয়া নামের মধ্যে গড়াগড়ি দিতেছেন এবং সকলের সহিত সমস্বরে নাম করিতেছেন। এই সমস্ত দেখিয়া কে না বিস্মিত হইবে? কে না একবাক্যে মহাপুরুষের কৃপাশক্তির জয় দিবে? কাহার না হৃদয় দ্রব হইবে? কাহার না চোখে জল আসিবে? ঘটক

মহাশয় হাতে তালি দিয়া নাম করিতেছেন, আর দুইটী চোখের জলে মুখ বুক ভাসিয়া যাইতেছে। বাবাজী মহাশয় ভাবাবেশে গদগদকণ্ঠে নাম করিতেছেন, আর উঁহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছেন। অপূর্ব্ব আনন্দ সকলেই যেন কি এক অভুতপূর্ব্ব ভাবে নিমগ্ন হইয়া নৃত্য কীর্ত্তন করিতেছেন, আর চোখের জলে ভাসিয়া যাইতেছেন। বাজারের মধ্যেই ঘটক মহাশয়ের বাড়ী; সুতরাং দোকানী-পশারী, মুটে-মজুর, হিন্দু-মুসলমান, স্ত্রী-পুরুষ, যিনিই নামের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন তাঁহারই ঐ দশা। তিনিই নিজ নিজ ব্যাপারের কথা ভুলিয়া গিয়া নামসাগরে ঝাঁপ দিতেছেন। কাহারই বাহ্যস্মৃতি নাই। সকলেই যেন কেমন একপ্রকার হইয়া গেলেন। বহুক্ষণ এইরূপ নামানন্দ উপভোগ করিয়া বাবাজী মহাশয় কিঞ্চিৎ বাহ্য দশা প্রাপ্ত হইয়া ঘটক মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া একটী ঘরের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

এদিকে নাম সমান ভাবেই চলিতেছে। কিছুক্ষণ পরে ঘটক মহাশয় বলিলেন—"দাদা! কালকার মহোৎসবের কি হইবে?"

বাবাজী। ভাই! যা তোমার ইচ্ছা।

ঘটক। এবার যখন আপনার কৃপায় বাঁচিয়া উঠিলাম তখন ওটা আর বাদ যায় কেন।

বাবাজী। মঙ্গলময় নিতাইএর কৃপায় কোনটা বাদ দেওয়া উচিত নয়। যেরূপ মনে উদয় হয় কর, প্রভু পূরণ করিবেন।

এই বলিয়া ইনি স্নানাদি করিতে গমন করিলেন। এদিকে ঘটক মহাশয় মহোৎসবের যোগাড় করিতে লাগিলেন। নিজে যদিও বাজারের মধ্যে যাইতে সমর্থ তথাপি অনেকের অনুরোধে নিজে না গিয়া লোকদ্বারা সমস্ত কার্য্য করাইতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় স্নানাদি করিয়া মহা-

প্রসাদ গ্রহণান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন। কোথা দিয়া যে দিন রাত্র কাটিয়া গেল কাহারই খেয়াল নাই! বেলা আটটার সময় নগর কীর্ত্তন বাহির হইয়া অনেক স্থানে ভ্রমণপূর্ব্বক বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় বাড়ীতে আসিয়া কীর্ত্তন সমাপ্ত করিলেন। ঘটক মহাশয় একবার কীর্ত্তনান্তে রজে গড়াগড়ি দিয়া স্নান করিবেন কি না ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় ইনি উঁহাকে গঙ্গায় অবগাহন স্নান করিতে আদেশ করতঃ নিজেই উঁহাকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। যথাসময়ে ঠাকুরের ভোগ শেষ হইলে বৈষ্ণব পঙ্গত আরম্ভ হইল। মহৎকৃপার প্রভাবে ঘটক মহাশয় নিজেই ইঁহাদিগকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"ভাই! নিতাইচাঁদ খুব খেলা দেখাইলেন, এখন আইস একসঙ্গে বসিয়া মহাপ্রসাদ পাওয়া যাক্।" ঘটক মহাশয় বৈষ্ণবসেবা না হইলে বসিবেন না বলিয়া প্রথমে একটু আপত্তি করিলে উপস্থিত বৈষ্ণবগণ প্রসন্নচিত্তে উঁহাকে মহাপ্রসাদ পাইবার আদেশ করিলে দুই ভাই একসঙ্গে বসিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন।

বিবিধ প্রস্তাব

একদিন বুড়া বাবাজী মহারাজের নিকট বাবাজী মহাশয় বসিয়া নানা কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এই সময় কলিকাতার আখড়ার মহান্ত কিশোর দাস বাবাজী মহাশয় আসিয়া বলিলেন—"আমার বড়ই বাসনা যে একদিন আমার ওস্থানে একটী অষ্টপ্রহরনাম কীর্ত্তন হয়। বাবাজীমহাশয় শুনিয়া বলিলেন—"ভাই! আমি ত তোমাদেরই; সুতরাং আমাকে আর

জিজ্ঞাসা করা কেন, মনে বাসনা হইয়া থাকে আজই অধিবাস করা যাক্।” তাহাই হইল, মহান্ত মহারাজ বিশেষ উৎসাহের সহিত সমস্ত যোগাড় করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে অধিবাস কীর্ত্তন আরম্ভ হইল অপূর্ব্ব আনন্দ। কি আশ্চর্য্য! একই পদ, একই স্বরে গাওয়া হইতেছে, কিন্তু যেন নূতন বলিয়া মনে হইতেছে। তিনদিন পূর্ব্বে ঘটক মহাশয়ের বাড়ী যে অধিবাস কীর্ত্তন হইয়াছে, আজও ঠিক সেইই পদ; কিন্তু যেই শুনিয়াছে সেই যেন নূতন বলিয়া মনে করিতেছে। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত পরমানন্দে অধিবাস কীর্ত্তন হইয়া গেল। পরদিবস অতি প্রত্যূষে নাম আরম্ভ হইল। লোকে লোকারণ্য। ঘটক মহাশয়ের বাড়ীতে স্থানের সংকীর্ণতা বশতঃ ইচ্ছা সত্ত্বেও যে লোক নামে যোগ দিতে পারে নাই, তাহারা এস্থানে আসিয়া সচ্ছলভাবে নামে যোগদান করতঃ পরমানন্দ উপভোগ করিতেছে। বেলার সঙ্গে সঙ্গে নামের রোল যেন গগন ভেদ করিয়া উত্থিত হইতে লাগিল। সকলেই মাতোয়ারা, চারি পাঁচ ঘণ্টা এক একজন নাম করিতেছে তবুও ক্লান্তি নাই।

এইরূপ পরমানন্দে কোথা দিয়া দিবারাত্র কাটিয়া গেল কাহারই খেয়াল নাই! বেলা আটটার সময় সকলের মানসিক অভিপ্রায় না থাকিলেও কর্ত্তব্যের অনুরোধে নাম সমাপ্তি করিয়া নগরকীর্ত্তনে বাহির হইলেন। গতদিনের নগরকীর্ত্তন অপেক্ষা আজকার কীর্ত্তনে অধিক আনন্দ হইতে লাগিল; সুতরাং পরিভ্রমণও অনেকটা বেশী স্থানে হইতে লাগিল। বেলা অনুমান সাড়ে এগারোটার সময় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক নাম সমাপ্তি করতঃ যথাসময়ে স্নান-আহ্নিকাদি সারিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণান্তে আশ্রমে আসিয়া বিশ্রাম করিলেন।

একদিন একটী মা গোস্বামিনী আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন —“বাবা! আমার একটী বাড়ী আছে, আমার ইচ্ছা যে ঐ বাড়ীটী

আপনার নামে দানপত্র করিয়া দিই এবং আমার শেষ জীবনটা আপনার সংস্রবে থাকিয়া একরকমে চলে।

বাবাজী। মা! বাড়ীটি কোন্ স্থানে?

মা গোস্বামিনী। বাবা! এই যে, এই আশ্রমেরই পশ্চিমপার্শ্বে।

বাবাজী। আচ্ছা চলুন, আমি একবার দেখিয়া আসি।

মা গোস্বামিনী ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী দেখাইলে ইনি বলিলেন—"মা! জীবন অনিত্য, কে আগে যাইবে ঠিক নাই; সুতরাং আমি দান গ্রহণ করিতে পারিব না। তবে আপনি স্থানীয় পাঁচজন ভাল লোককে দেখাইয়া যে দাম হয় আমাকে বলিলে আমি যে কোন প্রকারে হউক টাকা দিয়া দিব।" মা গোস্বামিনী অগত্যা তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া পাঁচজনকে দেখাইলে উঁহারা সাড়ে পাঁচশত টাকা বাড়ীর উপযুক্ত মূল্য নির্দ্ধারণ করিলেন। মা গোস্বামিনী ইঁহাকে বাড়ীর মূল্যের কথা বলায় ইনি বলিলেন—"আপনার মত কি?"

মা গোস্বামিনী। আমার আর মত কি বাবা! আপনার বিবেচনায় যাহা ভাল হয় করুন।

বাবাজী। মা! আমি আর কি বলিব, আপনি গোস্বামিকন্যা, ঐ বাড়ীর দরুণ আপনি ছয় শত টাকা পাইবেন। মা গোস্বামিনী প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে ইনি হয় ত সাড়ে পাঁচশত টাকারও কম বলিবেন; কিন্তু ইঁহার মুখে ছয় শত টাকার কথা শুনিয়া আশার অতিত ফললাভে অতিশয় আনন্দিতা হইলেন। সেইদিনই বিক্রী কবলা লেখা হইল। শ্রীশ্রীরাধারমণদেবের নামে দেবোত্তর ভাবে খরিদ হইল। এই সময় বড়াল ঘাটের নিকটবর্ত্তী অর্থাৎ আশ্রমের চতুষ্পার্শ্বস্থ অনেক বৈষ্ণব ইঁহাকে বাড়ী বিক্রী বা দান করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলে ইনি কোন না কোন স্তোভ-বাক্যে সকলকে আশ্বস্ত করিতে

লাগিলেন। আশ্রমের পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ রামানন্দ দাস বাবাজী মহাশয় বিশেষ জেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"অনেক দেনা হওয়ায় আমি বড়ই কষ্ট পাইতেছি ; সুতরাং আমাকে আপনি দেনা হইতে মুক্ত না করিলে আর উপায় নাই।"

বৈষ্ণবের কষ্ট হইতেছে শুনিবামাত্র ইঁহার চোখে জল আসিল, গদ-গদকণ্ঠে বলিলেন—"ভাই! কত টাকা হইলে তুমি বেশ সুখী হও এবং দেনা মিটিয়া যায় ?" রামানন্দ দাস বাবাজী বলিলেন, "এগারশত টাকা হইলে ভাল হয়, অগত্যা হাজার টাকা হইলেও চলিতে পারে!" যদিও উঁহার বাড়ীর দাম এগারশত টাকা হইতে পারে না, তথাপি বৈষ্ণবের কথামত এগারশত টাকাতেই ঐ বাড়ী লেখাপড়া করাইলেন।

একদিন দর্শনার্থে শ্রীবাস-অঙ্গনে গমন করিবার সময় উহার সম্মুখ-বর্ত্তী একটী বাগানবাড়ী দেখিয়া শ্রীযুক্ত হরি মজুমদার মহাশয়কে কাহার বাগান ও বিক্রী হইবে কি না জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—"আজ্ঞে, বাগানটী গুরুদাস বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র নশীবাবুর বৈঠকখানা বাড়ী ; সম্প্রতি উঁহাদের অবস্থা তত ভাল নহে। নশীবাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মহীতোষবাবু ইহার দখলিদার, তিনি স্থানটী বিক্রী করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন।

বাবাজী। আচ্ছা, একবার বাগানের ভিতরে গিয়া দেখিলে হয় না ?

মজুমদার। 'বেশ ত চলুন, আমি লইয়া যাইতেছি' বলিয়া বাগানের মধ্যে লইয়া গেলেন। যদিও বৈঠকখানা ঘরটী জীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং বাগানের কোনরূপ যত্ন নাই, তথাপি স্থানটি অতি মনোরম। কয়েকটি কলমের আম গাছ পেয়ারা, কুল, বেল, জাম, জামরুল প্রভৃতি ফলবান্ বৃক্ষ এবং চারিটি প্রকাণ্ড ঝাউগাছ যেন প্রাচীন স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। বিশেষ যত্ন না পাইয়াও ভাল ভাল

ফুটন্ত ফুলগুলি নিজ নিজ সৌরভে ইঁহাকে আমোদিত করিয়া নিজেদের দুর্দ্দশার কথা জ্ঞাপনপূর্ব্বক ইঁহার অভিষ্টদেবের সহিত ইঁহাকে আহ্বান করতঃ যেন ইঁহার চরণে চিরদিনের মত আত্মসমর্পণ করিতেছে। মোটকথা—জীর্ণ শীর্ণ বাগানখানি ইঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ মাত্রই হৃদয়ের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতারূপে ইঁহাকে বরণ করিয়া লইল। বৃক্ষ, লতা, পাতা প্রভৃতি যে বস্তুটিই নয়নপথগামী হইতেছে সেইটিই ইঁহার মনপ্রাণ আকর্ষণ করিতেছে। পূর্ব্বদিক্‌বর্ত্তী পুষ্করিণীটি জল না থাকায় নানারূপ আগাছা পরিপূর্ণ হইলেও বাগানের শোভার বিশেষ ব্যাঘাতকর হয় নাই। বাগানের মধ্যে লোকপ্রবেশের স্থান অতি অল্প হইলেও অতি কষ্টে ইনি যতটুকু দেখিতে পারিলেন, তাহা দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া মজুমদার মহাশয়ের হস্তধারণপূর্ব্বক বিশেষ আগ্রহ সহকারে বলিতে লাগিলেন—"ভায়া! এ স্থানটি আমাকে দিতেই হইবে। এখনই চলুন, আমি আপনার বাড়ী বসিব, আপনি মহীতোষবাবুকে ডাকাইয়া যেরূপ হয় একটা কথা স্থির করিবেন।"

মজুমদার। আপনার কোনই চিন্তা নাই, আমি বাগান আপনাকে করিয়া দিলেই ত হইল।

বাবাজী। দেখুন, আমার বহুদিন হইতে যেরূপ স্থানে বসিবার জন্য মনে সঙ্কল্প ছিল, নিতাইএর কৃপায় সেইরূপ স্থানটিই মিলিয়া গিয়াছে। আর যেন এক মুহূর্ত্তের জন্যও এ স্থানটি ছাড়িয়া আমার অন্যত্র যাইতে মন সরিতেছে না। আপনি আজই একটা কথা ঠিক করুন।

এইরূপ নানাকথা বলিতে বলিতে মজুমদার মহাশয়ের চাপাল গোপাল উদ্ধার বাড়ীতে গিয়া বসিলেন। মজুমদার মহাশয় মহীতোষ বাবুর বাড়ীতে যাইবার জন্য রওনা হইবেন, এই সময় দেখেন যে মহীতোষবাবু আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত। তখন মজুমদার মহাশয় বলিয়া

উঠিলেন—"আহা মরি মরি!" মহতের ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্য ভগবানই ব্যস্ত, আমরা আর কি করিব?" বলিয়া মহীতোষবাবুকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গিয়া বাবাজী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। উভয়ে কিছুক্ষণ নানারূপ কথাবার্ত্তার পর ইনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার বাগানবাড়াটি কি বিক্রী করিবার ইচ্ছা?"

মহীতোষ। আজ্ঞে! পূর্ব্বে তত ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সম্প্রতি আমার মাতৃদেবী ৺গঙ্গালাভ করিয়াছেন, তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদির জন্য কিছু অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় বিক্রী করিতেই হইবে।

বাবাজী। বাগানটি আমাকে দিতে হইবে।

মহীতোষ। এ ত আমাদের পরম সৌভাগ্যের কথা; কারণ আপনার ন্যায় মহাত্মা যদি ঐস্থানে অধিষ্ঠান করেন, তবে আপনার ঠাকুর আসিবেন, সুতরাং সেই উপলক্ষ্য করিয়া কত নামকীর্ত্তন হইবে, কত কত মহাত্মা শুভাগমন করিবেন, কত কত মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে। ইহা অপেক্ষা আর আনন্দের বিষয় কি হইতে পারে?

বাবাজী। আচ্ছা, ইহার কত মূল্য হইতে পারে?

মহীতোষ। আজ্ঞে! মূল্য বলিয়া কোনও কথা নয়, আমার প্রয়োজনমত কিছু হইলেই যথেষ্ট।

বাবাজী। তবুও ত একটা কথা শুনা চাই যে কত প্রয়োজন হইবে?

মহীতোষ। আজ্ঞে! আমার তিন হাজার টাকা হইলেই যথেষ্ট।

বাবাজী মহাশয় হৃষ্টচিত্তে বলিলেন—"আচ্ছা ভাই, এই তিন হাজার টাকাতেই কথা ঠিক হইল। বায়না করিতে হইবে কি?"

মহীতোষ। আজ্ঞে! আপনার কথাই বায়না, আমি বাগানটি আপনাকেই দিলাম; যদি অন্য কেহ পাঁচ হাজার টাকাও বলে, আমি তাহাতে রাজি হইব না।

বাবাজী মহাশয় অমনি আনন্দে উহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিলেন—"ভাই, ! আমি যত সত্বর হয় একবার কলিকাতা হইতে আসিয়াই তোমার টাকা পরিশোধ করিয়া দিব।"

মহীতোষবাবু তাহাতেই রাজি হইয়া বলিলেন—"দেখুন, আমার অন্য কোনই আপত্তি নাই, কেবল আমার মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধ উপস্থিত—ঐ সময়ের মধ্যে পাইলেই হইল।

বাবাজী। ভাই! মা ত আর তোমার একার নহেন, মাতৃশ্রাদ্ধে তোমারও যেমন চেষ্টা করা প্রয়োজন, তেমনি আমারও ত কর্ত্তব্য। ভিক্ষা করিয়া মায়ের শ্রাদ্ধে তিনশত টাকা দিব।

মহীতোষবাবু বিনীতভাবে বলিলেন, "দাদা! আপনি সাধু, আপনার নিকট হইতে টাকা লওয়া ঠিক যুক্তিসঙ্গত হইবে না।"

বাবাজী। আচ্ছা, ভাই! তাহা হইলে ঐ তিনহাজার তিনশত টাকাই বাগানের দাম রহিল।

মহীতোষ। যাহা আপনার ইচ্ছা করিবেন, আমার আর বলিবার কিছুই নাই।

এইরূপে অনেকক্ষণ নানারূপ কথাবার্ত্তার পর বাবাজী মহাশয় আশ্রমে গমন করিলেন। মজুমদার মহাশয়ের ওস্থানে যাহারা উপস্থিত ছিলেন, তাহারা বাবাজী মহাশয়ের শ্রীমুখের কথা শুনিয়া একেবারে বিস্মিতভাবে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—"আমরা বহুরকমের সাধু, বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী, উদাসী, মহাত্মা দেখিয়াছি; কিন্তু এ জাতীয় উদারপ্রাণ আজ পর্য্যন্ত কখনই চক্ষুগোচর হয় নাই। কি আশ্চর্য্য! নিজ মুখে তিনশত টাকা বেশী দিতে স্বীকৃত হইলেন!" একজন বলিলেন—"টাকার কথা যাক্, এমন নিরভিমান সরল ব্যবহার, এমন সম্বন্ধ ভাব মানুষে আছে বলিয়া ত এতদিন আমার বিশ্বাস ছিল না।" ইত্যাদি

নানারূপ কথোপকথন করিতে করিতে সকলে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন।

একদিন সকলেই আশ্রমে বসিয়া আছেন, এইসময় শ্রীপাদ রঘুনাথ-দেব গোস্বামী বাবাজীমহাশয়কে বলিলেন—"দাদা! আমার শরীরটা ত ক্রমেই দুর্ব্বল হইতেছে, দিবারাত্রের মধ্যে প্রায় পঁচিশবার প্রস্রাব হয়, রাত্রে প্রায়ই নিদ্রা হয় না, কিরূপ কি করা হইবে?" আমার জন্য আশ্রমবাসী বৈষ্ণবগণ কতই না উদ্বিগ্ন হইতেছে!" শুনিবামাত্র ইনি যেন একটু চিন্তিতভাবে তাঁহার দিকে তাকাইয়া কি ভাবিলেন ইনিই জানেন—প্রকাশ্যে আর কোনও কথা বলিলেন না। কিছুক্ষণ পরে প্রভুকে ডাকিয়া বলিলেন—"ভায়া! স্নান হইয়াছে?"

প্রভু। না এখনও হয় নাই।

বাবাজী। আচ্ছা চল ভাই, এক সঙ্গেই যাওয়া যাক্।

উভয়ে নানারূপ ইষ্টালাপ করিতে করিতে গঙ্গার ঘাটে গমন করতঃ মায়ের প্রণাম বন্দনাদি করিয়া জলে নামিলেন। নাভিমগ্ন জলে দাঁড়াইয়া ইনি অতিশয় গম্ভীর ভাবে প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"গোঁসাইজী! আজ কোথায় আসিয়াছ?

প্রভু। দাদা! আপনার কৃপায় শ্রীধাম নবদ্বীপ।

বাবাজী। এই ধাম নিত্য?

প্রভু। এ কথায় আর সন্দেহ কি? শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলাভূমি ত্রিকালসত্য।

বাবাজী। এই পতিতপাবনী গঙ্গা সত্য?

প্রভু। নিশ্চয়ই সত্য।

বাবাজী। তুমি এই পতিতপাবনী গঙ্গার মধ্যে দাঁড়াইয়াছ; সুতরাং তুমি নিষ্পাপ এবং সত্যবাক্ একথা তোমার বিশ্বাস হয়?

প্রভু। পূর্ব্বে এ ধারণা না থাকিলেও সম্প্রতি আপনার কথা শুনিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে।

বাবাজী। আচ্ছা আমি যাহা বলিব অবিচারে পালন করিবে। হাতে গঙ্গাজল লইয়া বল—"মা দুর্গতিনাশিনি গঙ্গে! আমার শরীরে যত কিছু আধি ব্যাধি আছে, আজ হইতে আমি সেই সমস্ত ইঁহাকে অর্পণ করিলাম, তুমি সাক্ষী!"

কথাটা শুনিয়া প্রভু শিহরিয়া উঠিলেন। কিছুতেই মুখে উচ্চারণ করিতেছেন না দেখিয়া ইনি বিশেষ জেদ করিতে লাগিলে, তখন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ইনি যাহা বলিলেন, সমস্ত উচ্চারণ করিয়া ইঁহার আদেশানুযায়ী হাতের জলটুকু ইঁহার হাতে দিলেন। ইনি অঞ্জলিপূর্ব্বক সেই সঙ্কল্পিত জল নিজ মস্তকে ধারণ করতঃ প্রভুকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিবামাত্র ইঁহার মুখখানি মলিন হইয়া গেল। ইঁহার আদেশে প্রভুজী তিনটী ডুব দিয়া তীরে উঠিবামাত্র উঁহার দেহ সুস্থ ও সবল হইল, শরীরের রং পরিষ্কার হইয়া গেল। উভয়ে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আহ্নিকাদি শেষ করতঃ যথাসময়ে মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন।

যে মুহূর্ত্ত হইতে গোস্বামী প্রভু সঙ্কল্প করিয়া নিজ রোগ ইঁহাকে অর্পণ করিলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তিনি নীরোগ ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইঁহার কিন্তু দিবারাত্রিতে প্রায় বিশবার প্রস্রাব হইতে লাগিল, শরীরের রং অত্যন্ত মলিন হইয়া গেল।

কলিকাতা উল্টাডিঙ্গিতে গৌরহরি দাস একটী মঠ করিয়াছে। ঐ মঠে ইঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য কয়েকদিন হইল গৌরহরি আসিয়াছে। ঐ সঙ্গে রামদাদাও আসিয়াছেন। একদিন রামদাদা বলিলেন,—"দেখুন! গৌরহরি তাহার মঠে আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য কতদিন হইতে বসিয়া আছে, একবার কি সে স্থানে যাওয়া হইবে না?"

বাবাজী। হ্যাঁ, একবার যাইতে হইবে বই কি! পাগলা কি করিয়াছে চল একবার দেখিয়া আসা যাক্।

রাম। কবে যাওয়া হইবে বলিলে গৌরহরি আগে গিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে পারে।

বাবাজী। আমাদের যাওয়া ত ঠিকই, ও চলিয়া যাক্ না কেন!

শুনিয়া গৌরহরি হৃষ্টচিত্তে চলিয়া গেল। তিন চারিদিন পরে ইনিও সদলবলে প্রভুপাদকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় রওনা হইলেন।

উল্টাডিঙ্গি যাইতে হইবে, সুতরাং দমদম্ ষ্টেশনে নামিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া গেল। একে পৌষমাস তাহাতে কৃষ্ণপক্ষ; সন্ধ্যার সময়েই ঘোর অন্ধকার হইয়াছে। কোন্ রাস্তায় উল্টাডিঙ্গি যাইতে হইবে একজনকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—"আজ্ঞে! এস্থান হইতে রাস্তা ভাল নয়, আপনাকে অনেক কষ্ট করিতে হইবে।" কি করেন, এখন আর উপায় নাই; সুতরাং অতি কষ্টে রাত্র প্রায় নয়টার সময় গিয়া উল্টাডিঙ্গি গৌরহরির মঠে পৌছিলেন। গৌরহরির মনে আনন্দ আর ধরে না, জল আনিয়া সকলের চরণ ধোয়াইতে লাগিল। সকলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতঃ মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন।

বাবাজী মহাশয় আগমন করিয়াছেন, রাত্রের মধ্যেই অবিতর্কিত ভাবে একথা চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়িল। ভোর না হইতে চারিদিক হইতে ভক্তগণ আসিয়া ইঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক নানা তত্ত্বকথা প্রসঙ্গ করিতে লাগিল। এইরূপভাবে কিছু সময় যায়, হঠাৎ বাবাজী মহাশয় রামদাদাকে ডাকিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিতে আদেশ করিলে রামদাদা কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। বহু ভক্তগণ উপস্থিত, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কীর্ত্তনে বিন্দুমাত্র আনন্দ হইতেছে না, পরন্তু গাইয়া বাজিয়াদিগের মধ্যে যেন পরস্পর একটু খটমটি হইতেছে। এই সমস্ত দর্শনে ইনি বিশেষ দুঃখিত

ভাবে নিজে গিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রথমে "জয় জয় শ্রীগুরু, প্রেম কলপতরু, অদ্ভুত যাঁহাকো প্রকাশ"। এই পদ, পরে "জয়রে জয়রে জয়, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, প্রেম ভকতি মহারাজ"। এই পদ গান ধরিয়া প্রেমবিগলিতহৃদয়ে সাশ্রুগদগদকণ্ঠে পদ ধরিলেন—

"প্রভু কহে নিত্যানন্দ, জগ-জীব হৈল অন্ধ,
কেহ ত না পাইল হরিনাম।
এক নিবেদন তোরে, নয়নে দেখিবে যারে,
কৃপা করি লওয়াইবে নাম॥
কৃত পাপী দুরাচার, নিন্দুক পাষণ্ড আর,
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।
শমন বলিয়া ভয়, জীবে যেন নাহি রয়,
সুখে যেন হরিনাম লয়॥
কুমতি তার্কিক জন, পড়ুয়া অধমগণ,
জন্মে জন্মে ভকতি বিমুখ।
কৃষ্ণপ্রেম দান করি, বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী,
খণ্ডাইহ সবাকার দুখ॥
সংকীর্ত্তন-প্রেমরসে, ভাসাইয়া গৌড়দেশে,
পূর্ণ কর সবাকার আশ।
হেন কৃপা অবতারে, উদ্ধার নহিল যারে,
কি করিবে বলরাম দাস॥"

কীর্ত্তনে অপূর্ব্ব আনন্দ হইতে লাগিল। এক একটী কলিতে এক একটী আখর দিতেছেন, আর প্রেমানন্দে আত্মহারা হইয়া যাইতেছেন। সকলেই বিভোর। হঠাৎ বাবাজী মহাশয় অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। অষ্টসাত্ত্বিক বিকারগণ সমকালীন ইঁহার দেহকে আক্রমণ

করিল ; অধীরভাবে সেই আঙ্গিনায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। কার সাধ্য যে ইঁহাকে ধরিয়া রাখে? রঘুনাথদেব গোস্বামী, পুলিনদাদা, গোবিন্দদাদা প্রভৃতি বহুলোক অনেক সন্তর্পণে ইঁহাকে কিঞ্চিৎ স্থির করতঃ কীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া ঘরের মধ্যে একখানি খাটের উপর লইয়া শয়ন করাইলেন। যথাসময়ে ঠাকুরের ভোগ হইয়া গেলে সকলে পঙ্গত করিলেন। সকলের মহাপ্রসাদ সেবা শেষ হইলে গৌরহরির বিশেষ আগ্রহে ইনি উঠিয়া যৎকিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ সেবা করিলেন।

এইরূপে তিনদিন গত হইল। চারিদিনের দিন একাদশী ; ঐদিন অতি প্রত্যূষে রামদাদাকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ রাম! আজ অপরাধ-ভঞ্জনের স্মৃতিদিবস ; সুতরাং সকলকে লইয়া কুলিয়ার পাট যাও।" আমার অপেক্ষা করিবে না ; যদি সুবিধা হয় আমি যাইব, নচেৎ তোমরা দ্বাদশীর পারণ করতঃ সপ্তগ্রাম চলিয়া যাইবে। আদেশ পাইয়া রামদাদা বহু ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে কুলিয়া গমন করিলেন। এদিকে শ্রীপাদ রঘুনাথদেব গোস্বামী প্রভুকে অনেক বলিয়া কহিয়া শ্রীধাম পুরী রওনা করিয়া দিয়া পুলিন দাদার সহিত তাঁহাদের বাড়ী (কলুটোলা ২৬নং শোভারাম বসাক লেন) গমন করিলেন।

সপ্তগ্রামে বাবাজী মহাশয়

এই ঘটনাটি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সেন মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই এ স্থানে উদ্ধৃত করা হইল। তিনি লিখিয়াছেন :—

অধমের নাম রামচন্দ্র সেন। কলিকাতা ২৮নং তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট আমার বাসস্থান। আমি জাতিতে সুবর্ণবণিক। সন ১৩১২ সাল— পৌষ মাস। পৌষী কৃষ্ণা ত্রয়োদশী সুবর্ণ বণিক্-কুলচূড়ামণি শ্রীল

উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর মহাশয়ের তিরোভাব তিথি। এই তিথি আরাধনা উপলক্ষে শ্রীপাট সপ্তগ্রামে মহোৎসব আরম্ভ হইবে। সপ্তগ্রাম কমিটি হইতে কলুটোলার নিমন্ত্রণের ভার এ অধমের উপর অর্পিত হইয়াছে; সুতরাং আমি পরমোৎসাহে নিমন্ত্রণপত্র হস্তে করিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিতেছি। ঘুরিতে ঘুরিতে ২৬নং শোভারাম বসাক লেনে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মল্লিক মহাশয়ের ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সদর দরজা পার হইয়া উঁহাদের নিম্নতলের বৈঠকখানা ঘরের দক্ষিণ পার্শ্বের জানালা হইতে যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার হৃদয়ে যেন কেমন এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ-রসের সঞ্চার হইল—সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। প্রাণে যেন আনন্দ আর ধরে না। তখন প্রফুল্লহৃদয়ে সমুৎ-সুকভাবে জানালার নিকটে আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, বৈঠকখানা ঘরখানি বিশেষ বিশেষ সম্ভ্রান্ত ভক্তমণ্ডলীপরিপূর্ণ। এক পার্শ্বে অতি দীর্ঘাকার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, স্নিগ্ধ-নয়নযুগল, ভাবে গরগর একটী মহাপুরুষ বসিয়া সহাস্যবদনে নানারূপ ভাবে ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেছেন, আর মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ভক্তমণ্ডলী বসিয়া শ্রবণ করিতেছেন। সকলেরই নয়নভৃঙ্গ ইঁহার মুখারবিন্দে ন্যস্ত রহিয়াছে। উঁহাদের তাৎকালিক অবস্থা দর্শনে আমার মনে হইতে লাগিল যেন ভক্তমণ্ডলীর তৃষিত নয়ন-চকোর সমুৎকণ্ঠিতভাবে মহাপুরুষের মুখচন্দ্রোদ্গীর্ণ সুধা আহরণপূর্ব্বক স্ব স্ব কর্ণবিবরে ঢালিয়া ঢালিয়া পান করতঃ বিভোরভাবে গতি মতি হারাইয়া জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সকলেই যেন নিশ্চল নিস্পন্দ ভাবে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। ক্ষণকালের জন্য সেই অপ্রাকৃত অননুভূতপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে আমার নয়ন-যুগল স্নিগ্ধ হইল, মনপ্রাণ জুড়াইয়া গেল। এ জাতীয় আনন্দ আমার জীবনে আর কখনও অনুভব হয় নাই। এই মহাপুরুষকে আমি আর কখনও দর্শন

করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তবে অনেক সময় পুলিনবিহারী মল্লিক মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে শ্রীধাম পুরীর বড়বাবাজী মহাশয় মধ্যে মধ্যে উঁহাদের বাড়ীতে শুভাগমন করিয়া থাকেন। যদিও উঁহাদের বাড়ীতে আমি প্রায় যাতায়াত করি, কিন্তু শুভযোগ আজ পর্য্যন্ত আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। সম্পূর্ণ অপরিচিতভাবে এই মাত্র প্রথম দর্শন হইলেও আমার নয়ন-মন-প্রাণ যেন আমাকে বলিয়া দিল যে—এই সেই বাবাজী মহাশয় ; সুতরাং আমি আর অধিকক্ষণ দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না। কেমন যেন এক প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বৈঠকখানা ঘরের দ্বিতীয় দরজায় অর্থাৎ যেস্থানে বাবাজী মহাশয় বসিয়াছিলেন, তাহার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলাম। আমার তৎকালে এরূপ আত্মহারা ভাব উপস্থিত হইল যে মহাপুরুষকে প্রণাম করিতে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি। কিন্তু অন্তর্য্যামী বাবাজী মহাশয় আমার তদবস্থা উপলব্ধি করিয়াই যেন মধু হইতেও সুমধুর তাহা হইতেও অতি সুমধুর বাক্যে আমার হস্তস্থিত নিমন্ত্রণপত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিলেন,—বাবা! কি আনিয়াছ?"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ইঁহার দর্শনপ্রভাবে আমি যেন কেমন এক প্রকার হইয়া গিয়াছিলাম। ঐ সুধা-বিনিন্দিত কণ্ঠধ্বনি শ্রবণমাত্র যেন চৈতন্য হইল। সমুৎসুকচিত্তে প্রেমবিগলিতকণ্ঠে বলিলাম—"আজ্ঞে! শ্রীপাট সপ্তগ্রামে সুবর্ণবণিক্-কুল-চূড়ামণি শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর মহাশয়ের মহোৎসবের নিমন্ত্রণপত্র।" উদ্ধারণ দত্ত নামটা শ্রবণমাত্র উদারচেতা মহাপুরুষ ব্যস্তভাবে উঠিয়া অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করতঃ দুইটী হস্ত পাতিলেন। আমিও যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় কম্পিতহস্তে একখানি নিমন্ত্রণপত্র ইঁহার শ্রীহস্তে অর্পণ করিলাম। আহা মরি কি মধুর ভাব! পত্রখানি পাইবামাত্র কম্পিত-কলেবরে একবার মস্তকে একবার

বক্ষে ধারণ করিতে লাগিলেন। অতি প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইলে লোক যেমন কি করিবে, কোথায় রাখিবে কিছুই স্থির করতে না পারিয়া, কিরূপ একটী অনির্ব্বচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ইঁহারও যেন তদ্রূপ হইল। অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারে ইঁহার বিশাল দেহখানি পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। গদগদকণ্ঠে কত গভীর প্রীতি—কত প্রগাঢ় ভালবাসা-মিশ্রিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"বাবা! তুমি আজ আমা হেন নরাধমকে কি অপূর্ব্ব স্মৃতি জাগাইয়া দিলে! কি অমূল্য বস্তু প্রদান করিলে! এস বাবা!" বলিয়া ইঁহার সেই প্রীতি-ভালবাসার স্মৃতিসূচক পত্রবাহক এ অধমকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক দৃঢ় আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। অহো! কি স্নিগ্ধ সুকোমল বক্ষ! কি সুশীতল সংস্পর্শ। কি অনির্ব্বচনীয় ভাব! কি অহৈতুকী কৃপা! কি অমূল্য প্রতিদান! এই কলিকাতা শহরে কত ধনী, মানী, কুলীন, পণ্ডিত, গৃহস্থ, বিরক্ত, ভক্তি-প্রচারক, নামডাক সম্পন্ন ভক্ত, আচার্য্য-সন্তান, ব্রাহ্মণ-সন্তানগণকে ত এই নিমন্ত্রণপত্র প্রদান করিয়াছি, কই কেহই ত শ্রী নিত্যানন্দের প্রিয় পরিকর দত্ত ঠাকুরের মহোৎসবের নিমন্ত্রণপত্র গ্রহণে এরূপ প্রাণভরা প্রীতি, হৃদয়ভরা আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই, কিংবা নিমন্ত্রণ-পত্রবাহককে এইরূপ অনুগৃহীত করেন নাই! মহাত্মাদিগের সকলই কি মহৎ? ইঁহার সম্বন্ধে ভক্তগণের মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম বা প্রথম দর্শনে যাহা অনুমান করিয়াছিলাম, ব্যবহারে তাহা আরও দৃঢ়ীভূত হইল। মহাপুরুষের প্রেমালিঙ্গনপ্রাপ্তিমাত্র আমি যেন আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া গেলাম। আমার পাষাণ হৃদয় দ্রব হইয়া গেল—নয়নদ্বারে অবিরত ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। আমি যেন মহাত্মার হৃদয়ে লীন হইয়া যাইতে লাগিলাম। সে যে কি অপ্রাকৃত স্পর্শসুখ, তাহা লেখনীমুখে ব্যক্ত করিবার সামর্থ্য আমার নাই। যাঁহারা ইঁহার কৃপায় এ সুখের

আস্বাদন পাইয়াছেন, তাঁহারাই যৎকিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারিবেন।

ক্ষণকাল পরে আমি ইঁহার সুশীতল বক্ষ হইতে বিচ্যুত হইয়া শ্রীচরণ-তলে পতিত হইয়া চরণরজ গ্রহণে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলাম, ইঁনিও মৃদু-মধুর-হাসিমাখা সুধাবিনিন্দিতকণ্ঠে—"বাবা! নিতাই এর ইচ্ছায় আমি যাইব" বলিয়া পূর্ব্ববৎ আসন গ্রহণ করিলেন। আমি পুনর্ব্বার প্রণাম করতঃ কুঞ্জবাবুকে নিমন্ত্রণপত্র প্রদানপূর্ব্বক উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর সমুৎসুক নয়নপথ হইতে দূরে অপসৃত হইলাম। আজ আমার নিমন্ত্রণ করা সার্থক হইল। হৃদয় যেন কত উৎসাহে—কত আনন্দে ভরিয়া গেল। আমার গতিই যেন কেমন এক প্রকার হইয়া গিয়াছে। গরবে যেন হৃদয় উছলিয়া উঠিতেছে। সেই সময় কেহ যদি আমাকে লক্ষ্য করিত তাহা হইলে সে নিশ্চয় বলিত যে—গরবে অভিমানে আমার পা যেন মাটিতে পড়িতেছে না। কোন দিকে লক্ষ্য নাই। অন্তরের অন্তর প্রদেশে সেই উজ্জ্বল শ্যামবপু পদ্মপলাশলোচন, আজানু-লম্বিত-ভুজ; অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক-ভূষণে বিভূষিত, সহাস্যবদন মহাপুরুষের করুণামাখা প্রেমময় চর চর মূরতিখানি রাখিয়া যথার্থই যেন আমি নিজেকে কেমন এক প্রকার মনে করিতেছি। ধরাখানিকে আমার যেন সরা জ্ঞান হইতে লাগিল। কর্ত্তব্যের অনুরোধে মাত্র অন্য কয়েকটি স্থানে নিমন্ত্রণ করিলাম; কিন্তু মনপ্রাণ সেই মহাত্মার নিকটেই রহিল। চোখের উপর যেন মহাত্মার সেই ভুবন-ভুলান মূরতিখানি, সেই অলোক-সামান্য ব্যবহারগুলি, সেই অযাচিত কৃপাপ্রবাহ সকল খেলা করিতে লাগিল। সুধাবিনিন্দিত-কণ্ঠের সেই "আমি যাইব" কথাটি যেন থেকে থেকে আমার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতেছে। কতক্ষণে সেই শুভমুহূর্ত্ত আসিবে, কতক্ষণে আবার সেই ভাবে গর গর অশ্রু-কম্প-পুলকাদি

পরিব্যাপ্ত-কলেবর মহাত্মার দর্শন ভাগ্যে ঘটিবে, এই সমস্ত বিষয়ের সংকল্প বিকল্প লইয়াই মন উদ্‌ব্যস্ত হইতে লাগিল। আবার নিশ্চয় দর্শন পাইব এই আশায় বুক বাঁধিয়া সপ্তগ্রামে গমন করিলাম।

৮ই পৌষ উৎসব আরম্ভ হইল। কলিকাতা, হুগলী প্রভৃতি নানাস্থান হইতে অনেক ভক্ত বণিক্‌সন্তানগণ তৎসঙ্গে নিতাই-গৌরগতপ্রাণ অন্যান্য বহু ভক্তগণ শুভাগমন করিতে লাগিলেন। নানারূপ ভাবের কথা, গান, বক্তৃতা প্রভৃতি হইতে লাগিল। আমার মন কিন্তু কেবল সেই বাবাজী মহাশয়কেই খুঁজিতেছে, তাঁহারই শুভাগমন কাল প্রতীক্ষা করিতেছে। ৯ই পৌষ রবিবার হঠাৎ দেখি, কয়েকজন পরিকর সঙ্গে লইয়া বাবাজী মহাশয় সপ্তগ্রামে পদার্পণ করিলেন। দর্শনমাত্র আমি ত কেমন একপ্রকার হইয়া গেলাম। আস্তেব্যস্তে পার্শ্বস্থ কয়েকজনকে বলিয়া ফেলিলাম—"ঐ যে ভাই! আমাদের বাবাজী মহাশয় আসিয়াছেন, চল দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে!" তাহারা সকলেই বিশেষ আগ্রহসহকারে আমার সহিত কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া ইঁহাকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। আমি আর অপেক্ষা না করিয়া একেবারে গিয়া শ্রীচরণে মস্তক অর্পণ করিলাম। ইঁনিও ইঁহার সেই অসাধারণ অপ্রাকৃত প্রেমময় ব্যবহারে সকলকে মোহিত করিয়া উপবেশন করিলেন। জনৈক সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে, শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহাশয় প্রভৃতি কয়েক মূর্ত্তি কুলিয়া হইতে ষ্টেশনে ইঁহাদের সহিত মিলিবার কথা ছিল; কিন্তু কি কারণে যেন তাঁহারা আসিয়া পৌছিতে পারেন নাই।

ক্ষণকাল পরে বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন ধরিলেন। পদটী যদিও আমার মনে নাই, কিন্তু পদের ভাবটী হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। সর্ব্ব প্রথমেই ধরিলেন—"নিতাই আমার করুণাবারিধি। অমিয়া মথিয়া

নিরমিল কোন বিধি॥ নিতাইএর করুণার কথা একমুখে কি আর বলিব—"লাখে লাখে হয় মুখ, তবে সে মনের স্থখ, নিতাইচাঁদের গুণ গাই!" এই সপ্তগ্রাম যাঁহার করুণার অবিনাশী একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ। আহা মরি! যাঁহার করুণায় এই অপূর্ব্ব মাধবীলতামণ্ডপ বিনাবলম্বনে ছত্রাকারে দণ্ডায়মান হইয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এইরূপ ভাবে অনেকক্ষণ বহু বহু পদ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আজ যেন নিতাইচাঁদের সেই করুণা আবার মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিল। কে বলিবে যে নিত্যলীলা অপ্রকট? বণিক্‌কুল-চূড়ামণি উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের প্রতি করুণাময় নিতাইচাঁদের অহৈতুকী করুণা, অযাচিত কৃপা-সাগর যেন উথলিয়া উঠিল। নিতাইগুণকীর্ত্তনরূপ পবনাঘাতে উত্তাল তরঙ্গমালা যেন দশদিক্ আপ্লুত করিয়া ফেলিল। ভক্তগণের ত কথাই নাই, ঘোর পাষণ্ড, দুর্দ্দণ্ড, ভণ্ড প্রভৃতি যাহারা বাবাজী মহাশয়ের মুখে নিতাইগুণ শুনিতেছে, তাহারাও সেই প্রেমের বন্যায় হাবুডুবু খাইতেছে। অনেকক্ষণ পরে অপরূপ ভঙ্গিতে চরণের উপর চরণ রাখিয়া স্থমধুর নৃত্য করিতে করিতে পদ ধরিলেন—"নিতাই আমার বণিক্‌কুলের দেবা, গুণ গাই আর করি সেবা" নানারূপ আখর সংযোগে অনেকক্ষণ এই পদটী কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আনন্দের আর অবধি নাই। আমাদের শ্রবণ-বিবরে যেন স্থধাবর্ষণ হইতেছে। সকলেই বিভোর! কাহারই যেন বাহ্য স্মৃতি নাই। আমি অনিমেষ নয়নে সেই অনির্ব্বচনীয় নৃত্যভঙ্গি দর্শন করিতেছি, আর আনন্দ-সাগরে ভাসিয়া যাইতেছি। সংকীর্ত্তন-স্থধা-তরঙ্গে শ্রবণ-মন-প্রাণ প্লাবিত করতঃ আমাকে যেন কোন আনন্দময় অপ্রাকৃত রাজ্যে লইয়া গিয়াছে। আমি যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় একস্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছি। হঠাৎ করুণাময় বাবাজী মহাশয় নাচিতে নাচিতে আমার নিকটে আগমনপূর্ব্বক এ অধমকে দৃঢ়

আলিঙ্গন করতঃ নাচিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। কি আশ্চর্য্য! আমিও যেন যন্ত্রারূঢ় পুতুলের ন্যায় আত্মহারাভাবে নৃত্য করিতে লাগিলাম। নিতাইগুণ-দ্যোতক পদের পর পদ মধুর হইতে সুমধুর সুরে গীত হইতে লাগিল। চারিদিকে যেন প্রেমের উৎস ছুটিতেছে। প্রায় সকলেই প্রেমানন্দে বাবাজী মহাশয়কে ঘিরিয়া অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে নৃত্য করিতেছেন।

আহা মরি কি অপরূপ শোভা! সম্মুখে শ্রীমন্দিরে নিতাই গৌর গদাধর শ্রীমূর্ত্তিত্রয় বিরাজ করিতেছেন, পদতলে দত্তঠাকুরের চিত্রপট যেন করুণার মহাপ্রস্রবণের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন! অপর প্রান্তে নিতাই-করুণার প্রত্যক্ষ চিহ্নস্বরূপ মাধবীলতামণ্ডপ। মধ্যস্থলে বাবাজী মহাশয় চরণে চরণ ছাঁদা নৃত্যাবেশে কীর্ত্তন করিতে করিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতঃ জনসাধারণের নয়ন মন বিমুগ্ধ করিতেছেন। সে এক অভূতপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় অপ্রাকৃত দৃশ্য! যে দেখিল সেই বিমোহিত হইল ও আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতে লাগিল। আহা মরি! নিতাইচাঁদ যেন প্রকট ভাবে বাবাজী মহাশয়রূপে আবির্ভূত হইয়া আপামর সাধারণকে প্রেমসাগরে ভাসাইতেছেন। ধন্য সপ্তগ্রাম! ধন্য বণিককুল! ধন্য নিতাইচাঁদের কৃপা! যাঁহারা এই অপরূপ নৃত্যকীর্ত্তন ও প্রেমময় খেলা দর্শন শ্রবণ করিতেছেন তাঁহারাও ধন্য। আমা হেন নরাধমও এই অপ্রাকৃত আনন্দময় লীলারসের একবিন্দু স্পর্শ করিয়া আজ নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল এইরূপ ভাবে নৃত্যকীর্ত্তনের পর সকলের অনিচ্ছাসত্ত্বেও অন্তর্য্যামী মহাপুরুষ ভক্তগণের শ্রম জানিয়াই যেন কীর্ত্তন সমাপ্ত করিয়া উপবেশন করিলেন। উপস্থিত ভক্তগণ সকলেই নিজ নিজ মনোভাব অনুসারে আজিকার এই মহা প্রেমময় লীলা খেলা স্ব স্ব

ভাষায় বর্ণনা করতঃ ইঁহার মনস্তুষ্টি বিধান করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমাদের সকলের অনুরোধে কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করত মৃদুমধুরবাক্যে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক সঙ্গীগণসহ কলিকাতা যাইবার মানসে ত্রিশবিঘা ষ্টেশনে গমন করিলেন। ট্রেন আসিবার কিছু বিলম্ব থাকা হেতু ষ্টেশনের একপার্শ্বে একটু অপেক্ষা করিতেছেন, এই সময় কলিকাতা হইতে একখানি ট্রেন আসিল। উহাতে শ্রীরামদাস বাবাজী প্রমুখ কয়েকজন মহাত্মা আগমন করিলেন। গাড়ীর মধ্য হইতেই উঁহারা বাবাজী মহাশয়ের দর্শন পাইবা-মাত্র "নিতাই গৌর হরিবোল" ধ্বনিতে দশদিক মুখরিত করিয়া ইঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। ইনিও "জয় নিত্যানন্দ রাম" বলিয়া কম্পাশ্রু-পুলক-পরিব্যাপ্ত শরীরে হস্তভঙ্গীদ্বারা শীঘ্র শীঘ্র শ্রীপাটে গমন করিবার সঙ্কেত করতঃ ট্রেনে উঠিয়া কলিকাতা গমন করিলেন। সপ্তগ্রাম শ্রীপাট সংস্করণ সমিতির তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার দত্ত মহাশয় সমিতির কার্য্যবিবরণীতে নিম্নলিখিত কথা কয়েকটী লিখিয়া নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন—

"৯ই পৌষ রবিবার দিবস বৈষ্ণবচূড়ামণি নীলাচলবাসী শ্রীশ্রীমৎ চরণদাস বাবাজী মহাশয় সপার্ষদে আগমন পুরঃসর তাঁহার অলোক-সাধারণ উচ্চ হরিনাম সংকীর্ত্তন দ্বারা লোকমাত্রকেই মুগ্ধ ও উদ্বেলিত করিয়াছিলেন। সকলেই যেন কি এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সুধাপানে বিভোর হইয়া প্রেমানন্দে দুই বাহু উর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক নৃত্য করিয়াছিলেন। বাবাজী মহাশয়ের অপরূপ নৃত্য-মাধুরী দর্শনে সকলেই নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। ইতি সন ১৩১২ সাল, সপ্তগ্রাম শ্রীপাট সংস্করণ সমিতির কার্য্য-বিবরণী।"

ভক্তগণের বাড়ীতে বাবাজী মহাশয়

এই ঘটনাটি সম্বন্ধে কলিকাতানিবাসী বিহারীদাস বাবাজী (বড় বিহারী দাদা) যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই এইস্থানে উদ্ধৃত করা হইল। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

সন ১৩১২ সালের পৌষ মাস। একদিন অতি প্রত্যূষে আমি নিজ নিত্যকৃত্য শেষ করিয়া বাহিরে বসিয়া আছি, এ সময় একজন লোক আসিয়া বলিল—"বিহারী দাদা! পুরীর বড় বাবাজী মহাশয় গতকল্য উল্টাডিঙ্গি মঠে আসিয়াছেন। শুনিবামাত্র পরমানন্দিতহৃদয়ে ইঁহাকে দর্শন করিতে গমন করিলাম। যাইয়া দেখি কয়েকমূর্ত্তি ভক্ত ইঁহার সম্মুখে বসিয়া নানারূপ প্রশ্ন করিতেছেন, আর ইনি হাসিমুখে তাহার উত্তর দিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে রামদাদার উপর কীর্ত্তন করিবার আদেশ হইল। প্রভাতী কীর্ত্তন হইতে লাগিল ; কিন্তু কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগিতে লাগিল। বেশ জমাট বা আনন্দ হইতেছে না দেখিয়া বাবাজী মহাশয় নিজেই কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অপূর্ব্ব আনন্দ! প্রায় সাড়ে চারিঘণ্টা সময় মাতামাতি কীর্ত্তন হইতে লাগিল। সকলেই বিভোর, কাহারই যেন বাহ্যস্মৃতি নাই। হঠাৎ বাবাজীমহাশয় অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ পরে নানা শুশ্রূষার দ্বারা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া সংকীর্ত্তন সমাপনপূর্ব্ব'ক যথাসময়ে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতঃ কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন।

এইরূপে তিন-চারি-দিন কাটিয়া গেল। একদিন আমি প্রণাম করিবামাত্র আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বিহারী। ঠাকুরসেবা বেশ চলিতেছে ত?" তখন আমি বলিলাম—"আজ্ঞে! আমার ত যুগল মূর্ত্তি নাই, তবে একমূর্ত্তি গোপাল আছেন, উঁহারই সেবা করি।"

বাবাজী। যুগলমূর্ত্তির সেবা করিতে কি তোমার খুব ইচ্ছা হয়?

আমি। আজ্ঞে! ইচ্ছা খুবই হয়, তবে সুবিধামত না পাইলে কি করিব!

অন্তর্য্যামী গুরুদেব তখন গৌরহরিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"গৌরহরি! তোমার নিকট না এক মূর্ত্তি যুগল বেশী আছেন?"

গৌর। আজ্ঞে হঁ্যা।

বাবাজী। সে মূর্ত্তি কাহার?

গৌর। একটী বাবাজী আমাকে দিয়াছিলেন।

বাবাজী। তিনি বোধ হয় আর উঁহাদের লইবেন না।

গৌর। আজ্ঞে না, তিনি আমাকে দিয়াছেন।

বাবাজী। তুমি উঁহার সেবা করিবে বলিয়া রাখিয়াছ?

গৌর। আজ্ঞে না, আমি ঐ যুগল মূর্ত্তি সম্বন্ধে আপনাকে জানাইব মনে করিয়াছিলাম। আপনি অন্তর্য্যামী, সকলই অবগত আছেন। এখন কি করা কর্ত্তব্য আদেশ করুন।

বাবাজী। ঐ যুগল এই বিহারীকে দিয়া দাও সেবা যত্ন করিবে।

গৌরহরি হৃষ্টচিত্তে যুগল আনিয়া আমাকে দিবামাত্র আমি পরমানন্দিতচিত্তে একবার মস্তকে একবার বক্ষে ধারণ করতঃ পরম করুণাময় শ্রীগুরুদেবের কৃপার জয় দিতে লাগিলাম। অন্তর্য্যামী দয়াময় শ্রীগুরুদেবের দয়ায় আজ আমার মনের বাসনা পূর্ণ হইল। আমার পরম পদার্থ লাভ হইল। আহা মরি! অযাচিত কৃপাকারী করুণাময়ের কি করুণা! কৃপাদত্ত যুগল মূর্ত্তির উপরে যতই নয়ন পতিত হইতেছে ততই যেন আমার নয়ন মন-প্রাণ মুগ্ধ হইয়া যাইতেছে। মূর্ত্তিদ্বয়কে আমার আর শ্রীমূর্ত্তি বলিয়া মনে হইতেছে না, যেন শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সাক্ষাৎ বিগ্রহ লাভ করিয়াছি। যেন প্রেমময় প্রেমময়ী ইঁহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এ অধমের কুটীরে গমন করিতেছেন!

আর অধিকক্ষণ আমার সে স্থানে থাকা হইল না? ইঁহার আদেশক্রমে যুগল মূর্ত্তি বক্ষে ধারণ করিয়া চাঁপাতলা আমার নিজ বাড়ীতে আসিলাম। আনন্দ আর ধরে না, কোথায় রাখিব, কি দিয়া সেবা করিব, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না। শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে আমার বাটীস্থ সকলেই পরমানন্দিত। যথাসাধ্য সেবা চলিতে লাগিল। ৯ই পৌষ রবিবার ত্রয়োদশীর দিন বাবাজী মহাশয় শ্রীশ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পাট সপ্তগ্রাম গমন করিলেন। আমরা কয়েকজনও ইঁহার সঙ্গে গমন করিলাম। সে স্থানে খুব কীর্ত্তনানন্দ হইল। ঐ দিন রাত্রেই সকলকে সঙ্গে লইয়া একেবারে কলুটোলা কুঞ্জবিহারী মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতে গমন করিলাম। ইঁহার আদেশক্রমে আমরা নিজ নিজ বাসায় গমন করতঃ বিশ্রাম করিলাম।

পরদিবস অর্থাৎ চতুর্দ্দশীর দিন অপরাহ্ণ সময় বহুবাজার শ্রীনাথদাসের লেন শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতে গমন করেন। মাণিক দাদা একটী অষ্ট প্রহর নাম সংকীর্ত্তন করিবার জন্য প্রস্তাব করায় ইনি হৃষ্টচিত্তে ঐ দিনই সন্ধ্যার সময় অধিবাস করিয়া পরদিবস অষ্টপ্রহর নাম আরম্ভ করিলেন। প্রাতঃকাল হইতেই নামে বিশেষরূপ আনন্দ হইতে লাগিল। অপরাহ্ণ সময় দর্জ্জিপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় আসিয়া তাঁহার বাড়ীতে বাবাজী মহাশয়কে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলে ইনি ভক্তের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা উঁহার সহিত গমন করিলেন। অমৃতবাবুর বিশেষ আগ্রহে আমরাও কয়েকজন ঐ সঙ্গে গমন করিলাম। আনন্দময় বাবাজী মহাশয় যখন যে স্থানে পদার্পণ করেন, সেই স্থানেই যেন আনন্দের পাথার বহিয়া যাইতে থাকে। যাইবার সময় হাতে তালি

দিয়া নাম করিতে করিতে যাইতেছেন, তাহাতেই যেন কত আনন্দ। অমৃতবাবুর বাড়ী গিয়া কিঞ্চিৎ শীতলি ভোগের মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক আবার মাণিক দাদার বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মানিকদাদা অনেক ভদ্রলোককে আহ্বান করিয়াছেন। প্রায় সকলেই বিশেষ ভক্তি-ভাবান্বিত; সুতরাং পরমানন্দিত হৃদয়ে নামে যোগ দিতে লাগিলেন। আনন্দের উৎস ছুটিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর বাবাজী মহাশয় নামের সহিত আরতি কীর্ত্তন এবং নিতাইগৌর-গুণ-সম্বলিত নানা পদ গান করিতে লাগিলেন। আনন্দের আর অবধি নাই। রাত্র প্রায় দশটা পর্য্যন্ত এইরূপ ভাবে কীর্ত্তন করিয়া ইনি একটু অবকাশ নিলেন, নাম চলিতে লাগিল। পরদিবস সাতটার সময় নাম শেষ করিয়া নগর কীর্ত্তনে বাহির হইয়া অনেক স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক যথাসময়ে বাসায় আসিয়া কীর্ত্তন সম্পূর্ণ করিলেন।

কীর্ত্তনান্তে ইঁনি দোতলার উপর বসিয়া আছেন, অনেক ভক্তবৃন্দ চারিদিকে বসিয়া নানারূপ ভগবৎ-প্রসঙ্গ করিতেছেন, এই সময় অনাথ দাদা, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়কে ধরিয়া সেইস্থানে উপস্থিত করাইলেন। গিরিশবাবুর শরীর অতিশয় খারাপ দেখিয়া বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"উঁহাকে এত কষ্ট করিয়া লইয়া আসিলে কেন ?'

অনাথ। আজ্ঞে! আপনার চরণ দর্শন করিবার জন্য উঁহার বড়ই অভিলাষ, তাই এ স্থানে উঁনি নিজে ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছেন।

বাবাজী। উঁহার কি অসুখ ?

অনাথ। আজ্ঞে! ব্যাধি অনেক প্রকার, তবে তাহার প্রধান ব্যাধি বহুমূত্র ও তৎসঙ্গে মধ্যে মধ্যে রক্তস্রাবও হইয়া থাকে।

বাবাজী। ডাক্তার-কবিরাজ দেখান হইতেছে ত ?

অনাথ। অনেক রকম ভাবের চিকিৎসা করান হইয়াছে, কিছুতেই

কোন ফল হইল না। এখন ইঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে আপনি দয়া করিলেই ইনি এই বিষম যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন।

বাবাজী। আমি ত ডাক্তার কবিরাজ নই বা কোন ওঝা ও বৈদ্য নই। আমার কাছে কেন?

এই কথা শ্রবণমাত্র গিরিশবাবু কাঁদিতে কাঁদিতে ইঁহার শ্রীচরণ ধারণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—"বাবা! আমি বড়ই বিপন্ন হইয়া আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। আপনি আমাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন আমার কোন আপত্তি নাই। আমি জীবনে মরণে আপনার শ্রীচরণ সম্বল করিয়াছি। আমার গতি করিতেই হইবে। আমার আর যন্ত্রণা সহ্য হইতেছে না! আপনি কৃপা করিয়া আমার দেহরোগ, ভবরোগ উভয়ই মুক্ত করুন।"

বাবাজী। বাবা! ভবরোগ-বিনাশকারী একমাত্র শ্রীগুরুদেব; তাঁহাকে জানাও, তাঁহার চরণাশ্রয় গ্রহণ কর, অভীষ্ট পূরণ হইবে।

গিরিশ। আজ্ঞে! আপনি আমার গুরু, ইষ্ট, পিতা, মাতা ও আশ্রয়দাতা, আমি আপনা ভিন্ন আর কিছুই জানি না।

গিরিশ বাবুর তাৎকালিক অবস্থা দর্শনে ও কাতর আত্মনিবেদন শ্রবণে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সকলেরই হৃদয় দ্রব হইয়া গেল। সকলেরই প্রাণে যেন কেমন একরূপ ভাবোদয় হইল, সকলেই যেন গিরিশ বাবুর হইয়া কেহ বা মনে মনে কেহ বা প্রকাশ্যে বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ইনি কিন্তু যেন কেমন একরূপ তটস্থ অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন, ভাল মন্দ কোন কিছু বলিতেছেন না, আনমনা ভাবে কি যেন অন্য কোন বিষয় চিন্তা করিতেছেন। এমন সময় হঠাৎ মাণিক দাদার গুরুদেব শ্রীল শ্রীপাদ সৌরেন্দ্রমোহন গোস্বামী প্রভু আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র বাবাজী মহাশয় সসম্ভ্রমে

উঠিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ বসিতে আসন দেওয়াইলেন। প্রভুপাদ উপবেশন করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনি কবে আসিয়াছেন?”

বাবাজী। আজ্ঞে! গত পরশ্ব বৈকালে আসিয়াছি। ঐ দিন সন্ধ্যার পর অধিবাস হইয়া গতকল্য অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্ত্তন এবং অদ্য কীর্ত্তন শেষ হইল।

প্রভু। আচ্ছা, এত আনন্দ হইয়া গেল, মাণিকের কি আমাদিগকে একটু সংবাদ দেওয়া উচিৎ ছিল না? তোমরা একজনে মাণিককে ডাক ত।

বাবাজী। আজ্ঞে! হঠাৎ কার্য্য হইয়া গেল বলিয়া বোধ হয় সংবাদ দিতে পারে নাই। সেজন্য আপনি রাগ করিলে উহারা যায় কোথায়?

প্রভু। অন্য কোন বিষয়ে আমাকে সংবাদ দেয় নাই বলিয়া না হয় আমি কিছু না বলিলাম; কিন্তু আপনার মধুর কীর্ত্তন শুনা ত আর আমার হইল না, এ দুঃখের ভাগী কে হইবে? এটা কি মাণিকের বিশেষ অন্যায় নয়?

বাবাজী। প্রভু! এ দাস ত আপনাদেরই শ্রীচরণাশ্রিত। আপনারাই হৃদয়ে উদয় হইয়া জিহ্বায় যাহা উচ্চারণ করান, তাহা ছাড়া স্বতন্ত্রভাবে ত একটী বর্ণও উচ্চারণ করিবার শক্তি এ পুতুলের নাই। আপনারা যদি এ যন্ত্র হইতে কিছু শুনিয়া সুখী হন, যন্ত্রের সৌভাগ্য এবং তাহার আবার সময় অসময় কি? এখনই হউক।

ইতিপূর্ব্বেই ইনি স্নান করিতে যাইবেন বলিয়া তৈল মাখা হইয়াছিল, ঐ অবস্থাতেই কীর্ত্তন ধরিলেন, সুতরাং যে যে-স্থানে যে-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, সে সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক খোল করতাল সহ আসিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিতে লাগিলেন। খুব মাতামাতি কীর্ত্তন হইতে লাগিল। কাহারই

যেন বাহ্যস্মৃতি নাই। সকলেই ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতেছেন, আর উচ্চৈঃস্বরে প্রাণ খুলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। বাবাজী মহাশয় চরণে চরণ রাখিয়া সুমধুর নৃত্য করিতেছেন, আর নিজ মন হইতে স্ফুরিত পদাবলী কীর্ত্তন করিতেছেন। সে যেন অনির্ব্বচনীয় অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ। ইঁহার নয়ন দুইটি মুদ্রিত দেখিলে বোধ হয় যেন ইনি ভাব-সাগরের কোন অতল তলে ডুবিয়া গিয়াছেন। ক্ষণে ক্ষণে কত কত তরঙ্গ খেলিতেছে' আর প্রেমের হিল্লোলে হেলিয়া দুলিয়া নানারূপ ভঙ্গীতে পদ পদাবলী নির্গত হইয়া শ্রোতৃবর্গের হৃদয় ক্ষেত্র প্লাবিত করিতেছে। অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারগণ যেন ইঁহার অঙ্গের ভূষণ হইয়াছে। সে যে কি দৃশ্য, কি আনন্দ, কিরূপ মন প্রাণ মাতান কণ্ঠ, কি অশ্রুতপূর্ব্ব পদাবলী তাহা বর্ণনার ভাষা নাই—তুলনার প্রাত্র নাই। তবে যে সমস্ত ভাগ্যবান্‌গণ সেই মহান্ আনন্দময় ব্যাপারে ব্যাপৃত বা সংশ্লিষ্ট ছিলেন, অথবা দর্শন শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা হয় ত নিজ নিজ হৃদয়ের ভাবানুসারে যৎকিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারিবেন।

খুব কীর্ত্তন হইতেছে; জানি না ইঁহার মনে কি খেয়াল উদয় হইল—হঠাৎ গিরিশবাবুর নিকটে গমনপূর্ব্বক উঁহাকে সংকীর্ত্তনের মধ্যে শয়ন করাইয়া উঁহার উপর উঠিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠিক ফুটবল খেলার ন্যায় চরণ দিয়া উঁহাকে গৃহের এপাশ হইতে ওপাশ পর্য্যন্ত গড়াইতে লাগিলেন।

অনাথ দাদা প্রভৃতি যাঁহারা গিরিশবাবুর শারীরিক দুর্ব্বলতা অবগত আছেন, তাঁহারা উপস্থিত ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। কেহ বা মনে করিতে লাগিলেন—এই অবস্থায় উঁহার না জানি কি হয়; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কীর্ত্তন সমাপ্ত করিয়া বাবাজী মহাশয় যেমন বলিলেন—"গিরিশ! উঠ, প্রভুপাদকে প্রণাম

কর। ইঁহাদের কৃপায়ই তোমার অসাধ্য ব্যাধি দূরে গেল, আজ হইতে তুমি নীরোগ; অমনি গিরীশ বাবু সুস্থ শরীরে সকলকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিলেন। সকলে দেখিয়া শুনিয়া অবাক্। এদিকে মাণিক দাদা প্রভৃতি ভক্তগণের অনুরোধে ও প্রভুপাদের আজ্ঞায় ইনি স্নানাদি কৃত্য সমাপন পূর্ব্বক পরমানন্দে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতঃ কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন।

এদিকে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দুঃখী কাঙ্গালী সেবা হইতে লাগিল। মহা হুলস্থূল ব্যাপার। ভক্তিপ্রবণহৃদয় মাণিকদাদার ব্যবহারে আপামর সাধারণ ইতর ভদ্র সকলেই বিশেষ আনন্দচিত্তে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতঃ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

প্রভুপাদ বাবাজী মহাশয়ের শ্রীমুখের অপূর্ব্ব কীর্ত্তন শুনিয়া এবং মাণিক দাদার ভক্তির প্রভাবে সন্তোষ লাভ করতঃ যথোপযুক্ত সেবা গ্রহণপূর্ব্বক যথাসময়ে নিজালয়ে গমন করিলেন। ইঁহারা সেইদিন মাণিক দাদার বাড়ীতে থাকিয়া পরদিন বৈকাল বেলা নেড়াগির্জ্জা নিবাসী শ্রীযুক্ত নব গোপাল দের বিশেষ আগ্রহে তাহাদের বাড়ী গমন পূর্ব্বক সে রাত্র তথায় অবস্থান করেন। পর দিবস (অর্থাৎ তৃতীয়ার দিন) পটলডাঙ্গা নিবাসী বাবু মণিলাল দাস প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের বিশেষ অনুরোধে প্রাতঃ কৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্ব‍ক বেলা অনুমান দশটার সময় উঁহাদের বাড়ী গমন করেন। মণি বাবুরা পাঁচটি ভাই যেন এক প্রাণ। উঁহাদিগকে বাবাজী মহাশয় পঞ্চ পাণ্ডব বলিয়া ডাকেন এবং অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখেন। সেদিন উঁহাদের বাড়ীতে থাকা হইল। ইঁহার সঙ্গে অনেক লোক। এ ছাড়া ইঁহার নাম শ্রবণে দর্শনার্থ যাঁহারা আগমন করেন, তাঁহাদেরও কাহারই ইঁহার মধুময় সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার ইচ্ছা হয় না; সুতরাং ইনি যেদিন

যে স্থানে শুভ বিজয় করেন, সেদিন সে স্থানে খুব ধুমধাম ব্যাপার হইয়া থাকে। যে ভক্তের বাড়ীতে এইরূপ আনন্দময় ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়, তিনিও নিজেকে কৃতার্থ মনে করতঃ বিশেষ আগ্রহের সহিত উৎসব সম্পন্ন করিয়া থাকেন। সেদিন মণি বাবুদের বাড়ীতে থাকিয়া পরদিবস (চতুর্থীর দিন) প্রাতে গণসহ চাঁপাতলা রামকান্ত মিস্ত্রির লেনে এ অধমের কুটিরে শুভাগমন পূর্ব্বক অকিঞ্চনের বহুদিনের আশা পূর্ণ করিলেন। ঐ দিন অনেকেই মন্ত্র গ্রহণ করেন।

বেলা অনুমান তিনটার সময় চূনাপুকুর নিবাসী বাবু জহর লাল বসু, তাঁহার নিজ বাটিতে ইঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলে অপরাহ্ণ সময় উঁহার বাটি গমন করেন। ভক্তগণের অনুরোধে ঐ দিনই জহর বাবুর বাড়ীতে ইঁহার ফটো তোলা হয়। সে রাত্র তথায় থাকিয়া পরমানন্দে নাম কীর্ত্তনাদি করেন। পরদিন (পঞ্চমীর দিন) প্রাতে শাঁখারীটোলা নিবাসী বিহারীদাস (ছোট) ও গোবর্দ্ধন দাসের বাড়ী গমন করেন এবং তথায় পরমানন্দে ইঁনি নিজ হাতে ঠাকুরের ভোগ দিয়া বাল্য ভোগ মহাপ্রসাদ পাইয়া মধ্যাহ্নে তালতলা নিবাসী নন্দকিশোর ঘোষের বাড়ী হইয়া বাবু ধর্ম্মদাস দত্ত মহাশয়ের বাড়ী গমন করেন। দুইদিন (পঞ্চমী ও ষষ্ঠীর দিন) সে স্থানে বাস করিয়া সপ্তমীর দিন সন্ধ্যাকালে কাহাকেও কিছু না বলিয়া কেবল মাত্র পুলিন দাদাকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় চাঁপাতলা অধমের কুটীরে শুভাগমন করেন। প্রভুর ইচ্ছায় ঐদিন আমার স্ত্রী ও অন্যান্য সকলেই শ্যামপুকুর আমার শ্বশুরালয়ে গমন করিয়াছে। ইনি বাড়ীতে কাহাকেও না দেখিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিহারী। তোমার বাড়ীর মেয়েরা কোথায়?"

আমি। আজ্ঞে তাহারা সকলে আমার শ্বশুর বাড়ী গিয়াছে।

বাবাজী। বেশ, ভালই হইয়াছে! তুমি আগামী কল্য প্রাতে তোমার ভাগিনেয় ফকির দাসকে দিয়া তাহাদিগকে সংবাদ দিবে যে— যে কয়দিন আমি এ স্থানে থাকিব, সে কয়দিন যেন তাহারা এ স্থানে না আসে। কারণ আমার কয়েকদিন একটু নির্জ্জনে বাস করিতে ইচ্ছা হইয়াছে।

আমি। আজ্ঞে! এ ত আমার পরম সৌভাগ্য। আমি কল্য প্রাতেই তাহাদিগকে বারণ করিয়া পাঠাইব।

আমার কথা শুনিয়া ইনি যেন বিশেষ আনন্দ পাইলেন। রাত্রে কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক শয়ন করিলে আমি চরণসেবা করিতেছি, এই সময় বাহিরে একটু গোলমাল শুনিয়া আমি ধীরে ধীরে আসিয়া দেখি যে রামদাদা, গোবিন্দ দাদা ও ফণী প্রভৃতি চারি পাঁচজন অতিশয় ব্যস্ত সমস্ত ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। হঠাৎ আমাকে দেখিবামাত্র গোবিন্দ দাদা বলিলেন—"ভাই! বাবাজী মহাশয় তোমার বাড়ী আসিয়াছেন কি?"

আমি। দাদা! আপনারা এত ব্যস্ত হইয়াছেন কেন বলুন দেখি?

গোবিন্দ। ভাই! কি আর বলিব! সন্ধ্যার সময় তিনি আমাদিগকে না বলিয়া কোথায় বাহির হইয়াছেন। বহু স্থানে অনুসন্ধান করিয়া কোথাও কিছু খোঁজ পাই নাই। অবশেষে তোমার বাড়ী খোঁজ করিতে আসিলাম।

আমি উহাদের প্রাণের তৎকালীন অবস্থা দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। আহামরি! শ্রীগুরুদেবে এ জাতীয় ভালবাসা ত আমি অন্যত্র দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। আমি যেমন বলিলাম—"বাবাজী মহাশয় মহাপ্রসাদ পাইয়া শয়ন করিয়াছেন," অমনি সকলের মুখে হাসি আর ধরে না। যেন কতকালের হারান ধন পাইলেন। সকল উৎকণ্ঠা—

সকল আর্ত্তি মিটিয়া গেল। তখন সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"ভাই! বড়ই ক্ষুধা হইয়াছে, কিছু খাবার আছে?"

আমি বলিলাম, "ঐ ঘরে বাবাজী মহাশয় সেবা করিয়াছেন, দেখ, অধরামৃত আছে," শুনিয়া সকলে পরমানন্দে অধরামৃত মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া বৈঠকখানা ঘরে শয়ন করিলেন।

পরদিবস (অষ্টমীর দিন) প্রাতে ইঁহার সঙ্গীগণের মধ্যে আরও অনেকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আনন্দের আর সীমা নাই। অধমের কুটীর যেন সাক্ষাৎ আনন্দ নিকেতন হইল। বহু বহু ভক্তবৃন্দ আসিয়া নানারূপ তত্ত্ব কথা প্রসঙ্গ করিতেছেন। রাত্রে নামকীর্ত্তন হইতে লাগিল। নবমীর দিনে চূণাগলি নিবাসী ননীলাল দে এবং শরৎচন্দ্র দত্তের বিশেষ আগ্রহে তাঁহাদের বাড়ীতে মধ্যাহ্নে নাম কীর্ত্তনাদি করিয়া মহাসমারোহে মহাপ্রসাদ গ্রহণ পূর্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে সন্ধ্যার সময় পুনরায় আমার বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

একদিন ইনি হঠাৎ আমাকে বলিলেন—"বিহারী! কাগজ কলম দাও ত।" আমি আদেশ পাইবামাত্র কাগজ, কালী, কলম আনিয়া দিলাম। তখন একটি বৃহৎ তালিকা করতঃ পুলিন দাদা এবং আমার হাতে দিয়া বলিলেন—'দেখ, এই সমস্ত দ্রব্য আজই আনিতে হইবে; সুতরাং তোমরা এখনই বড় বাজার গমন কর।" তালিকাটি পড়িয়া দেখি, উহাতে দারুচিনি, লবঙ্গ, ছোট এলাচ, বড় এলাচ, কাবাব চিনি প্রভৃতির আরক, রিফাইন করা রেড়ির তেল প্রভৃতি বহু দ্রব্যের নাম লেখা হইয়াছে। কিন্তু কি জন্য যে এ সমস্ত আনাইতেছেন ইঁনিই জানেন। যথাসময়ে সমস্ত দ্রব্য আনা হইলে ইঁনি নিজ হাতে ঐ সমস্ত জিনিসের কিছু কিছু অংশ একত্র করিয়া একটি তৈল প্রস্তুত করিলেন। তৈলটির নাম দিলেন "নিত্যানন্দ-নির্য্যাস-তৈল।" যাহার যে কোনও প্রকার ব্যাধি

হইলেই ঐ নিত্যানন্দ-নির্য্যাস তৈল মালিশ এবং কিঞ্চিৎ খাইবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। জানি না বস্তুর গুণে কি মহাপুরুষের শক্তি প্রভাবে অতি কঠিন ব্যাধিও উহাতে আরোগ্য হইতে লাগিল।

একদিন রাত্রে আমার বাহিরের ঘরে বসিয়া পুলিন দাদাকে বলিলেন—"দেখ পুলিন! নিতাই-এর ইচ্ছায় নিত্যানন্দ-নির্য্যাস নামে যে তৈলটি প্রস্তুত হইয়াছে, এইটি এক প্রকার সর্ব্বব্যাধি-বিনাশক। বহু লোকের বিশেষ উপকার হইবে, এটি তোমাকে দিলাম এবং প্রস্তুত-প্রণালীও শিখাইয়া দিতেছি। তুমি এই তৈল প্রস্তুত করতঃ সাধারণকে দান করিবে।" পুলিন দাদা বলিলেন, "আচ্ছা সম্প্রতি বিহারীদাদার এইখানেই থাক, পরে আমি ব্যবস্থা করিব।" বাবাজী মহাশয় আমাকে বলিলেন—"বিহারী! এই তৈল এবং প্রস্তুত করিবার দ্রব্যগুলিকে তোমার কাছে রাখ, পুলিন যখন চাহিবে দিও।" তাহাই হইল, আমি ঐ সমস্ত অতি যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া দিলাম।

একদিন পুলিন দাদা কথা প্রসঙ্গে "নবদ্বীপে নসি বাবুর বাগানবাড়ী খরিদ সম্বন্ধে বাবাজী মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহ" এই কথাটি মানিক দাদার নিকট প্রস্তাব করেন। দশমীর দিন রাত্রে মানিক দাদা আমার বাড়ী আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন—"আজ্ঞে! আমি নবদ্বীপ বাগান বাড়ী খরিদের জন্য কিছু টাকা আনিয়াছি।"

বাবাজী। কত টাকা?

মানিক। আজ্ঞে! তিন হাজার টাকা আনিয়াছি, বাকি যাহা প্রয়োজন হইবে আমিই দিব। আপনার কৃপায় বাগানবাড়ী খরিদের জন্য আর অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না।

বাবাজী। নিতাই-এর ইচ্ছায় ভালই। দেখ পুলিন। এই টাকাটা

নাও ত। বাগানটি মানিকের নামে খরিদ হইবে। লেখাপড়ার জন্য পিতার নাম প্রভৃতি যাহা যাহা প্রয়োজন লিখিয়া রাখ।

মাণিক। আজ্ঞে! আমার একটি নিবেদন, বাগানে আমার নামের কোনরূপ সংশ্রব থাকিবে না। আপনার অন্য যে কোন নামে ইচ্ছা করিবেন। আমার নাম উহাতে থাকিলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইব।

বাবাজী। কেন, তাহাতে তোমার আপত্তি কি? তোমরা সংসারী সুতরাং বৈষয়িক ব্যাপারে তোমাদের নামে থাকাই ভাল। যাহারা সংসার ত্যাগী তাহাদিগকে ও সমস্ত সংশ্রবে রাখা আমার অভিপ্রেত নহে।

মাণিক। আজ্ঞে! যদি তাহাই আপনার অভিপ্রায় হয়, তবে আপনার অন্য কোন গৃহস্থ শিষ্যের নামে খরিদ করুন। কিন্তু আমাকে ও বিষয়ে মাপ করিবেন। বাগান বাড়ীতে আপনার ইষ্টদেবকে লইয়া বাস করিতে ইচ্ছা হইয়াছে, আপনার সেই ইচ্ছা পূরণ করিবার অভিপ্রায়ে আপনার প্রাণ নিতাই চাঁদ, এ বিষয়ের কীট নরাধমের দ্বারা তাহার যৎ কিঞ্চিৎ আনুকূল্য করিলেন বলিয়া আমি যে ইহার দাতা বা স্বত্বাধিকারী নহি, এ কথা ত আপনি কৃপা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, আবার কেন পরীক্ষা?

মাণিক দাদার মুখে এইরূপ নিঃস্বার্থপরতা ও যথার্থ তত্ত্বানুভূতির কথা শ্রবণ করিয়া বাবাজী মহাশয় পরম আনন্দিত হইলেন।

যথা সময়ে মাণিক দাদা ইঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক নিজালয়ে গমন করিলে ইঁহারা মহাপ্রসাদ পাইয়া শয়ন করিলেন। পর দিবস (একাদশীর দিন) প্রাতে উঠিয়াই আমাকে বলিলেন—"দেখ বিহারী! আমি আগামীকল্য নবদ্বীপ রওনা হইব।" কথাটা শুনিবা মাত্র আমার মন যেন কেমন হইয়া গেল। চোখে জল আসিল—গদগদ কণ্ঠে বলিলাম,

"আজ্ঞে ! আর কয়েকদিন থাকিতে হইবে। যদিও আমি আপনার সেবা যত্নাদি কিছুই করিতে পারিতেছি না, তথাপি এই দরিদ্রের কুটিরে আপনি আছেন বলিয়া অনেক মহাত্মার শুভাগমন হইতেছে। আমার ভাগ্যে এ জাতীয় আনন্দ কি আর হইবে ?"

বাবাজী মহাশয় একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"চিন্তা কি ? আমি ত তোমাদেরই। কত আনন্দ হইবে।" মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় আমি ইঁহার মুখপানে তাকাইয়া রহিলাম। আর কিছু বলিতে পারিলাম না। হরিবাসর নাম কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে অনেক লোকের সমাগম হইতে লাগল। ইনি নবদ্বীপে যাইবেন এই কথাটী যিনি শুনিতেছেন, তিনিই যেন কেমন এক প্রকার হইয়া যাইতেছেন এবং অতিশয় দুঃখিত চিত্তে ইঁহাকে আরও কয়েকদিন থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন।

রাত্রে কীর্ত্তনানন্দ বিশেষ পরিমাণে হইল। কোথা দিয়া যে রাত্রি কাটিয়া গেল কাহারই খেয়াল হইল না। রাত্র প্রভাতে কীর্ত্তন সমাপিত করিয়া স্নানাদি নিত্য কৃত্য শেষ করিয়া মহা প্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক সামান্য সময় একটু বিশ্রামান্তে সঙ্গীগণ সঙ্গে শ্রীধাম নবদ্বীপ রওনা হইলেন। মহাপুরুষের চিত্ত কুসুম হইতেও সুকোমল, আবার বজ্র হইতেও কঠিন ; যত দুঃখ আমাদের। আমি ইঁহার শ্রীচরণে দণ্ডবৎ করিতে গিয়া আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলাম না। একেবারে বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলাম দেখিয়া ইনি আমার পিঠের উপর হাত দিয়া বলিলেন—"অত উতলা কেন বিহারী ! ইহার মধ্যে আমি সংবাদ দিব, শ্রীধাম নবদ্বীপ যাইও।" ইত্যাদি নানারূপ প্রবোধ বাক্যে উপস্থিত সকলকে সান্ত্বনা করতঃ গাড়ীতে উঠিলেন। যথা সময়ে গাড়ী কৃষ্ণনগরে আসিলে সেখান হইতে ঘোড়ার গাড়ী এবং নৌকাযোগে

নবদ্বীপ পৌছিলেন। ইঁহার গুরুদেব (বৃদ্ধ বাবাজী মহারাজ) ভজনে ছিলেন, অবকাশমতে ইনি দণ্ডবৎ প্রণাম করিবামাত্র তিনি আনন্দে ইঁহাকে উঠাইয়া দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। আহা মরি কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! বাৎসল্যের মূর্ত্তি শ্রীগুরুদেব উপযুক্ত শিষ্যকে বক্ষে ধারণ করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, আবার শিষ্যও সিদ্ধ মহাত্মা শ্রীগুরুদেবের স্পর্শে আনন্দাপ্লুতহৃদয়ে অশ্রু-কম্প-পুলকাদি-পরিব্যাপ্ত শরীরে অবিরতধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। বহুক্ষণ এইরূপ পরমানন্দে অতিবাহিত হইলে গুরুশিষ্য উভয়ে উভয়ের কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যথা সময়ে প্রসাদাদি পাওয়া শেষ হইল। হঠাৎ ইনি শুনিলেন যে ইঁহারা কলিকাতা যাইবার পর দিবস রাণাঘাট হইতে একটী ভদ্রলোক মহীতোষ বাবুকে বাগানবাড়ীর দাম পাঁচ হাজার টাকা বলায় মহীতোষ বাবু উত্তর করিয়াছেন—"যখন আমি মহতের নিকট বাক্য দিয়াছি তখন দশহাজার টাকা হইলেও আমি অন্যকে দিতে পারিব না।" কথাটি শুনিয়া ইনি হৃষ্টচিত্তে বলিলেন,—"দেখ, মহদ্বংশোদ্ভব ব্যক্তির হৃদয় এইরূপ মহৎ না হইলে চলিবে কেন? বংশের গুণ কোথায় যাইবে? যাক, পুলিন! আজই যাহাতে বাগান লেখা-পড়া হয় তাহার চেষ্টা কর, আগামী কল্য রেজিষ্টারী করিতে হইবে।" পুলিন দাদা 'যে আজ্ঞে' বলিয়া শ্রীহরি মজুমদার মহাশয়ের নিকট সংবাদ দিলেন। মজুমদার মহাশয় ইঁহার নিকট আসিয়া বাগান খরিদা কবলার মুসাবিদা করতঃ লেখা-পড়া করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীরাধারমণ দেবের নামে দেবোত্তর ভাবে খরিদ হইয়া পুলিনবিহারী মল্লিককে সেবাইত বা মারফতদার করা হইল। যথাসময়ে দলিল রেজিষ্টারী হইয়া গেল। এদিকে বাগান পরিষ্কার ও মেরামতের জন্য বহুলোক লাগান হইল। তিন চারি দিনের মধ্যেই বৈঠকখানা ঘরটি বাসোপযোগী হইল। বাহিরে মেরামতি কার্য্য চলিতে

লাগিল। বাগান বাড়ীটী পাইয়া বাবাজী মহাশয়ের যে কি জাতীয় আনন্দ হইয়াছে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। যদিও বাগানের মধ্যে বসিবার উঠিবার স্থানগুলি সেরূপ পরিষ্কার হয় নাই, তথাপি ইনি প্রায় সময় ঐ বাগানেই থাকেন।

শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেবের শুভ বিজয়

একদিন বাবাজী মহাশয় অতিপ্রত্যূষে সঙ্গীগণের মধ্যে একজনকে ডাকিয়া বলিলেন,—"দেখ, এই মুহূর্ত্তে তুমি সাতগাছিয়া কুঞ্জ গোস্বামীর বাড়ী গিয়া তাহাকে বলিবে যেন সে আজই এস্থানে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করে, আমার বিশেষ প্রয়োজন, যেন অন্যথা না হয়।" শ্রীগুরুদেবের আদেশ পাইবামাত্র সঙ্গীটী ইঁহার শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক অতি দ্রুতগতি রওনা হইলেন। এদিকে কুঞ্জ গোস্বামীর মন শ্রীধাম নবদ্বীপ যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। মদনগোপালের সেবা বা সংসারের কার্য্যাদিতে কোনরূপেই মন লাগাইতে পারিতেছেন না। আহারে ব্যবহারে কেবল শ্রীগুরুদেবের মূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে নানা কথা ভাবিতেছেন, এই সময় নবদ্বীপ হইতে শ্রীগুরুদেবের আদেশবাহী লোক গিয়া ইঁহার আদেশের কথা বলা মাত্র কুঞ্জ গোস্বামী ব্যস্তসমস্তভাবে বলিতে লাগলেন, —"আমি ত ইতিপূর্ব্বেই বুঝিয়াছি যে, শ্রীগুরুদেব এ অধমকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিবার মানসে আকর্ষণ করিয়াছেন। যাক্, তুমি স্নানাদি করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক শীঘ্র চল।" নবাগত ব্যক্তির স্নান-আহ্নিকাদি শেষ হইলে উভয়ে মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক রওনা হইলেন। ঠিক সন্ধ্যার সময় উঁহারা আসিয়া শ্রীধামে পৌছিলেন। বাবাজী মহাশয় কুঞ্জ গোস্বামীকে দেখিবামাত্র ঠিক বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। প্রায় পনের মিনিট পরে কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া,

সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "দেখ কুঞ্জ! তোমাদের ওস্থানে প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয়ের পুরাতন ঠাকুরবাড়ীর জীর্ণ মন্দিরের মধ্যে ঈশানকোণে একটী উইঢিপির মত উচ্চ স্থান আছে। ঐস্থানে মাটির নীচে শ্রীশ্রীরাধাকান্ত নামক একমূর্ত্তি শ্রীবিগ্রহ রহিয়াছেন। অতি সন্তর্পণে প্রথম ঐ বিগ্রহকে উঠাইয়া পরে ঐ মন্দিরের নৈঋর্তকোণে দেখিবে সিন্দুর মাখা দুইটি ছোট পিতলের কলসীর আড়ালে শ্রীরাধারাণী ও একমূর্ত্তি চতুর্ভুজ ছোট নারায়ণ মূর্ত্তি রহিয়াছেন। ঐ দুইটি কলসীসহ ঐ তিন মূর্ত্তি শ্রীবিগ্রহ আগামী কল্য সন্ধ্যার মধ্যে এস্থানে আনা চাই।"

কুঞ্জ। আজ্ঞে! মল্লিক মহাশয়দের বংশাবলী ত কেহই নাই, কেবল একটী মাত্র কন্যা আছেন। উঁহাদের বাড়ীতে নানারূপ ভাবের ঠাকুর-সেবা ছিল বা নামমাত্র এখনও কিছু কিছু আছে। প্রাণকৃষ্ণ বাবু হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামে মুস্তফীদের বাড়ী শ্রীরামদাস মুস্তফীকে কন্যা দান করিয়া তাঁহারই হস্তে সমস্ত বিষয়ের ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। উঁহারা যদি ঠাকুর আনিতে বা মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিতে কোনরূপ আপত্তি করেন?

বাবাজী। সে বিষয়ে তোমাদের কোনই চিন্তা নাই। ঠাকুর যখন নিজে ইচ্ছা করিয়া আসিতেছেন, তখন আর কেহই তাঁহার প্রতিকূল হইবে না যাহাতে সত্বর আসিতে পারেন তুমি সেই চেষ্টা কর।

কুঞ্জ গোস্বামী আর কোন কথা না বলিয়া রাত্র অনুমান চারিটার সময় রওনা হইলেন! যথাসময়ে সাতগাছিয়া পৌছিয়া শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী গোস্বামীকে সঙ্গে করিয়া বাবুদের বাড়ী গমনপূর্ব্বক প্রাণকৃষ্ণ বাবুর কন্যাকে বলিলেন—"মা! আপনার ঠাকুর মন্দিরের মধ্যে একমূর্ত্তি যুগল রাধাকৃষ্ণ মাটির মধ্যে পোঁতা হইয়া রহিয়াছেন। উঁহারা আমার গুরুদেবকে স্বপ্নে বলিয়াছেন—"আমরা মাটির মধ্যে রহিয়াছি,

তুমি আমাদিগকে লইয়া সেবা পূজা কর।” এই আদেশ পাইয়া আমার গুরুদেব আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। এ বিষয়ে আপনার মত কি?”

তিনি যেন একটু ব্যস্তসমস্ত ভাবে বলিলেন—“বাবা! আপনারা এখনই মন্দিরে গিয়া উঁহাদিগকে লইয়া যান, এ বিষয়ে আমার আনন্দ ছাড়া কোনই আপত্তি নাই। তবে কর্ত্তাকে একবার জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হয়” উঁহারা রামবাবুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—“বাবা! সেবা পূজা করার সাধ্য আমার নাই, যদি ঠাকুর এইরূপ নিজেদের বন্দোবস্ত নিজেরা করিয়া লন, তাহাতে আমার আপত্তি করিবার কি আছে? ঠাকুর যখন নিজে আদেশ করিয়াছেন, তখন আপনারা স্বচ্ছন্দে লইয়া যান।” রামবাবুর কথা শুনিয়া বিপিন গোস্বামী ও কুঞ্জ গোস্বামী বিস্মিত ভাবে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন,—“হায় কি দুর্ব্বার ভগবৎ-মায়া! অপার সম্পত্তি কে খাইবে ঠিক নাই, তথাপি একবার চৈতন্য আসিতেছে না! ধন্য মায়াময় তোমার মায়ার শক্তি! যাক, শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছায় আমাদের অভীষ্ট পূরণ হইল” বলিয়া দুইজনে সেই ভগ্নাবশেষ জীর্ণ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করতঃ বাবাজী মহাশয়ের নির্দিষ্ট স্থানের ইট মাটি প্রভৃতি সরাইয়া দেখেন যে উজ্জ্বল শ্যামকান্তি মণিময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উপুড়ভাবে শয়ন করিয়া আছেন! দেখিবামাত্র বিপিন গোস্বামী সাশ্রু-কম্প-পুলকিত অঙ্গে শ্রীমূর্ত্তি উঠাইয়া বুকে ধরিলেন এবং ব্যগ্রভাবে আদিষ্টরূপে নৈঋ‍ত কোণস্থ সিন্দুর মাখা পিতলের কলসী দুইটি ও তাহার পার্শ্বস্থ একটি চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি ও শ্রীমতীজীউকে লইয়া দরিদ্র হারানিধি পাইবার ন্যায় দ্রুতগতি মন্দির হইতে বাহির হইয়া কুঞ্জ গোস্বামীর নিজ বাটীতে আসিলেন! সেই দিনই নবদ্বীপে যাইতে হইবে, মূর্ত্তিত্রয়কে কিঞ্চিৎ পরিষ্কার করিয়া নবদ্বীপ রওনা হইলেন। এদিকে

বাবাজী মহাশয় বিশেষ উৎকণ্ঠিতভাবে এক একবার বাড়ীর বাহিরে রাস্তার উপর গিয়া চকিতের ন্যায় চারিদিক নিরীক্ষণ করতঃ নিরাশপ্রাণে পুনরায় ভিতরে প্রবেশ করিতেছেন। এইরূপ উৎকণ্ঠিতভাবে গমনাগমন করিতে করিতে একবার বাহিরে আসিয়া দূর হইতে যেমন কুঞ্জ গোস্বামী ও বিপিন গোস্বামীকে দেখিতে পাইলেন, অমনি ছুটিয়া গিয়া রাধাগোবিন্দ বিগ্রহদ্বয়কে বুকে ধরিয়া পুলক-কম্পান্বিত-কলেবরে সাশ্রুনয়নে এক একবার উঁহাদের মুখপানে তাকাইতেছেন, আর যুগপৎ হর্ষ শোক হাসি কান্না মিশ্রিত যেন কেমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবসাগরে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছেন। পরম উৎসাহভরে নৃত্য করিতে করিতে আশ্রমে প্রবেশ-পূর্ব্বক গুরুদেবের নিকট গমন করিলেন। তিনি শ্রীমূর্ত্তিদ্বয় দর্শনে পরমাহ্লাদিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“বাবা! এ অমূল্য রত্ন কোথায় পাইলে?”

বাবাজী। আজ্ঞে! সে এক অপূর্ব্ব কাহিনী। গত পরশ্ব শেষ রাত্রে আমি শয়নে আছি, এই সময় দেখি এই বিগ্রহদ্বয় আমার নিকটে আসিয়া আমাকে বলিতেছেন—“দেখ, আমরা বড়ই কষ্টে আছি; আমাদিগকে তোমায় উদ্ধার করিতে হইবে।” উঁহাদের কাতর কণ্ঠের সেই সুধা-বিনিন্দিত মধুরধ্বনি শ্রবণে আমি যেন একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলাম। এমন কি ইঁহাদের উপর কোনরূপ ভগবদ্ভাব পর্য্যন্ত আনিতে না পারিয়া বিহ্বল ভাবে বলিয়া উঠিলাম—“তোমরা কোথায় আছ?” ইঁহারা বলিলেন—“আমরা সাতগাছিয়া প্রাণকৃষ্ণ মল্লিকের বাড়ীতে মন্দিরের মধ্যে মাটি চাপা পড়িয়া আছি।” আমি একটু বিস্মিত ভাবে বলিলাম—“তোমরা মন্দিরের মধ্যে কোন্ স্থানে আছ, আমি কিরূপে জানিব? আবার সে বড়লোকের ঠাকুর-বাড়ী, যদি প্রবেশ করিতে বা তোমাদিগকে আনিতে না দেয়?” বিগ্রহদ্বয়ের মধ্যে কৃষ্ণমূর্ত্তি বলিলেন—“মন্দিরের মধ্যে ঈশান কোণে কতকগুলি ইট মাটি

পড়িয়া আছে, আমি তাহার নীচে আছি এবং শ্রীমতীজীউ ও একটী চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি, মন্দিরের নৈর্ঋত কোণে দুইটী সিন্দুর মাখা পিতলের কলসীর আড়ালে আছে। কোনই চিন্তা নাই, আমাদিগকে আনিবার জন্য তাহারা কোন আপত্তি করিবে না। তাহাদের বংশের প্রাণকৃষ্ণের একটী মাত্র কন্যা আছে। কোনও ধর্ম্মকর্ম্ম বা ভগবৎসেবা বলিয়া তাহাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নাই, বরং বিশেষ উপাধি বলিয়াই মনে করে। এ স্থান হইতে লোক গেলেই আমাদিগকে অনায়াসেই আনিতে পারিবে।" এই সমস্ত কথা শুনিয়া এককালীন হর্ষ-বিষাদে আমার হৃদয় ব্যাকুলিত হইয়া গেল! চোখে জল আসিল। হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। অতি প্রত্যুষেই একজনকে পাঠাইয়া কুঞ্জকে আনান হয়। আপনার আশীর্ব্বাদে এবং ইঁহাদের যত্নে অনায়াসেই শ্রীবিগ্রহ শুভ বিজয় করিয়াছেন। এখন কি বিধান করিতে হইবে আদেশ করুন।

বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"বাবা! ঠাকুরের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে একেবারে অঙ্গরাগ করাইয়া অভিষেক করাই ভাল।"

তাহাই হইল, যতীন ভাস্করকে ডাকাইয়া ঠাকুরের অঙ্গরাগ করিবার ব্যবস্থা করাইলেন। তিনদিনে অঙ্গরাগের কার্য্য শেষ হইলে বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের আদেশক্রমে মহাভিষেক করাইয়া যথারীতি সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ঠাকুরসেবার সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবসেবাও রীতিমত চলিতে লাগিল। বৈষ্ণবসেবার সম্পূর্ণ ভার গোবিন্দদাদার উপরে। ইনি খোলা হুকুম করিয়াছেন—"ক্ষুধার্ত্ত কেহ আসিলে তাহাকে মহাপ্রসাদ দিতেই হইবে।" সুতরাং চারি পাঁচমণ চাউলের কম কোন দিনই রান্না হয় না। মহা হুলস্থূল ব্যাপার। নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত যে কেহই আসুন, মহাপ্রসাদে কেহই বঞ্চিত হইতেছেন না। বৈষ্ণবসেবা বিষয়ে ইঁহার এইরূপ মনের ভাব যদিও চিরদিনই আছে, তথাপি ঠাকুর আসিবার

দিন হইতে একেবারেই খোলা ভাবে ব্যবহার করিবার আদেশ। যে যাহা চাহিবে অবিলম্বে তাহাকে তাহা দেওয়া না হইলেই গোবিন্দদাদার উপর শাসনদণ্ড প্রয়োগ হইতে থাকে। এইরূপ পরমানন্দে খুব ধূমধামের সহিত দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

বাগানবাড়ী প্রতিষ্ঠা

বহু লোক লাগাইয়া বাগানবাড়ীর বৈঠকখানা ঘরটী মেরামত হইতেছে। একদিন পুলিনদাদাকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ পুলিন! মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব তিথি। ঐদিনে বাগানবাড়ী প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কতকগুলি জিনিষ আনিবার জন্য তোমার কলিকাতায় যাওয়া প্রয়োজন।" শুনিয়া পুলিন দাদা বলিলেন —"দিন ত অতি সন্নিকট, অতএব যাহা যাহা প্রয়োজন হইবে, একখানি ফর্দ্দ করিয়া দিন, আমি অদ্যই কলিকাতা রওনা হইব।" তখনই ইনি নিজ হস্তে ফর্দ্দ লিখিতে লাগিলেন—"রূপার খুন্তি চারিখানি, রূপার চামর চারিটী, নিশান ষোলটী, বৈঠকখানা ঘরের মাপে সতরঞ্চি একখানা, তদুপযোগী ফরাস চাদর দুইখানা, সতরঞ্চির নীচে বিছাইবার জন্য নারিকেল দড়ির ম্যাটিং, রামশিঙ্গা একটী, "শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি। ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥ শ্রীশ্রীবৃন্দাবন লীলা। শ্রীরাধারমণ বাগ অনঙ্গানন্দদা সুখময় কুঞ্জ। শ্রীশ্রীমতী ললিতাসখীর যূথের অনঙ্গমঞ্জরী দেবীর সেবা।"—এইরূপ ভাবের লেখা সাইন বোর্ড একখানি, রাধাকান্তদেবের গরদের জোড়, রাধারাণীর বেনারসী শাড়ী, ভোগের ফল প্রভৃতি প্রায় ষাট দফা জিনিষের একটী ফর্দ্দ করিয়া দিলেন। এদিকে শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের

নিকট হইতে চৌকি, চেয়ার, বেঞ্চ, টুল প্রভৃতি ঘর সাজাইবার উপযোগী অনেক প্রকার কাঠের জিনিষ আনাইলেন। নবদ্বীপবাসী পণ্ডিত-মণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করা হইল। ঠাকুর আনিবার জন্য চতুর্দ্দোলা প্রস্তুত হইল। উৎসবের দিন প্রাতঃকালে নিজ হস্তে বৈঠকখানা ঘরে প্রথম ফরাস বিছাইয়া তাহার উপর চেয়ার, বেঞ্চ প্রভৃতি রাখিয়া নানাবিধ রঙ্গের বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করাইলেন। সদর দরজা হইতে বৈঠকখানা ঘরের চতুষ্পার্শ্ব আম্রপল্লব, কদলী বৃক্ষ এবং পূর্ণকুম্ভ দ্বারা সজ্জিত করতঃ প্রতি পূর্ণকুম্ভের উপর আম্রশাখা ও তদুপরি চিড়া মুড়কী ও সন্দেশ পরিপূর্ণ একটী করিয়া সরা স্থাপন করিলেন। এদিকে চতুর্দ্দশ মৃদঙ্গযুক্ত সাতদল সংকীর্ত্তন সহ মহাসমারোহ সহকারে শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীউ নবদ্বীপের নানাস্থানে পরিভ্রমণপূর্ব্বক বাগানবাড়ীতে শুভ বিজয় করিলেন। চারিদিক লোকে লোকারণ্য। এমন কি নিম্নে স্থান না পাইয়া লোকসকল গাছের উপর উঠিয়া উৎসব দর্শন করিতে লাগিল। যথাসময়ে শ্রীশ্রীরাধাকান্ত দেব গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। এদিকে বাতাসা সন্দেশ দিয়া উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে বিদায় করা হইল। আনন্দের আর অবধি নাই। মহোৎসবের রান্না ইঁহার গুরুদেবের আশ্রমেই হইতেছে। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। নানাবিধ ফল, মিষ্টি এবং মালসা-ভোগ প্রভৃতি ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হইল। শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র ঘটক, কুঞ্জবিহারী গোস্বামী, বিপিনবিহারী গোস্বামী ও পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ভোগ দিবেন বলিয়া সকলেই নূতন কাপড় পরিতে বাধ্য হইলেন। ভক্তগণের অনুরোধে ইনিও একজোড়া পট্ট বস্ত্র পরিধান করিলেন। ইঁহার আনন্দ আর ধরে না। এতদিন পরে আজ যেন অভীষ্ট-স্থানে অভীষ্টদেবকে বসাইয়া পূর্ণকাম হইলেন। বহুদিনের আশালতা আজ যেন ফলবতী হইল। আজ যেন বাবাজী মহাশয় কল্পতরু হইলেন

যে যাহা প্রার্থনা করিতেছে অম্লানবদনে তাহার প্রার্থনা পূরণ করিতেছেন। পণ্ডিতমণ্ডলীকে যথাযোগ্য অর্থ এবং কিছু কিছু সন্দেশ দ্বারা অভ্যর্থনা করিতেছেন। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আনন্দিত, সকলেই ইঁহার ব্যবহারে পরিতুষ্ট। ইনি নিজ হস্তে তুলিয়া যাঁহাকে যাহা দিতেছেন, তাহাতেই যেন তাঁহারা কৃতকৃত্য মনে করিতেছেন। আনন্দের আর অবধি নাই। বাগানবাড়ীর পশুপক্ষী তরুলতা প্রভৃতি সকলেই আজ আনন্দ-সাগরের উত্তালতরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছে। ওদিকে যথাসময়ে ভোগ রাগ শেষ হইলে পঙ্গতের জন্য ইঁহার নিকট সংবাদ আসিল। ইনি নিজে না গিয়া সেদিনকার মত গোবিন্দ দাদার উপর ভার দিলেন এবং বৈষ্ণবসেবা অন্তে কিঞ্চিৎ অধরামৃত পাঠাইয়া দিবার আদেশ করিলেন। তাহাই হইল, বৈষ্ণবসেবার পর অনুমান চারিটার সময় ইঁহার জন্য কিঞ্চিৎ অধরামৃত ও মহাপ্রসাদের এক বাটী পায়স আসিলে ইনি কিঞ্চিৎ গ্রহণ করতঃ উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে বাঁটিয়া দিলেন। শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীউ সেদিনকার মত "শ্রীরাধারমণবাগে" থাকিয়া পরদিবস আবার ইঁহার গুরুদেবের আশ্রমে গমন করিলেন।

যুগলের সন্দেহ ভঞ্জন

এই ঘটনাটী সম্বন্ধে যুগলবাবু নিজে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই এই স্থানে উদ্ধৃত করা হইল। তিনি লিখিয়াছেন :—

আমার নাম যুগল কিশোর দত্ত। হুগলী জেলার অন্তর্গত গুটী নামক গ্রাম আমার জন্মস্থান। সন ১৩১২ সালের মাঘমাসে ধূলট উৎসব উপলক্ষে মহাপ্রভুর দর্শন ও গান কীর্ত্তনাদি শ্রবণ মানসে কলিকাতা

তালতলা নিবাসী আমার পিসতুত দাদা শ্রীযুত ননীলাল দে মহাশয়ের সঙ্গে কলিকাতা হইতে আমি শ্রীধাম গমন করি। সে সময় কলিকাতা হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপ যাইতে হইলে এক আহিরীটোলা ঘাট হইতে ষ্টীমারযোগে না হয় শিয়ালদহ হইতে ই, বি, রেলে কৃষ্ণনগর হইয়া তথা হইতে ঘোড়ার গাড়ী এবং নৌকা যোগে নবদ্বীপ পৌছিতে হইত। আমরা রেলপথেই কৃষ্ণনগর আসিয়া সে স্থান হইতে প্রথমে ঘোড়ার গাড়ী, তৎপরে নৌকা-যোগে নবদ্বীপ বড়াল ঘাটে ভোর বেলায় আসিয়া নামিলাম। বেলা তখন আন্দাজ ছয়টা। অনেক বালক বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ পরমানন্দে প্রাণের আবেগে মা পতিতপাবনী ভাগীরথীর কোলে ঝাঁপ দিয়া অশেষ জন্মার্জ্জিত পাপ তাপ ক্ষালনপূর্ব্বক যেন শান্তি-সুধা পান করিতেছে। হরিধ্বনি উলুধ্বনি, শঙ্খ, ঘণ্টা, খোল, করতাল ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত। আমরা একজন ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বড় রসিকদাসের কীর্ত্তন এখন কোথায় হইতেছে আপনি বলিতে পারেন কি?" ভক্তটী বিশেষ আগ্রহ সহকারে বলিলেন—"হ্যাঁ বাবা! আমি জানি এখন বড় আখড়ায় রসিক দাসের কীর্ত্তন হইতেছে।" আমরা আর কালবিলম্ব না করিয়া একেবারে বড় আখড়ায় গিয়া কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলাম। প্রায় দুই ঘণ্টা কীর্ত্তন শুনিবার পর ননীদাদা বলিলেন—"যুগল! চল না একবার বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিয়া আসি।" আমি বিশেষ উৎসাহিত ভাবেই বলিলাম, "বেশ দাদা, চলুন না" বলিয়া দুইজন বরাবর শ্রীবাস অঙ্গনের সম্মুখস্থ "রাধারমণ বাগ" নামক সাইন বোর্ড দেওয়া একটী বাগানবাড়ীর মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলাম। বাগানবাড়ীতে একখানি মাত্র পুরাতন বৈঠকখানা ঘর আছে, তখনও উহার বাহির মেরামত হইতেছে। ননীদাদা অগ্রে অগ্রে যে দিকে যাইতেছেন, আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেইদিকে যাইতেছি। যাইতে যাইতে

উক্ত বৈঠকখানার পূর্ব্বদিকের বারান্দায় উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলাম, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। দেখিলাম অতি সুসজ্জিত একখানি চেয়ারে দক্ষিণ চরণখানি নীচে ঝুলাইয়া বাম চরণখানি তদুপরি স্থাপন পূর্ব্বক একটী মহাপুরুষ বসিয়া আছেন। ইঁহার গায়ের রঙ ঈষৎ রক্তিমাভ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, অতি দীর্ঘাকার, সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত, গলদেশে ফুলের মালা, মাথায় ফুলের পাগড়ী, মুখখানি মৃদু হাসিমাখা, নয়ন দুটী ঈষৎ রক্তবর্ণ ও ঢুলু ঢুলু, দেখিলেই বোধ হয় যেন কাহার ভাবে সর্ব্বদা গর গর মাতোয়ারা। পরিধানে নীল রঙের বেনারসী ধুতি চাদর। চরণতলে, একজোড়া ভেলভেটের চটিজুতা, বাম পার্শ্বে রূপার ফুরসী, সটকা ও সরপস কলিকা। বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে একখানি নেটের মশারিযুক্ত সুন্দর বিছানা সুসজ্জিত রহিয়াছে। সম্পূর্ণ ঘরখানি ফরাস করা এবং নানাবিধ চেয়ার বেঞ্চ দ্বারা সাজান। কিঞ্চিৎ দূরে আমাদিগকে দেখিয়াই মৃদু মধুর হাসিমাখা সুধা-বিনিন্দিত কণ্ঠে বলিলেন—"কি গো ননী! কখন্ এলে?" ননীদাদা করযোড়ে—"আজ্ঞে! এই কতক্ষণ আসিয়াছি" বলিয়া অগ্রসর হইয়া শ্রীচরণতলে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। আমিও যেন কেমন এক প্রকার অননুভূত-পূর্ব্ব ভাবে চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের ন্যায় গিয়া শ্রীচরণে মাথা দিবামাত্র ইনি কৃপাপূর্ব্বক আমার মস্তকে স্পর্শ করতঃ পিঠের উপর দুইটী চাপড় মারিয়া বলিলেন—"ননী! এ ছেলেটী কে গা।" ননীদাদা বলিলেন—"আজ্ঞে! এটী আমার মামাত ভাই। মহাপ্রভুর দর্শন ও কীর্ত্তন শুনিবে বলিয়া আমার সঙ্গেই আসিয়াছে।" বাবাজী মহাশয় বিশেষ উৎসাহিত ভাবে বলিলেন—"তা বেশ বেশ! তোমরা এখন বড়াল ঘাটের মঠে যাও। সেখানে রাম কীর্ত্তন করিতেছে শুন গিয়া।" ননীদাদা 'যে আজ্ঞে' বলিয়া পূর্ব্ববৎ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। আমি কিন্তু এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধ কাষ্ঠ-

পুত্তলিকার ন্যায় অনিমেষনয়নে ইঁহার সেই অপরূপ রূপরাশি দর্শন করিতেছিলাম। ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা নিবাসী পুলিন বিহারী মল্লিক মহাশয়ের সহিত তাঁহাদের শোভারাম বসাক লেনস্থ বাড়ীতে একবার ইঁহাকে দর্শন করিয়াছিলাম; কিন্তু সে অন্য রকম ভাব। আজ যেন কেমন এক অভিনব মনপ্রাণ-আকর্ষী রূপ। যদিও সেই অনির্ব্বচনীয় অননুভূতপূর্ব্ব দর্শনানন্দ ছাড়িয়া আমার একেবারেই যাইবার ইচ্ছা ছিল না, তথাপি ইঁহার আদেশ শিরোধারণ পূর্ব্বক বাগান হইতে বাহির হইলাম। জানি না এতক্ষণ আমি কি ভাবে বা কোথায় ছিলাম। যদিও আমি অপরিপক্ব-বুদ্ধি ছেলে মানুষ, তথাপি মহাপুরুষের শক্তিপ্রভাবে আমার মন যেন কোন অপ্রাকৃত আনন্দময় রাজ্যে বিচরণ করিতেছিল। মহাপুরুষের সঙ্গ ত্যাগ মাত্রেই আবার মন যেন আমার ঘরে আসিল, অমনি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহাশক্তিশালিনী মায়াদেবী আসিয়া নিজ প্রভাব বিস্তার করিলেন। নানারূপ বিচার আসিয়া উপস্থিত হইল।

শ্রীবাসঅঙ্গন ঘাটের নিম্নে গঙ্গাগর্ভস্থ রাস্তা দিয়া ননীদাদা অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন, আমি উঁহার পিছে পিছে যাইতেছি আর ভাবিতেছি—"তাই ত! ননীদাদার মুখে শুনিয়াছিলাম যে ইনি একজন মহাত্যাগী পরম বৈষ্ণব সিদ্ধ মহাত্মা। কৈ সে সব ত কিছুই দেখিলাম না! ইনি যে ঘোর বিলাসী। প্রায়ই ত আমাদের বাড়ীতে অভ্যাগত বৈষ্ণবগণ আগমন করিয়া থাকেন, কৈ এরূপ বিলাসিতার ভাব ত আমরা আর কাহাতেও দেখি নাই। কি জানি এ কিরূপ বৈষ্ণব বা কিরূপ মত।" ইত্যাদি অনেক কথা মনে মনে সমালোচনা করিতে করিতে বড়াল ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ননীদাদার মুখে শুনিলাম যে রামদাস বাবাজী মহাশয় মহা ভাবুক প্রেমিক, খুব সুন্দর কীর্ত্তন করেন। ইনি ঐ মহাপুরুষের প্রিয় শিষ্য। মনে ভাবিলাম, দেখা যাক কিরূপ হয়। ক্রমে

মঠের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি যে বহুলোকের সমাগম। একটী ঘরের মধ্যে প্রভাতী সুরে কীর্ত্তন হইতেছে। অল্পবয়স্ক কাঙ্গালবেশ একমূর্ত্তি বাবাজী প্রেমস্বরে সুমধুর কীর্ত্তন করিতেছেন, আর চোখের জলে উঁহার মুখ বুক ভাসিয়া যাইতেছে। এক একবার এরূপ কম্পন হইতেছে যে তখন উঁহার মূর্ত্তি লক্ষ্য করিতে পারা যায় না। সংকীর্ত্তনকারী সকলেই প্রেমানন্দে মাতোয়ারা, সকলেই ভাবভরে রোদন করিতেছেন, কাহারই যেন দেহস্মৃতি নাই। হঠাৎ রামদাস বাবাজী মহাশয় প্রেমগদগদকণ্ঠে "আরে আমার নিতাই রে" বলিয়া যেমন রোদন করিয়া উঠিলেন, অমনি সকলেই যেন অস্থির হইয়া পড়িলেন। গাইয়া, বাজাইয়াগণ সকলেই কাঁদিতে কাঁদিতে "আরে আমার নিতাই রে" বলিয়া তালে তালে গাহিতেছেন আর বাজাইতেছেন। আমি কিন্তু এইসব ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া অবাক্। কারণ ইতিপূর্ব্বে বহু বহু খ্যাতনামা কীর্ত্তনীয়ার কীর্ত্তন শুনিয়াছি। অনেকরূপ স্বর, তাল, রাগ, রাগিণীর আলাপ শুনিয়াছি; খোল করতালে অনেকরূপ ভাব-ভঙ্গি, কলকৌশল দেখিয়াছি; কিন্তু এরূপ সাদা কথায় সোজা সুরে হৃদয়-গলান, মন-প্রাণ-মাতান কীর্ত্তন ত আর কখনও শুনি নাই। একটী কথায় আধঘণ্টা কীর্ত্তন হইতেছে; কিন্তু প্রত্যেক বারেই যেন কেমন একরূপ নূতনত্বের বিকাশ পাইতেছে; সুতরাং প্রেমেরও উৎকর্ষতা বাড়িয়া যাইতেছে। শুনিলাম প্রাতঃকালে কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। আমরা যখন কীর্ত্তন শুনিতে বসিলাম, তখন বেলা প্রায় দশটা; কাহারই শ্রান্তি বা ক্লান্তি নাই, ঠিক সমানভাবে কীর্ত্তন চলিতেছে, সমান ভাবেই হাসি কান্নার ফোয়ারা ছুটিতেছে। বলিতে কি আমি ছেলেমানুষ, কীর্ত্তনের ভাব, প্রেম, রসের বিষয়ে একেবারেই অনভিজ্ঞ; কিন্তু ঐ বাবাজীটীর মুখে এককথা একশতবার শুনিতে শুনিতে আমার পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া গেল, চোখের জলের আর যেন

বিরাম হইতেছে না। বুক ভাঙ্গিয়া কান্না আসিতে লাগিল। আমি কাঁদিতেছি বটে; কিন্তু কেন কাঁদিতেছি জানি না। কান্নাও চলিতেছে আর মনে মনে সমালোচনাও হইতেছে! ভাবিতেছি এই বাবাজী উক্ত মহাপুরুষের শিষ্য হইলেও খুব শক্তিশালী খাঁটী বৈষ্ণব। আমি বহু বৈষ্ণব দেখিয়াছি; কিন্তু এমন বৈষ্ণব আজ পর্য্যন্ত আমার চক্ষুগোচর হয় নাই। আমি ইঁহার নিকট হইতে নামমন্ত্র গ্রহণ করিব; এইরূপ সংকল্প স্থির করিয়া অনন্যমনে নাম শুনিতেছি। দেখিতে দেখিতে বেলা বারটা বাজিয়া গেল। একজন আসিয়া হঠাৎ বলিলেন যে "বড় বাবাজী মহাশয় আসিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়াই হউক অথবা নিজের ইচ্ছা-ক্রমেই হউক, ইনি কীর্ত্তন সমাপ্ত করতঃ বাহিরে আসিয়া যেমন ইঁহাকে প্রণাম করা, অমনি ইনি বলিতে লাগিলেন—"রাম! তোমার কি সেবা-বোধ একেবারেই হইল না? ভজনের মধ্যে কেবল কীর্ত্তন করিয়া কাঁদিতে শিখিলে! আর কিছুই জানিলে না। বৈষ্ণবদিগকে মহাপ্রসাদ পাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। অন্ন-ব্যঞ্জন সমস্তই প্রস্তুত, এখনও ঠাকুরের ভোগরাগের যোগাড় হইল না। বেলা বারটা বাজিয়া গিয়াছে। তবুও তোমার কীর্ত্তন শেষ হইল না! বল দেখি বৈষ্ণবদের কতই কষ্ট হইবে! শুধু প্রেমানন্দে মাতিলেই চলিবে কেন, সেবানন্দও ত চাই।" ইত্যাদি নানারূপ ভাবে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। সকলেই নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ। আমি কিন্তু এ সমস্ত কোন ব্যাপারেই নাই। আমি ঐ মহাপুরুষের বেশ দেখিয়াই একেবারে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছি। সকালে যাঁহার বিলাসিতার ভাব দেখিয়া মনে মনে কিন্তু করিয়াছিলাম, এখন আবার তাঁহার দীন বেশ দর্শনে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি! পরিধানে পট্টবস্ত্রের পরিবর্ত্তে অতি মলিন জীর্ণ এবং ছিন্ন একখানি বহির্ব্বাস, খালি পা, সর্ব্বাঙ্গে চন্দনের পরিবর্ত্তে রজ

মাখা হইয়াছে। হাতে একটী থেলো হুঁকো, উহার উপর একটী ডাঙ্গা কলিকা! অতি দীনহীন কাঙ্গাল বেশে ভ্রমণ করিতেছেন, আর বালক, বৃদ্ধ, যুবা, যে কোনও বৈষ্ণব মূর্ত্তি দর্শন মাত্র পরম ভক্তিপূর্ব্বক সাদরে দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ প্রেমগদগদকণ্ঠে কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন। ইঁহার তৎকালীন বেশ-ভূষা, ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া আমার কান্না পাইতে লাগিল এবং নিজের সঙ্কীর্ণ মনের বিচারবুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম। মনে ভয়ানক অনুতাপ আসিল। ভাবিলাম, হায়! আমি মহতের নিকট কতই না অপরাধী হইয়াছি! গুরুগণদিগের মুখে শুনিয়াছিলাম যে "বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়" আমি কি না সামান্য অজ্ঞ বালক হইয়া সেই বৈষ্ণবের বিচার করিতে গিয়াছিলাম! এই অন্তর্য্যামী মহাপুরুষ আমার মনের অবস্থা বুঝিয়াই বোধ হয় এইরূপ বেশে এ স্থানে আসিয়াছেন। ইঁহাদের অবস্থা বা মনের ভাব সামান্য বেশ-ভূষা বা ক্রিয়া মুদ্রা দ্বারা অবগত হওয়া আমাদের ন্যায় অজ্ঞ জীবের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই যে রামদাস বাবাজী মহাশয় যখন কীর্ত্তন করিলেন, তখন একরূপ দেখিলাম; কিন্তু এখন যেন অন্য প্রকার দেখা যাইতেছে। এই মহাপুরুষকে সকালে এক প্রকার দেখিলাম, এখন এক প্রকার দেখিতেছি। ইনি যখন কীর্ত্তন করিবেন তখন না জানি কি অপূর্ব্ব ভাব প্রেমের বিকাশই হইবে। আমার ভাগ্যে সে শুভদিন ঘটিবে কিনা প্রভুই জানেন, আর এই মহাপুরুষই জানেন। ইত্যাদি নানারূপ ভাব মনে হইতেছে, আর অনুতাপক্লিষ্ট হৃদয়ে মনে মনে দূর হইতে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলাম। যদিও এতক্ষণ মনে মনে দৃঢ় ধারণা করিলাম যে যখন ননীদাদা এই মহাপুরুষের শিষ্য তখন আমার এই সব ক্ষুদ্র হৃদয়ের কথা উঁহাকে বলিলেই হয় ত উনি বিশেষ দুঃখিত হইবেন; কিন্তু এখন আর সে ধারণা স্থির রাখিতে পারিলাম না—মনের

মধ্যে অনুতাপানল এতই প্রবলভাবে জ্বলিতে লাগিল যে, আমাকে যেন একেবারে অবসন্ন করিয়া ফেলিল ; সুতরাং ব্যাকুলভাবে ননীদাদাকে অদ্যোপান্ত সকল কথা জানাইতে বাধ্য হইলাম। ননীদাদা আমার কথা শুনিয়া বলিলেন—"ভাই ! তুমি নিতান্ত ছেলে মানুষ, বাবাজী মহাশয়ের মহিমা কিছুই জান না, তাই এরূপ বিচার করিয়াছ। সামান্য জীবন্মুক্ত অবস্থা সম্পন্ন সাধকগণকে যখন বাহ্যিক কোনও বিষয়-সংস্পর্শাদি স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না, পদ্ম-পত্রের জলের ন্যায় তাঁহারা নির্লিপ্ত থাকেন, তখন বাবাজী মহাশয় সম্বন্ধে আমি আর কি বলিব ? ঘোর নাস্তিক, ভণ্ড, পাষণ্ডগণও ইঁহার ভক্তি-প্রভাব, কীর্ত্তনের বিকাশ এবং ভাব প্রেম প্রভৃতি দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া যায়। ইঁহার উদারতা, দয়ালুতা, অদোষদর্শিতা প্রভৃতি গুণ দেখিলে সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ বলিয়া মনে হয়। তুমি ইঁহার প্রতি দোষদৃষ্টি করিয়া খুব অন্যায় করিয়াছ। তবে এটা নিশ্চয় মনে রাখিও যে ইনি কাহারও অপরাধ গ্রহণ করেন না। আমার বিশ্বাস—তোমাকে এই বিষম অপরাধের হাত হইতে মুক্ত করিবার জন্যই আজ এইরূপ দীন বেশে আগমন করিয়াছেন। কোনই ভয় নাই। তুমি কাতরপ্রাণে ভক্তিভাবে গিয়া ইঁহার শ্রীচরণতলে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা কর। তোমার সকল তাপ দূর হইয়া যাইবে। পরম দয়াল প্রভুর কৃপায় তুমি পরম শান্তিলাভ করিতে পারিবে।" আমি তখন ননীদাদার অভয়বাণীতে আশ্বাসিত হইয়া বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণতি পুর্ব্বক প্রাণে প্রাণে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। ইনি আমায় কৃপা করিলেন। আমার সকল তাপ জুড়াইয়া গেল। এতক্ষণে বুঝিলাম যে পরম করুণাময় উদারচেতা বৈষ্ণবগণ অপরাধ গ্রহণ না করিলেও তাঁহাদের ক্রিয়ামুদ্রা লইয়া সমালোচনা বা তাহাতে দোষদৃষ্টি করিলে অনর্থের চরমসীমায় পৌঁছিয়া

অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। আর উঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ কৃপা লাভ করিতে পারিলে অতি অনায়াসে পরমার্থ-ধনে ধনী হইয়া শান্তিসাগরে নিমগ্ন হইয়া মানব-জীবন সার্থক করিতে পারা যায়। এই ভাবিয়া প্রাণে প্রাণে বৈষ্ণব ঠাকুরের জয় দিতে লাগিলাম।

এ দিকে ঠাকুরের ভোগ হইয়া গেল; নিমন্ত্রিত নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণব-গণ শুভাগমন করিলে পঙ্গত আরম্ভ হইল। আনন্দময় বৈষ্ণবগণ "ভজ মন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ভজনগান ধরিলেন। আমরা একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতে করিতে একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আচ্ছা আজ মঠে বৈষ্ণবসেবা হইতেছে কেন?" তিনি বলিলেন—"ভাই! বাবাজী মহাশয়ের বৈষ্ণবসেবাই প্রাণ, প্রায় প্রত্যহই এইরূপ হইয়া থাকে, তবে আজ কিছু অধিক পরিমাণে হইবার কারণ—আজ কয়েকদিন হইতে নবদ্বীপবাসী অনেক মূর্ত্তি বৈষ্ণবের ইঁহার সহিত মহাপ্রসাদ লইয়া বিচার চলিতেছে। বাবাজী মহাশয় বলেন—'কৃষ্ণে নিবেদিত অন্নাদি যে কিছু হইবে, মহাপ্রসাদ জ্ঞানে তাহা গ্রহণ করিবে॥ স্পর্শদোষে কৃষ্ণপ্রসাদ নষ্ট নাহি হয়। নষ্টদোষ ঘটাইলে নিজে নষ্ট হয়॥ মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে। স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥ কুক্কুরাণাং মুখাদ্ ভ্রষ্টং তদন্নং পাবনং মহৎ। ইত্যাদি মহাপ্রসাদগত যে সমস্ত ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য কি?'

বৈষ্ণবগণ বলেন, 'দেখুন, এই যে সমস্ত প্রমাণ উহা একমাত্র অন্নক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথধামে শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদগত। শ্রীক্ষেত্রে শুচি, অশুচি, গৃহী, উদাসী, ব্রাহ্মণ, চণ্ডালাদি কোনই বিচার নাই। তাই বলিয়া অন্যত্র সে বিধান কিরূপে চলে?'

বাবাজী মহাশয় বলেন, 'তাহা হইলে বুঝা গেল শ্রীধাম পুরীতে

শ্রীজগন্নাথদেবকে যাহা ভোগ দেওয়া যাইবে সেইটীই মহাপ্রসাদ হইবে। অন্যত্র আর হইবে না। কেমন এই নয় কি?'

বৈষ্ণবগণ বলেন, 'তা বই কি, মহাপ্রসাদ বলিলেই যখন জগন্নাথ-দেবের প্রসাদকে বুঝায়, তখন বিচার-রহিত ভাবে গ্রহণ করিতে হইলে তাহা ছাড়া অন্য প্রসাদ কিরূপে হইবে?'

বাবাজী মহাশয় বলেন, 'এ কথাটী সাধারণ লোকে বলিলে আমার আর কিছু বলিবার ছিল না, তবে আপনারা কৃষ্ণ-উপাসক এই জন্য আমার একটি নিবেদন আছে। আচ্ছা, মহাপ্রসাদ নাম হয় কেন?'

বৈষ্ণবগণ বলেন, 'ভগবান গ্রহণ করেন এবং সেই বস্তুতে ভগবদ-ধরামৃত সঞ্চারিত হয় বলিয়াই তাহাকে মহাপ্রসাদ বলা হয়।'

বাবাজী মহাশয় বলেন, "বেশ সুন্দর কথা! তাহা হইলে শ্রীধামপুরী এবং শ্রীজগন্নাথদেব ছাড়া অন্য যে কোনও স্থানে যে কোনও বিগ্রহকে ভোগ দেওয়া হয়, তাঁহারা সে সমস্ত গ্রহণও করেন না, তাঁহাদের অধরা-মৃতও ঐ বস্তুতে সঞ্চারিত হয় না এইটী বুঝিতে হইবে কি? অপর কথা দূরে থাক, আপনাদের ইষ্টদেব শ্রীনারায়ণ বা রাধা-গোবিন্দ, নিতাই-গৌরাঙ্গকে যে আপনারা এত কষ্ট স্বীকার করিয়া কায়মনোবাক্যে ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে যে ভোগ অর্পণ করেন উহার সার্থকতা কোথায়? তাঁহারা যদি গ্রহণই না করেন তবে দেওয়ার প্রয়োজন কি? আবার যদি গ্রহণ করেন তবে তাঁহাদের (নিজ ইষ্টদেবের) অধরামৃতে স্পর্শদোষ কিরূপে হইতে পারে? শ্রীজগন্নাথধাম সার্ব্বজনীন, ঐ মহাপ্রসাদ বস্তু-শক্তিমৎ অর্থাৎ ভক্ত, অভক্ত, ভণ্ড, পাষণ্ড, উপাসক, অনুপাসক, ছোট, বড় সকলেই জগন্নাথের মহাপ্রসাদ মানিতে বাধ্য; কিন্তু এইটী হইল ভক্তিশক্তিমৎ, ইহাকে সাধারণে না মানিতে পারে, তাই বলিয়া যাঁহাদের ইষ্ট বা যাঁহারা তাঁহার উপাসক বা আশ্রিত তাঁহারা যদি

না মানেন, তবে মহাপ্রসাদের অবজ্ঞাজনিত অপরাধের ভাগী হইতে হয় না কি? অথবা স্বীকার করিতে হয় যে আমরা যাহা ঠাকুরকে অর্পণ করি উহা তিনি গ্রহণ করেন না; সুতরাং আমরা অমানিয়া অনিবেদিত বস্তুই গ্রহণ করি। হয় মহাপ্রসাদ বলুন, না হয় অমানিয়া বলুন, একটী পথে যাইতে হইবে ত।' এইরূপ ভাবের যুক্তি, তর্ক, সিদ্ধান্ত লইয়া তিন চারিদিন পর্য্যন্ত ইঁহাদের সঙ্গে বিচার চলিতেছিল। অবশেষে বৈষ্ণবগণ ইঁহার মতেই মত দিয়াছেন। তাই আজ এই মহোৎসব।" বৈষ্ণবটীর মুখে বড় বাবাজী মহাশয়ের যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত শ্রবণে আমরা সকলেই পরমানন্দ লাভ করিলাম।

যথাসময়ে বৈষ্ণবগণ মহাপ্রসাদ সেবা করতঃ আচমনান্তে ইঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলে ইনিও যথাযোগ্য ভাবে সাদর সম্ভাষণ, দণ্ডবৎ প্রণতি পূর্ব্বক সকলকে বিদায় দিয়া নিজেরা সকলে মহাপ্রসাদ পাইতে বসিবেন এই সময় জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাম কোথায়?" একজন বলিলেন—"তিনি বড়াল ঘাটের উপর বিমর্ষভাবে বসিয়া আছেন।"

ইনি। কেন এখনও বসিয়া আছে? তাহাকে মহাপ্রসাদ পাইতে ডাকিয়া আন ত!

সঙ্গীটী দ্রুতগতি রামদাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"আজ্ঞে! রামদাদা ছল ছল চোখে বসিয়া কি ভাবিতেছেন। আমি কত ডাকিলাম কোনই উত্তর দিলেন না"

ইনি "ওঃ—সে আমার উপর অভিমান করিয়াছে! আচ্ছা আমিই যাই" বলিয়া সদর দরজায় দাঁড়াইয়া 'রামা' বলিয়া গগনভেদী স্বরে এক ডাক দিবামাত্র তিনি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে যেমন নিকটে আসিলেন অমনি ইনি সস্নেহে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিলেন—"কি রকম! আমি বকিয়াছি বলিয়া বুঝি অভিমান হইয়াছে? 'যেই জন কৃষ্ণ ভজে

সে বড় চতুর' সবদিকে লক্ষ্য রাখা বা সমন্বয় করার নামই চতুরতা—নিজে ভজন সাধন করিতে গিয়াও কায়মনোবাক্যে কাহারও কোনরূপ উদ্বেগের কারণ না হয় এইটাই সর্ব্বদা দেখা দরকার। একমাত্র কৃপাই যখন আমাদের সম্বল এবং সাধন-ভজন, ভাব-ভক্তির মূল, তখন যে কোন রূপেই হউক প্রাণিমাত্র যাহাতে উদ্বেজিত না হয় তাহাই করিতে হইবে। মোট কথা—ভগবৎপথের পথিক হইতে হইলে গীতার এই শ্লোকটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে "যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ। হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥" ইত্যাদি মৃদুমধুর বাক্যে উঁহাকে এবং আমাদিগকে উপদেশ দিতে দিতে উঁহার হস্ত ধারণ করতঃ নিজ বাম পার্শ্বে বসাইয়া মহাপ্রসাদ সেবা করিতে লাগিলেন।

আহা মরি! গুরুশিষ্যে এমন মধুর ভাব, এরূপ প্রীতি আমি আর কোথাও দেখি নাই। সেবা করিতে করিতে যে বস্তুটী মিষ্টি লাগিতেছে, অমনি রামদাস বাবাজী মহাশয়ের পাতায় তুলিয়া দিতেছেন। কি অমিয়ামাখা বাৎসল্য! সকলেই প্রসাদ পাইতে বসিলেন। বাবাজী মহাশয়ের আজ্ঞাক্রমে আমরাও ঐ সঙ্গে পরমানন্দে মহাপ্রসাদ সেবা করিতে লাগিলাম। যথাসময়ে মহাপ্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক সকলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। আমরাও ইঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ বাসায় গমন করিলাম।

শ্রীশ্রীহরিসভা

শ্রীধাম নবদ্বীপের হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভা একটী প্রসিদ্ধ স্থান। পূজ্যপাদ পণ্ডিত-প্রবর বৈষ্ণব-চূড়ামণি শ্রীগৌরগতপ্রাণ মহাত্মা ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় ইঁহার প্রতিষ্ঠাতা। দেশ বিদেশে স্থানটীর পুরা নাম হয়ত অনেকেই অবগত নহেন—হরিসভা বলিলে এক বাক্যে

সকলেই বুঝিতে পারিয়া থাকেন। সভার প্রথম স্থাপন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তির আবির্ভাব একটী অলৌকিক কাহিনী। মোট কথা—যে সময় ইঁহার প্রকাশ সে সময় শাক্ত ও শৈবদিগের প্রপীড়নে শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ বা তৎপ্রবর্ত্তিত পন্থা একেবারে লুপ্তপ্রায় হইতে বসিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; তখন সেই মহাত্মার কাতর ক্রন্দনে পরম করুণ শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া নিজ ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। বাবাজী মহাশয় প্রায় সর্ব্বদাই হরিসভা এবং ঐ শ্রীমূর্ত্তির প্রসঙ্গ করিতে করিতে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যান। এমন কি ইনি বলেন,—"আমি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধ্যান করিতে বসিলেই হরিসভার শ্রীমূর্ত্তি আসিয়া আমার সম্মুখবর্ত্তী হন। ঐ নব নটবর বপু গৌর কিশোরই আমার নয়নমন প্রাণ চুরি করিয়াছেন, আমি আর অন্য কোন ভাবের মূর্ত্তির নিকটে বিক্রী হইতে পারিলাম না।" এই স্থানটীর স্বত্বাধিকারী বা বর্ত্তমান সেবাইত উক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী। ইঁহার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত ইঁহার ব্যবহার দেখিলে বোধ হয় যেন ইনি একজন মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত বা নিত্য পরিকর। ইঁহার যত কিছু আবদার বা বলিবার কহিবার স্থান একমাত্র মহাপ্রভু। কোন কোন নৈমিত্তিক উৎসবাদি উপলক্ষে কোন বিষয়ের অসুবিধা বা অসংস্থান হইলে শিতিকণ্ঠদাদা মহাপ্রভুর সম্মুখীন হইয়া ঠিক কুপিতের ন্যায় বলেন—"দেখ, যদি এই কার্য্য না হয় বা কোন অসুবিধা হয়, তবে আমি তোমার ঐ উর্দ্ধে তোলা ডাহিন হাতখানি টানিয়া নামাইয়া দিব। যদি ভাল চাও সুব্যবস্থা করিয়া দাও।" আহা মরি! ভক্তের বিশুদ্ধভাবে বাধ্য হইয়া প্রভু আমার যেন ভীত ভীত ভাবে অবিলম্বে সেই কার্য্য সমাধা করিয়া দেন। কোনদিন হয় ত কোনও উৎসব উপলক্ষে বহুলোক মহাপ্রসাদ পাইতে

বসিয়াছে বা উদ্যোগ হইতেছে, এই সময় আকাশ ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। সকলেই হতাশপ্রাণে বলিতে লাগিলেন—"আর রক্ষা হইল না। যেরূপ মেঘ হইয়াছে তাহাতে মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া যাইবে।" এই সময় শিতিকণ্ঠদাদা আরক্তিমনয়নে কম্পান্বিত-কলেবরে মহাপ্রভুর পূজার কোশাখানি হাতে লইয়া বলিলেন—"দেখ, যদি একবিন্দু জল মাটিতে পড়ে তবে এই কোশার বাড়িতে তোমার মাথা ভাঙ্গিয়া দিব।" কি আশ্চর্য্য! দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে একটী বাতাস আসিয়া মেঘ উড়াইয়া দিল। আকাশ পূর্ব্ববৎ পরিষ্কার হইল, নির্বিঘ্নে পরমানন্দে উৎসবাদি শেষ হইয়া গেল। এইরূপ ঘটনা ইঁহার জীবনে অনেক দেখা যায়।

বহুদিন হইতেই বাবাজী মহাশয়ের সহিত ইঁহার ভ্রাতৃভাব। ইনি বাবাজী মহাশয়কে দাদা বলিয়া ডাকেন, বাবাজী মহাশয়ও উঁহাকে ঠিক কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিয়া থাকেন। অর্থাদির অভাবেই হউক বা অন্যান্য নানাবিধ কারণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার বিষয়ে কিছু অসুবিধা হইতে লাগিলে একদিন শিতিকণ্ঠদাদা আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন—"দেখুন দাদা! আর ত আমি মহাপ্রভুর সেবা চালাইয়া উঠিতে পারিতেছি না। এখন আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন।"

বাবাজী। ভয় কি ভাই! যাহার সেবা তিনিই চালাইতেছেন ও চালাইবেন। আমরা ত নিমিত্তমাত্র বই নই।

শিতিকণ্ঠ। নিমিত্তমাত্র হইলেও সাময়িক একটা যে চিন্তা বা চেষ্টা তাহাতেই আমাকে বড় বিকল করিতেছে।

বাবাজী। আচ্ছা, কি করিলে তুমি বেশ নিশ্চিন্তে থাকিতে পার?

শিতিকণ্ঠ। আমার সম্পূর্ণ ভার অর্থাৎ মহাপ্রভুর এবং তাঁহার সংসারের যাবতীয় ভার আপনাকে বহন করিতে হইবে। আমি

আপনার ছোট ভাই, আমাকে যাহা করিতে বলিবেন, আমি তাহাই করিব।

বাবাজী। বেশ ত নিতাইচাঁদের ইচ্ছায় আজ হইতে তোমার সম্পূর্ণ ভার আমি গ্রহণ করিলাম, তুমি নিশ্চিন্তমনে মহাপ্রভুর সেবা সম্বন্ধে যেরূপ সুবন্দোবস্ত করিলে ভাল হয় কর।

শিতিকণ্ঠ। শুধু মুখের কথায় আমার মনে শান্তি হইবে না। এমন ভাবের একটী লেখাপড়া হওয়া চাই, যাহাতে আমি এবং আপনি উভয়ে এবং উভয়ের যে কেহ সকলে বাধ্য থাকিব।

বাবাজী মহাশয় "বেশ ত! তাহাতেই যদি তোমার তৃপ্তি হয় কর।" বলিয়া শ্রীহরি মজুমদার মহাশয়কে একটী মুসাবিদা করিতে বলিলেন।

এক টাকা দামের ষ্ট্যাম্প কাগজ আনা হইল। নানালোক নানারূপ মুসাবিদা করিতে লাগিলে মতামত কেহই কিছু স্থির করিতে না পারিয়া ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে ইনি যথাযথ রূপে মুসাবিদা করিয়া দিলেন। লেখাপড়া হইতে লাগিল, এদিকে মাঘী পূর্ণিমার দিন হরি-সভায় সংকীর্ত্তন লইয়া গমন করিবেন মনস্থ করিয়া শিতিকণ্ঠদাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাই! তোমার হরিসভায় নবদ্বীপের যে সমস্ত ছেলেরা সংকীর্ত্তনাদি করে তাহাদিগকে ডাকাও, আজ সকলে মিলিয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে হরিসভায় যাইতে হইবে।" তাহাই হইল, সকলকে ডাকান হইল। ইনি তখন কিষণলাল ব্রজবাসীকে ডাকাইয়া বলিলেন—"দেখ, এই যত ছেলে আছে সকলকে বৃন্দাবনী ধুতি চাদর পরাইয়া দাও; কিন্তু সমস্তই গোলাপী রং-এর হওয়া চাই। ব্রজবাসী নিজের এবং অন্যান্য দোকান হইতে কাপড় কিনিয়া সকলকে পরাইয়া দিলেন। প্রায় ত্রিশ জোড়া ধুতি চাদর আসিল। বাকী মহাপ্রভু এবং অন্যান্য সকলের জন্যও নূতন কাপড় আনা হইল। সেবার জন্য ফল

মূল প্রভৃতি অনেক প্রকার ব্যবস্থা করাইলেন। খুব ধুমধামের সহিত কীর্ত্তন লইয়া হরিসভায় গমন করতঃ প্রথমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট অনেকক্ষণ সংকীর্ত্তন ও আত্মনিবেদন করিতে লাগিলেন। পরে নিজগণের প্রতি উপদেশছলে বলিতে লাগিলেন—"যদি কেহ আমাকে ভালবাসিতে বা ভক্তি করিতে চাও তবে প্রাণ ভরিয়া এই শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভজ, ইঁহার সেবা কর। আমি ইঁহার শ্রীচরণে চিরজীবনের মত বাঁধা রহিলাম।" ইত্যাদি অনেক প্রকার বাক্যে হরিসভায় যে ইনি সর্ব্বদা থাকিবেন এই কথা বলিয়া কীর্ত্তন শেষ করিবামাত্র মাতাঠাকুরাণী (শিতিকণ্ঠ দাদার গর্ভধারিণী) আসিয়া যেমন উপস্থিত হইলেন অমনি ইঁনি শশব্যস্তে গিয়া তাঁহার চরণধারণ পূর্ব্বক বলিলেন—"মা! আমি আপনার সন্তান, আজ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংসারের যাবতীয় ভার আমি গ্রহণ করিলাম। আমার জীবনাবধি শিতুকে আর কিছু ভাবিতে হইবে না, আপনি ঠিক সন্তানজ্ঞানে নিঃসঙ্কোচে আমার নিকটে সমস্ত বলিবেন। সেবা বা মহাপ্রভুর সংসার সম্বন্ধে যখন যাহা প্রয়োজন হইবে আমাকে জানাইলেই আমি তাহা সম্পন্ন করিব।"

ইঁহার এই কথা শুনিয়া বাৎসল্যময়ী জননী ছলছলনেত্রে গদগদ-কণ্ঠে ইঁহার মস্তকে বাম হস্ত প্রদানপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—"বাবা! তুমি চিরজীবী হও। আমার শিতু নিরাশ্রয় ছিল, তুমি উহার আশ্রয় হইলে, দুই ভাই মিলিয়া পরমানন্দে গৌরাঙ্গের সেবা কর। আমার এই বৃদ্ধকালে আমি দেখিয়া শুনিয়া সুখী হই। বাবা! গৌর আমার বড়ই আদরের ধন অমূল্যরতন। অন্ধের যষ্টিখানি শিতু তোমার হস্তে সমর্পণ করিল, দেখ মনে কোনওরূপ কষ্ট না হয়! যত্নের ধন যত্ন করিয়া নিজেও সুখী হও, জগৎকেও সুখী কর, দেখিয়া শুনিয়া আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করি।" বাৎসল্যের মূর্ত্তি ভক্তিমতী মায়ের প্রেমপূর্ণ সারগর্ভ

আশীর্ব্বাদ শ্রবণে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী কাঁদিয়া অধীর। ইনি সাশ্রু-গদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"মা! আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন শ্রীগৌরাঙ্গে প্রীতি থাকে। আমি আর কি বলিব? যতদিন জীবিত থাকিব ততদিনের মধ্যে শিতুর আর কোনও ভাবনা করিতে হইবে না। গৌর যখন অঙ্গীকার করিয়াছেন তখন তিনি নিজে তাড়াইয়া না দিলে আমি আর যাইব না।" ইত্যাদি নানা কথার পরে সেবার পরিপাটি সমস্ত জানিয়া লইলেন।

একজন পূজারী ব্রাহ্মণ রাখা হইল। প্রত্যহ প্রায় পনর টাকা হিসাবে খরচ হইতে লাগিল। আনন্দের আর অবধি নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এ যাত্রায় বাবাজী মহাশয় কল্পতরু হইয়াছেন। কেহ বা মাতৃ-পিতৃ-শ্রাদ্ধ, কেহ বা ঋণগ্রস্ত হইয়া যেমন ইঁহার নিকট উপস্থিত হইতেছেন, ইঁনি অমনি ফণী বা গোবিন্দদাদাকে ডাকিয়া সেই সময় উঁহাদের হাতে যাহা কিছু থাকিবে সমস্ত দিবার আদেশ করিয়া দেন। উঁহারাও আদেশানুরূপ আচরণ করিয়া ইঁহার প্রীতির পাত্র হইতে লাগিলেন। হরিসভা লেখাপড়া হইল; কিন্তু কেন যেন ইনি রেজিষ্টারী করিতে আপত্তি করিলেন, অর্থাৎ নানারূপ স্তোভ বাক্যে সকলকে নিস্তব্ধ করিয়া রাখিলেন। হরিসভায় প্রবেশ করিয়াই ভেট উঠাইয়া দিলেন। এমন কি অনেকের নিকট নিজ অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে—"যে যে ঠাকুরবাড়ীতে ভেট আছে, তোমরা তাহাদের বার্ষিক ভেট বাবদে জমার হিসাব আন, আমি ঝোলা কাঁধে করিয়া ঐ সমস্তের অভাব মোচন করিব। আপামর সাধারণ মন প্রাণ ভরিয়া প্রাণের ঠাকুরকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হউক।" এইরূপভাবে কত কত কথা, কত কতরূপ কার্য্য যে আচরিত হইতে লাগিল কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? যাঁহারা ইঁহার সঙ্গে থাকিয়া এ সমস্ত লীলাখেলা দর্শন, শ্রবণ,

আচরণ বা আস্বাদন করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাঁহারাও বর্ণনা করিতে গিয়া উহার শতাংশের একাংশ প্রকাশ করিতে সমর্থ হন না।

একদিন বাবাজী মহাশয় পোড়ামাতলা দিয়া আসিতেছিলেন, এই সময় হঠাৎ শিতিকণ্ঠ দাদার সহিত দেখা হইলে তিনি বলিলেন— "দাদা! আপনি কোথায় গিয়াছিলেন?"

বাবাজী। ভাই! মহাপ্রভুর বিলাসভূমি শ্রীধাম নবদ্বীপে ভ্রমণ করিতে পারিলে ত কাজই হইত, আমাদের সে ভ্রমণ কোথায়? আমরা "অর্থলাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণব বেশে, ভ্রমিয়া বেড়াই স্থানে স্থানে। লব্ধপদ প্রতিষ্ঠার, আসা করি অনিবার, ভজনের করি মাত্র ভানে॥" মনে করিয়াছিলাম যে বোধ হয় মহাপ্রভু আমাকে সেবায় অঙ্গীকার করিলেন; কিন্তু তাহা হইল কৈ? আমার আত্মসুখ যতক্ষণ রহিয়াছে ততক্ষণ কি করিয়া সেবা করিব? আর যখন সেবাই না হইল, তখন এ জীবন বৃথা, ইহা থাকা না থাকা সমান।

ইত্যাদি আত্মদৈন্যসূচক উপদেশপূর্ণ নানা কথা বলিতে বলিতে উভয়েই "রাধারমণ বাগে" আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র কৃষ্ণদাস জল আনিয়া চরণ ধৌত করিয়া দিল। উভয়ে আসনে উপবিষ্ট হইলে গোবিন্দ দাদা নানাবিধ ফল, মিষ্টি প্রভৃতি আনিয়া সম্মুখে ধরিলে ইঁনি উহা হইতে শিতিকণ্ঠদাদাকে তুলিয়া দিতে বলিলে, শিতিকণ্ঠ দাদা বলিলেন—"দাদা! আমার মহাপ্রভুর সেবা এখনও হয় নাই; সুতরাং আমি কিরূপে খাইব?"

বাবাজী। আরে তোর মহাপ্রভু তোরই থাকিবে, মহাপ্রভু তোর প্রেমে বাঁধা পড়িয়াছে। তুই প্রসাদ পাইয়া গিয়া সেবা করিস।

এই বলিয়া ভাল ভাল দ্রব্য উঁহার পাতে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। প্রথমে শিতিকণ্ঠ দাদা সামান্য কিছু দিবার জন্য অনুরোধ করিলে ইনি

বলিলেন—"ভায়া! তুমি খাইলে আমার যত তৃপ্তি বোধ হয় তত তৃপ্তি আমি নিজে খাইলেও হয় না। তোমার দ্বারা অনেক মহৎ কার্য্য সাধিত হইবে। তুমি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া মহাপ্রভুর সেবা কর। প্রভুর চরণে আমার এই প্রার্থনা। আমার যিনি হইবেন তিনি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিবেন। আমার সঙ্গে এই যে সমস্ত লোক আছে, ইহারা তোমার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না; সুতরাং তুমি ইহাদের ভিতরে প্রবেশ না করিয়া বাহিরে বাহিরে থাকিবে। সম্প্রতি শ্রীধামে যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও গোস্বামীগণ আছেন, সকলকে একবার আহ্বান করিয়া আনিতে হইবে। তুমি আর বিলম্ব না করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক শীঘ্র গমন কর।"

শিতিকণ্ঠ দাদা কৃষ্ণদাসকে বলিলেন—"কৃষ্ণ! তুমি একবার সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলী ও গোস্বামীগণকে ডাকিয়া আন ত?" শুনিয়া বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"দেখ ভাই! উহাদের দ্বারা এ সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভব হইলে আমিই বলিতাম! উহারা হয় ত কিছুদূর হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিবে—'কই কাহাকেও ত পাইলাম না'; সুতরাং অন্য কাহাকেও না পাঠাইয়া তুমি নিজে এই কার্য্যটী সাধন কর।" তাহাই হইল, শিতিকণ্ঠদাদা যথাসময়ে সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলী ও গোস্বামীগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে গেলেন। স্থানান্তরে নিমন্ত্রণ থাকায় অনেক পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন না। দশ বার জন যাঁহারা ছিলেন সকলেই আগমন করিলেন। বিশেষ সম্মানের সহিত সকলকে উপবেসন করাইয়া কিছুক্ষণ নানাবিধ ভাবে ভগবৎ প্রসঙ্গ করতঃ যথাযোগ্যরূপে সকলকে কিছু কিছু প্রণামী দিয়া বিদায় দিলেন। পণ্ডিতমণ্ডলী বিদায় হইয়া গেলেন। এদিকে শিতিকণ্ঠদাদার মাতাঠাকুরাণী হরিসভা হইতে মহাপ্রভুর প্রসাদ চরণামৃত লইয়া আসিলেন। ইনি মাকে দেখিবামাত্র

বিশেষ আগ্রহ সহকারে প্রণাম করতঃ প্রসাদ চরণামৃত গ্রহণ করিলে পর মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা! মহাপ্রভুর সেবার কিরূপ কি হইবে?"

বাবাজী। মা! তোমার এই শিতু হইতে সমস্ত হইবে। কত লক্ষ-পতি তোমার এই শিতুর পায়ে লুটাইবে। চিন্তা কি মা? আমি হরিসভায় বাঁধা রহিলাম, আমার যে হইবে সে কখনও হরিসভাকে ভিন্ন বা শীতুকে পর ভাবিতে পারিবে না।

ইত্যাদি নানারূপ কথাবার্ত্তায় মাকে সন্তুষ্ট করতঃ বিদায় দিলেন। শিতিকণ্ঠদাদার সঙ্গে একান্তভাবে কতরূপ ভাবে যে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল কে তাহার বর্ণনা করিবে? এমন কোনও ভাষা নাই, যাহা দ্বারা সেই সমস্ত প্রকাশ করা যাইতে পারে।

বাবাজী মহাশয় নীলাচল, নবদ্বীপ, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থান এবং অন্যান্য দেশান্তর পরিভ্রমণ করিয়া যে যে লীলা-খেলা, ভগবৎপ্রসঙ্গ বা তত্ত্ব-আলোচনা প্রভৃতি আচরণ করিয়াছেন, তাহা অপার-অনন্ত এবং পরম গভীর। উহার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হওয়া বা উত্তীর্ণ হওয়া মাদৃশ ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব; আশা করাও ভক্তসমাজে উপ-হাসাস্পদ হওয়া ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। তথাপি 'আত্ম পবিত্রিতে' যাহা কিছু আলোচনা করা হইল, উহার ক্রমভঙ্গ, অসংলগ্নতা, অসামঞ্জস্য অপ্রাসঙ্গিক, অযথা ভাষণ প্রভৃতি সংগ্রহকারীর সে সমস্ত দোষরূপ মালিন্য এই নির্ম্মল **চরিত-সুধায়** সংস্পৃষ্ট হইয়াছে, মহানুভব ভক্ত পাঠক পাঠিকাগণ নিজ নিজ মহত্ত্বগুণে ঐ সমস্ত পরিবর্জ্জন বা সংশোধন পূর্ব্বক আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিলেই আমাদের পরিশ্রমের সফলতা এবং ক্ষুদ্র জীবনকে ধন্য মনে করিব।

নানাদেশে ভ্রমি প্রভু যে যে লীলাখেলা।
আচরণ করি সব জীবে শিক্ষা দিলা॥

সেই সব লীলা হয় অপার অনন্ত।
সহস্র বদনে বর্ণি নাহি পায় অন্ত॥
জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি মুঞি কি পারি বর্ণিতে।
এক কণা স্পর্শ করি আপনা শোধিতে॥
আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষীগণ।
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ॥
তৈছে আত্ম পবিত্রিতে যে লিখিলুঁ।
সাগরের মাঝে যেন এক কণ ছুঁইলুঁ॥
আমি লিখিয়াছি এই মিথ্যা অভিমান।
কভু যেন হৃদয়েতে নাহি পায় স্থান॥
কাষ্ঠ পুত্তলিকা সম আমার শরীর।
মন বুদ্ধি চিত্ত সদা চঞ্চল অস্থির॥
একমাত্র মহৎকৃপা শক্তির প্রভাবে।
আপনি হইল যাহা কিছু আবির্ভাবে॥
নবদ্বীপদাদার পদ হৃদয়েতে ধরি।
সমাপ্তি করিলুঁ লীলায় নমস্কার করি॥

———

সদ্ভক্তানাং পরমকরুণাবারিধীনামিয়ং হি,
আচার্য্যাণাং সতকৃপয়া যত্নতঃ সংগ্রহাদ্বা।
নানালীলাজলধিমথনাদুত্থিতা সারগর্ভা,
সর্ব্বেষাং বৈ **সুচরিত-সুধা** চেতসাং প্রীতয়েঽস্তু॥ ১॥
স্বতোঽমৃতকথেয়ং হি সুধানিষ্যন্দিনী শুভা।
লেখনীস্পর্শদোষাত্তু নানাদোষসমাশ্রিতা॥ ২॥

দোষা হ্যপি গুণায়ন্তে সুজনে পতিতা যতঃ ।
যথা মেঘে স্থিতং স্বাদু বারিধে র্লবণং জলম্ ॥ ৩ ॥

গুরুপ্রসাদাৎ সুজনপ্রসাদাৎ,
মহৎপ্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদাৎ ।
গৌরাবধূতস্য কৃপাপ্রসাদাৎ,
সমাপ্তমাপ্তং হি সুধাচরিত্রম্ ॥ ৪ ॥

ইতি ষষ্ঠ খণ্ড ।

সমাপ্তেয়ং শ্রীচরিতসুধা ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ।

পরিশিষ্ট

—:*:—

যথাসময়ে অপ্রাপ্তি বশতঃ শ্রীচরিতসুধার মধ্যে যে যে লীলা সন্নিবেশিত হয় নাই সেই সেই লীলাকাহিনী।

মঙ্গলাচরণ

সন ১৩০৫ কিংবা ১৩০৬ সালে শ্রীশ্রীমদ্ বাবাজী মহাশয় নবদ্বীপদাদা, প্রেমদাদা, কুঞ্জদাদা, ললিতাদাসী, রসরঙ্গিণী সখী প্রভৃতি পাঁচ ছয়জনকে সঙ্গে লইয়া রাধারমণ কুঞ্জমঠে থাকেন। ঝাঁজপীটা মঠের সেবার ভার কুসুমমঞ্জরীদাসী সখীর উপরে দেওয়া হইয়াছে। রাধারমণ কুঞ্জে এক সের চাউল রান্না হইয়া শ্রীশ্রীরাধারমণ দেবের ভোগ হয়। বাবাজী মহাশয়ের সেবার পরে বাহিরের নানারূপ ভক্তগণ আসিয়া অধরামৃত পান; সুতরাং অন্যান্য সকলেই ঝাঁজপীটা মঠে গিয়া মহাপ্রসাদ সেবা করেন। সে স্থানের বৈষ্ণবসেবার পর অধরামৃতসহ কুসুমমঞ্জরী দাসী একটি পারশ লইয়া কুঞ্জমঠে আসেন এবং সখী তিনজনে মিলিয়া উহা সেবা করেন। রাধারমণ কুঞ্জে একযোগে তিনখানি খড়ের ঘর। একখানিতে ঠাকুর থাকেন, একখানিতে রান্না হয়, এবং অপর খানিতে বাবাজী মহাশয় থাকেন। একদিন অতি প্রত্যূষে স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক বাবাজী মহাশয় ললিতাদাসীকে বলিলেন,—"দেখ, আমি জগন্নাথ দর্শনে যাইতেছি, যত সত্বর হয়

আসিব। ইতিমধ্যে আমার থাকিবার ঘর হইতে যাবতীয় দ্রব্যসকল বাহির করিয়া বেশ পরিষ্কারভাবে ধৌত করতঃ ধূপ ধুনা দ্বারা সুধূপিত কর এবং নূতন একখানি কুশাসন, নূতন পাত্রে একটী ঘৃতপ্রদীপ, একটী নূতন কলম; কিছু কাগজ, একটী পিতল বা তাম্রপাত্রে কিছু আলতার কালী রাখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দাও। আমি না আসিলে ঐ ঘর খোলা হইবে না।" বলিয়া জগন্নাথ দর্শনে গমন করিলেন। ললিতাদাসী ইঁহার আদেশানুরূপ সকল কার্য্য করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। যথা-সময়ে ইঁনি আগমনপূর্ব্বক উক্ত গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। নবদ্বীপদাদা প্রভৃতি অনেকেই কোনও একটী অভিনব রত্ন পাইবার আশায় বারান্দায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বেলা প্রায় বারটা—এই সময় হঠাৎ দরজায় একটু শব্দ হইলে সকলে শশব্যস্তে দরজায় হাত দিবামাত্র খুলিয়া গেল। ইনি কিন্তু উদাসপ্রাণে আসনেই বসিয়া আছেন। একটু বিস্মিত ভাবে সকলেই ইঁহার নিকট গমন-পূর্ব্বক কেহ বাতাস করিতে কেহ অন্য ভাবে ইঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তখন নবদ্বীপদাদা একটু মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কই কি প্রাপ্তি হইল?"

বাবাজী। মনে অনেকরূপ সঙ্কল্প উঠিয়াছিল; কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা হইল না।

নবদ্বীপ। কেন প্রভুর ইচ্ছা হইল না?

বাবাজী। মঙ্গলাচরণ হইতে না হইতেই শ্রীগুরুদেবের নিষেধ আজ্ঞা হইল।

নবদ্বীপ দাদা "কি মঙ্গলাচরণ হইল দেখি" বলিয়া কাগজখানি পড়িতে লাগিলেন, যথা—"জয় জয় নিত্যানন্দ বসু-জাহ্নবা-জীবন। জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ নিতাইরমণ॥" ইত্যাদি।

হায় হায়! আমরা আশা করিয়াছিলাম যে ইহার পর হয় ত প্রেমভক্তিরস-সিদ্ধান্ত-মূলক অথবা লীলারস সম্বলিত কোনও অমূল্য রত্ন পাইব। হায়! আমরা দুর্ভাগা এবং অনধিকারী, তাই বুঝি পরম গুরুদেব নিষেধ করিলেন। নবদ্বীপদাদা প্রমুখ অনেকেই পুনর্ব্বার শ্রীগুরুদেবকে জানাইয়া তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিবার জন্য বাবাজী মহাশয়কে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলে ইনি বলিলেন—দেখ আমি এ বিষয়ে বহুচেষ্টা করিয়াছি ; কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণ অমত। তিনি বলিলেন, —'প্রেমভক্তি, রস, লীলা, বিলাসাদি সর্ব্বসাধারণের জন্য নহে। অধিকারী অনধিকারী ভেদে উহা উপদিষ্ট না হইলে অনর্থ ঘটিয়া থাকে। উহা কেবল গুরুমুখেই শ্রোতব্য। লিখিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে উহা হইতে নানারূপ মত নানারূপ পথ বাহির হইয়া কেবল উপধর্ম্মের বৃদ্ধি করা ছাড়া উপকার হইবার আশা খুব কম। তাই বলি কোনও উপযুক্ত পাত্রে ন্যস্ত কর, তোমার আশা ফলবতী হইয়া জগতের অশেষ মঙ্গল বিধান করিবে।' সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহাকে পুনর্ব্বার অনুরোধ করা যুক্তিসঙ্গত নহে।" ইহার কথা শুনিয়া নবদ্বীপদাদা প্রভৃতি সকলেই বিমনা ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আমরাও অগত্যা সেই মঙ্গলাচরণটীই শ্রীচরিত-সুধার পরিশিষ্টে বাহির করিতে বাধ্য হইলাম।

জয় জয় নিত্যানন্দ বসু-জাহ্নবা-জীবন
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ নিতাই রমণ॥
জয় জয় সীতানাথ জীব-শিবধাম।
জয় জয় গদাধর গৌর যাঁর প্রাণ॥
জয় জয় শ্রীবাস মুরারি নরহরি।
জয় জয় হরিদাস দেহ চরণতরি॥

জয় জয় দ্বাদশ গোপাল চৌষট্টি মহান্ত।
জয় জয় প্রভু সঙ্গে বৈষ্ণব অনন্ত॥
জয় জয় রূপ গোসাঞি আর সনাতন।
জয় জয় ভট্ট যুগ শ্রীজীব জীবন॥
জয় জয় রঘুনাথ দাস দেহ শ্রীচরণ।
জয় জয় লোকনাথ লোকের জীবন॥
জয় জয় শ্রীনিবাস গোপী-ভাব-দাতা।
জয় জয় রামচন্দ্র প্রেম-সেবায় মাতা॥
জয় জয় নরোত্তম নরোত্তমে বুঝাইতে।
জয় জয় প্রেমভক্তি রাখিলেন জগতে॥
জয় জয় ত্রিকাল সত্য বৈষ্ণব মহান্ত।
জয় জয় বর্ণাশ্রমে ব্রাহ্মণ অনন্ত॥
জয় জয় দীক্ষাগুরু জন্ম নিতাইর বংশে।
জয় জয় প্রেমময় প্রেম পরকাশে॥
জয় জয় প্রেমের বন্যায় সরযূ উথলে।
জয় জয় গুরুকৃপা এ অধমে মিলে॥
জয় জয় শিক্ষাগুরু গৌরহরি নাম।
জয় জয় নবদ্বীপে ভজনের স্থান॥
জয় জয় গুরুদেবের গুরু জগন্নাথ।
জয় জয় ভক্তি যজী জীবের প্রসাদ॥
জয় জয় নবদ্বীপে ভজন কুটীরে।
জয় জয় দিয়া বৈষ্ণব রহে মাধুকরী ক'রে॥
জয় জয় রাঢ় গৌড় মণ্ডল সুরধুনী।
জয় জয় নিতাই গৌর প্রেম চিন্তামণি॥

জয় জয় নীলাচল চন্দ্র জগন্নাথ।
জয় জয় বলরাম সুভদ্রার সাথ॥
জয় জয় সুদর্শন লক্ষ্মী নারায়ণ।
জয় জয় বিমলাদি দেব দেবীগণ॥
জয় জয় নীলাচল মহোদধি।
জয় জয় চক্রতীর্থ বিরজা অবধি॥
জয় জয় পুরীরাজ সহ পাণ্ডা যত।
জয় জয় ভুবনেশ্বর সাক্ষী গোপীনাথ॥
জয় জয় ক্ষীর-চোরা নাম গোপীনাথ।
জয় জয় গম্ভীরা টোটাগোপীনাথ॥
জয় জয় চারিধাম জীব-নিস্তার লাগি।
জয় জয় হরিনাম প্রেম অনুরাগী॥
জয় জয় বৃন্দাবন কন্দর্প-মোহন।
জয় জয় রসময় শ্রীনন্দ-নন্দন॥
জয় জয় রসবতী সুন্দরী রাধিকা।
জয় জয় প্রেমপরা সবার অধিকা॥
জয় জয় ললিতা বিশাখা সখীগণ।
জয় জয় রূপবতী অনঙ্গাদি মঞ্জরীর গণ॥
জয় জয় পৌর্ণমাসী জয় বীরাবৃন্দ।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ সেবা সুখানন্দ॥
জয় জয় রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন।
জয় জয় বৃন্দাবন মদনমোহন॥
জয় জয় শ্রীযমুনা জয় ব্রজবাসী।
জয় জয় দিবানিশি যুগল রূপ রাশি॥

জয় জয় ত্রিকাল সত্য নিত্য বৃন্দাবন।
জয় জয় ভাব প্রেম রস নিরূপণ ॥
জয় জয় প্রেমের নিত্যত্ব ভুবি বৃন্দাবনে।
জয় জয় প্রেমদাতা শ্রীশচীনন্দনে ॥
জয় জয় অনর্পিত প্রেম সুধা দানে।
জয় জয় প্রেম বিনা নাহি পাবে ত্রাণে ॥
জয় জয় চিচ্ছক্তি প্রথম প্রকাশ।
জয় জয় মায়া শক্তি মুগ্ধ দাসী দাস ॥
জয় জয় জীবশক্তি সকল ব্যাপিয়া।
জয় জয় সীমাবদ্ধ জীব ব্যাপ্য হইয়া ॥
জয় জয় রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ।
জয় জয় ধাবিত হইয়া সতৃষ্ণ ॥
জয় জয় স্থাবর জঙ্গমাদি চরাচর।
জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও বিশ্ব পরাপর ॥
জয় জয় স্বরূপ স্বভাব ভাব ইচ্ছা অহঙ্কার।
জয় জয় পুরুষ প্রকৃতি তত্ত্ব লীলার প্রচার ॥
জয় জয় বিরজা পার গোলক হইতে।
জয় জয় নির্গুণ হরি গুণ বিস্তারিতে ॥
জয় জয় বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মলোক কৈলাস সহিতে।
জয় জয় ত্রিগুণ দ্বারা জগৎ শাসিতে ॥
জয় জয় স্বর্গ মর্ত্ত পাতালাদি ত্রিকাল অবস্থিতি।
জয় জয় দেব নর নানা দেহে জীবের বসতি ॥
জয় জয় ত্রিগুণের বসে দাস দাসী ভাবে।
জয় জয় জগতে বৈসেন আপন স্বভাবে ॥

জয় জয় সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ নাম পুরাণে প্রকাশ।
জয় জয় সৃষ্টি স্থিতি সময়ে বিনাশ॥
জয় জয় ন্যূনাধিক গুণের প্রকাশে।
জয় জয় সৃজে পালে কেহ বা বিনাশে॥
জয় জয় ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুদ্ব্যোম।
জয় জয় স্রষ্টা সৃষ্টি কেহ নহে কম॥
জয় জয় বৈকুণ্ঠ বিষ্ণুর বসতি হইতে।
জয় জয় কীট পতঙ্গ স্থাবর জঙ্গম যত জগতে॥
জয় জয় উপাসনার দেবদেবীগণ।
জয় জয় স্বতন্ত্র পূজা করেন গ্রহণ॥
জয় জয় প্রসন্নতা তাঁদের হইলে।
জয় জয় জীব-আদির কর্ম্মফল মিলে॥
জয় জয় গুণ কর্ম্মফল নিরূপণ।
জয় জয় কর্ম্মফলে ভোগ হেতু গমনাগমন॥
জয় জয় ধর্ম্মাধর্ম্ম হয় ফল ভোগের নিমিত্ত।
জয় জয় স্বর্গনরক ভোগাভোগ ফলের মাহাত্ম্য॥
জয় জয় কর্ম্ম ত্যাগ মুক্তির লাগিয়া।
জয় জয় নিরাকারে নির্ব্বাণ সোঽহং ব্রহ্ম হৈয়া॥
জয় জয় সালোক্যাদি মুক্তি চতুষ্টয়।
জয় জয় দেব দেহে স্থাবর দেহে বসতি করয়॥
জয় জয় আত্মারাম যোগেতে চিন্তন।
জয় জয় জীব আত্মা পরমাত্মার মিলন॥
জয় জয় জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির সাধন।
জয় জয় নবধা ভক্তি অর্চ্চন বন্দন॥

জয় জয় দ্বাদশ রসে প্রাপ্তি ভগবানে।
জয় জয় গৌণ মুখ্য পুরাণে প্রমাণে॥
জয় জয় গৌণ সাত বিভাবের প্রাপ্তি।
জয় জয় অসুর রাক্ষসকায় মহাপাপে মতি॥
জয় জয় মুখ্য পঞ্চরস ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
জয় জয় বাসুদেব দেবক্যাদি ও মহর্ষির গণে॥
জয় জয় ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য রসের প্রচারে।
জয় জয় স্বাদাধিক্য শুদ্ধ মাধুর্য্য রস ব্রজপুরে॥
জয় জয় রসের বিচার পর পর রসে।
জয় জয় শান্ত দাস্যাদি মধুরেতে বৈসে॥
জয় জয় গোপীভাব ভাবামৃত সার।
জয় জয় রাধা প্রেম সাধ্য সাধন পার॥
জয় জয় সখী মঞ্জরী পৌর্ণমাসী।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণলীলা রস সেবা দিবা নিশি॥
জয় জয় ব্রজলীলা তত্ত্বের অবধি।
জয় জয় তত্ত্ব লাভে ছাড়ে বেদ বিধি॥
জয় জয় কলিযুগ সর্ব্বযুগসার।
জয় জয় কলিরাজ শাসন তোমার॥
জয় জয় কলি চলে জীবেরে শাসিতে।
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ এলেন জগতে॥
জয় জয় সপার্ষদে নিতাই গৌরাঙ্গ।
জয় জয় জীব উদ্ধার প্রেমের তরঙ্গ॥
জয় জয় যখন যাহা হেরি তাহা মঙ্গলাচরণ।
জয় জয় মানসে উদয় রহু মঙ্গলাচরণ॥

কাঙ্গাল সুরেনের কাহিনী

এই ঘটনাটি সম্বন্ধে সুরেন দাদা যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই এই স্থানে উদ্ধৃত করা হইল :—

পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধারমণ দেবের সুধাময় পবিত্র জীবন-চরিত পঞ্চমখণ্ড পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া অতীব তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। কিন্তু তৃষ্ণা যেন ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। যখনই পাঠ করি তখনই মনে হয় যেন চোখের উপর সেই আনন্দময় মূর্ত্তিটী নাচিতেছেন। এখনও তাঁহার সেই লীলাকথা শুনিতে ও কহিতে মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। তাই এ অধম সেই করুণাময়ের লীলাখেলার যাহা যাহা প্রত্যক্ষ দর্শন ও অনুভব করিয়াছে, আজ তাঁহারই একমাত্র কৃপাবলম্বন করিয়া সেই সেই ঘটনাবলির কিয়দংশ সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। যদি ভক্তপাঠকগণ অধমের এই সামান্য বিবরণটি পাঠ করিয়া কিছু আনন্দ উপভোগ করেন তবেই নিজেকে ধন্য মনে করিব।

আমার নাম শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। বাবাজী মহাশয় আমাকে কখনও 'কাঙ্গালী মহাপ্রভু' কখনও বা 'কলির বিপ্র' বলিয়া ডাকিতেন। আমি কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে। অল্প বয়সে মাতৃহীন, সুতরাং আমাকে একপ্রকার নিরাশ্রয় বলিলেই হয়। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে কটকের একজন খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যার সহিত আমার বিবাহ হয়। শ্বশুরবাড়ী থাকিয়াই আমি ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতাম। আমার বিবাহের দুইবৎসর পরে শ্রীযুক্ত বড় বাবাজী মহাশয় যখন সদলে কটক আগমন করিয়া শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ পালিতের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় একদিন বেলা দ্বিপ্রহরের

সময় আমার পরমপূজনীয়া শ্বশ্রূমাতা ঠাকুরাণী বলিলেন,—"দেখ বাবা! পুরী হইতে একজন মহাপুরুষ আসিয়াছেন, তোমরা দেখিতে যাইবে কি?" শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ আমি ও আমার দাদা (ভায়রা ভাই) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উভয়ে তাঁহার দর্শনে চলিলাম। কৃষ্ণবাবুর বাড়ীটী আমার শ্বশুরবাড়ীর নিকটবর্ত্তী। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখি যে দোতলার উপরে একটী বড় হলঘরে চতুর্দ্দিকে ভক্তমণ্ডলী পরিবেষ্টিত, আনন্দময় প্রশান্ত মূর্ত্তি আজানুলম্বিত ভুজ, সুদীর্ঘ, স্থূলকায়, উজ্জ্বল শ্যামকলেবর, প্রেমবিগলিত-নেত্র একটী মহাপুরুষ বসিয়া আছেন। যে যাইতেছে তাহাকেই তিনি মধুর সম্ভাষণে বসাইতেছেন তাঁহার সেই সুধাময় কথা শুনিয়া আমার মনে হয় যে এমন বিনয়ের খনি ত কখনও এ রাজ্যে দেখি নাই। তাঁহার ভাষাও যেমন সরল, কথাগুলিও সেইরূপ মিষ্টি। অতি অল্পক্ষণ তাঁহার সঙ্গ করিলে অত্যন্ত তাপদগ্ধ প্রাণও শীতল হইয়া যায়। আমি প্রায় দুইঘণ্টা কাল সেস্থলে থাকিয়া সেদিনকার মত তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু মন যেন কেমন হইয়া গেল। সেদিন আর অন্য দিনের মত পাঠে মনোনিবেশ করিতে পারিলাম না। কিছুই আর ভাল লাগিতেছে না। কতক্ষণে পুনরায় তাঁহাকে দর্শন করিব, এই চিন্তায় আমার মন ব্যাকুল হইয়া পড়িল। বলিতে কি, তাঁহার কৃপাপ্রভাবে সে রাত্রে স্বপ্নাবস্থায়ও সেই মধুর মূর্ত্তিখানি আবার দেখিলাম। পরে প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর সঙ্গ করিয়া ইঁহার কত রকম বেশ ও কত রকম রূপ দর্শন করিয়াছি; কিন্তু সেই শুভদিনে শুভক্ষণে এ দীনের প্রতি কৃপা করিয়া ইঁনি যেরূপভাবে দর্শন দিয়া আমার জন্ম জীবন সফল করিয়াছিলেন, সেই আনন্দময় মূর্ত্তিখানি যেন চিরতরে আমার হৃদয়ের চিত্রপটে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

সেইদিন হইতে এই ২৪/২৫ বৎসরের মধ্যে কতস্থানে বেড়াইলাম, কত কি দেখিলাম, আমার নিজ জীবনেরও কত কি পরিবর্ত্তন হইল, এমন কি পুত্রের পিতা পর্য্যন্ত হইলাম, কিন্তু প্রভুর কৃপার বলিহারী যাই, মুহূর্ত্তের জন্যও সেই দেবমূর্ত্তিখানি হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়া অন্য কাহাকেও স্থান দিতে পারি নাই।

যাহা হউক, পরদিন প্রভাত হইতে না হইতেই তথায় গিয়া দেখিলাম—একটী ঘরের মধ্যে উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন হইতেছে ; বাবাজী মহাশয় ভাবে বিভোর হইয়া দরজার নিকট দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার দু'টী নয়নকমল হইতে অবিরল অশ্রুধারা বহিতেছে ও মধ্যে মধ্যে সেই দিব্য কলেবর-খানি পুলকে কম্পমান হইতেছে। সেখানে যাইবামাত্র ইঁনি আমাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া শক্তি সঞ্চার করতঃ ভিতরে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় নিঃসঙ্কোচে গিয়া নৃত্য করিতে লাগিলাম। ইতিপূর্ব্বে আমি কখনও সংকীর্ত্তনসুখ আস্বাদন বা নৃত্য কাহাকে বলে জানিতাম না। এই ঘটনার দুইদিন পরে পরম দয়াল পতিতপাবন প্রভু অযাচিতভাবে দীক্ষামন্ত্র প্রদান-পূর্ব্বক এ দাসকে চিরদিনের জন্য কিনিয়া লইলেন। সেই শুভমুহূর্ত্তেই যেন এক নবজীবন লাভ করিলাম। আমার বলিতে আর কিছুই রহিল না। আমি ও আমার নগেনদাদা একদিনেই দীক্ষিত হইলাম। তখন হইতেই শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমরা সৎসঙ্গে থাকিয়া ও সদ্‌গ্রন্থাদি আলোচনা করিয়া পরমানন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলাম। বাবাজী মহাশয় যথাসময়ে পুরী গমন করিলেন। পুনরায় কতদিনে আসিবেন, কতদিনে ইঁহার দর্শন পাইব এই উৎকণ্ঠায় আমাদের মন অস্থির হইতে লাগিল।

প্রায় সর্ব্বদাই বাবাজী মহাশয় ও ইঁহার সঙ্গীগণের সেই অপ্রাকৃত

সুমধুর সরল ব্যবহার, উঁহাদিগের শ্রীমুখে মনপ্রাণ-মাতান হৃদয়-গলান "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" নাম গান, নবদ্বীপ দাদা ও বটু দাদা প্রভৃতি বৈবষ্ণবগণের সেই সৌম্য মূর্ত্তি এবং তাঁহাদের মধুর সম্ভাষণ প্রভৃতি মনে হইয়া যেন আমাকে কেমন এক প্রকার করিয়া তুলিত। আবার এক এক সময় ললিতাদিদির সেই অলৌকিক গুরুসেবা ও অবিচলা ভক্তি নিষ্ঠার কথা ভাবিয়া মনে করিতাম যে কোন পতিব্রতা সাধ্বী রমণীও বুঝি এমন করিয়া স্বামি-সেবা করিতে পারে না। অনেক সময় আমি ও নগেনদাদা পরস্পর এই সমস্ত বিষয়ের সমালোচনা করিতাম। কিছুদিন পরে একবার সঙ্গীগণ সহ বাবাজী মহাশয় কটক আসিয়া শ্মশানের নিকট একটী ছাড়া বাড়ীতে অবস্থান করিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই সংবাদ কটক সহরে ছড়াইয়া পড়িল। তখন প্রত্যহ রাত্র ৮টার পর আমি ও নগেনদাদা ঐ সুধাময় সঙ্গ করিতে আমাদের শ্বশুরবাড়ী হইতে প্রায় আড়াই মাইল পথ হাঁটিয়া ঐ নির্জ্জন স্থানে ইঁহার সহিত মিলিত হইতাম। প্রায় সারা রাত্রি সংকীর্ত্তনানন্দে ও সদালাপে কাটিয়া যাইত। এইরূপভাবে প্রত্যহ রাত্রে আমরা এবং অনেকগুলি কটক স্কুল-কলেজের ছাত্র সহর হইতে আসিয়া বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গসুখ উপভোগ করিতাম। ঝড় হউক বৃষ্টি হউক আমি ও নগেনদাদা বাবাজী মহাশয়ের সেবার জন্য কিছু খই ও দুধ লইয়া যাইতাম। কিন্তু যখন শেষ রাত্রে আমরা বাসায় ফিরিতাম, তখন আমার বুক দুর দুর করিত; কারণ আমাদিগকে অতি সন্তর্পণে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে হইত। অধিকাংশ সময় কমলাদিদি (নগেনদাদার স্ত্রী) আমাদিগকে একার্য্যের সহায়তা করিতেন। যে বাড়ীতে বাবাজী মহাশয় ছিলেন, ঐ বাড়ীখানি এক প্রকার জঙ্গলের মধ্যে বলিলেই হয়—চতুষ্পার্শ্বে বহুদূর

পর্য্যন্ত জনমানবের বাস ছিল না। একদিন রাত্র প্রায় দেড়টার সময় বাবাজী মহাশয় প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন, একখানি বড় পাথরের থালায় অন্নপ্রসাদ ও তাহার চারিদিকে ১০।১১টি বাটি ও দুইখানি রেকাবে নানাবিধ ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদি এবং নানা প্রকারের ফল রহিয়াছে। তিনি আমাকে পরিহাস করিয়া কহিলেন, তোর শ্বশুর ত বড় উকীল, তাঁহাকে এত ভাল ভাল দ্রব্য একসঙ্গে খাইতে দেখিয়াছিস? আমরা ভিখারী, নিতাই চাঁদের দাস—ভ্যাখ! প্রভুর কৃপায় এত দ্রব্য আসিয়াছে।" আমি মনে ভাবিলাম, 'তাই ত এত প্রকার উপাদেয় দ্রব্যসামগ্রী কোথা হইতে কে এস্থানে আনিল! কোন ধনীলোকের পক্ষেও এক সময়ে এতগুলি জিনিষ সংগ্রহ হওয়া অসম্ভব!' সেই সুখময়-রজনীর কথা অধিক আর কি বলিব, তাহার সহিত তুলনায় নবদম্পতীর শুভরাত্রি প্রভৃতির সুখ যেন নগণ্য বলিয়া মনে হয়। প্রত্যহ সহরে ফিরিবার সময় সকলে মিলিয়া "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" নাম করিতে করিতে আসিতাম। এইরূপে প্রায় তিনমাস কাল আমরা রাত্রি জাগরণ করিয়া দিনে স্কুল-কলেজ করিতাম; কিন্তু সেই শান্তিদাতা প্রভুর কৃপায় কখনও আমরা ক্লান্তি অলসতা বোধ করি নাই। হঠাৎ যেদিন বাবাজী মহাশয় সেখান হইতে রওনা হইলেন, আমরা এতদিনের সুখভোগের পর তাঁহার বিচ্ছেদ জনিত দুঃখে একেবারে অধীর হইয়া পড়িলাম।

আমাদের দীক্ষাগ্রহণের পর অতি অল্পকালের মধ্যেই আমার শ্বশুর মহাশয়ের একটী বালিকা কন্যা রাত্রে স্বপ্নে দেখিল যে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিতেছেন, "দেখ, তোদের বাড়ীর অমুক স্থানে একটী বাল-গোপাল মূর্ত্তি আছেন, তাঁহাকে উঠাইয়া পূজা করিতে বলিস্।" সেই রাত্রে নগেনদাদাও স্বপ্নাদেশে জানিতে পারিলেন যে ঐ বাড়ীতে একটী

ঠাকুর আগমন করিবেন। যাহা হইক, পরদিন মেয়েটির কথানুসারে সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানের মৃত্তিকা অল্পমাত্র খোদিত করিলে সেই শ্রীমূর্ত্তিটি বাহির হইলেন ও আমার শ্বশুর মহাশয় খুব ধুমধামের সহিত সেই মূর্ত্তিটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করাইয়া তাঁহার দোতলার একখানি নূতন ঘরে স্থাপন করাইলে নগেনদাদা বিশেষ যত্নাগ্রহ সহকারে বিধিপূর্ব্বক গোপালের সেবা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পূজা করিতে করিতে যেরূপ বিধি পদ্ধতি অনুসারে ঠাকুর সেবা চলিতেছিল, তাহার এক একটি করিয়া বিধি ছাড়িয়া যাইতে লাগিল। কিছুদিন পরে নগেনদাদাকে বিশেষ কোন কার্য্যোপলক্ষে দেশে যাইতে হয়, তখন হইতে ঐ পূজা আমাকে করিতে হয়। দীক্ষা লইবার পর হইতেই আমার ও নগেনদাদার মাছ খাওয়া আপনা আপনি ছাড়িয়া যায়। আমি বালক স্বভাব বশতঃ বাবাজী মহাশয়কে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারা কেন মৎস্যাদি ব্যবহার করেন না ?"

তিনি প্রথমে আমাকে পরিহাস করিয়া বলিলেন, "বাবা ! আমাদের জিহ্বার আস্বাদন-সুখ থাকিলে, রোজ রোজ কে ওসব যোগাইবে ?" পরে একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমরা কৃষ্ণপ্রসাদ ভিন্ন অন্য কিছু গ্রহণ করি না, ওসব তমোগুণসম্পন্ন দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণের ভোগে লাগে না। আরও ভাবিয়া দেখ, জগতে এত দ্রব্যসামগ্রী থাকিতে কোন জীবহিংসা করিয়া নিজ রসনার পরিতৃপ্তি করা সঙ্গত কি না ! যেহেতু বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা করে না ; সুতরাং তামসাহার করিলে উত্তরোত্তর তমোগুণেরই বৃদ্ধি হয়। এইরূপ আহারের দ্বারা দেহের পুষ্টি সাধন হইলেও সে শরীরের দ্বারা ভগবদ্ভক্তি জাত হইতেই পারে না ; বরং ঐ শুদ্ধ পথে অগ্রসর হওয়ার বিঘ্নই জন্মাইতে পারে" ইত্যাদি।

নগেনদাদার স্ত্রী কমলাদিদি ও আমার স্ত্রী প্রথম হইতেই গোপালের সেবার কার্য্যের সহায়তা করিতেন। যদিও ইঁহারা তখনও দীক্ষা গ্রহণ

করেন নাই, ঐ শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিয়া ও নবদ্বীপ দাদার উপদেশমত সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া ক্রমেই উহাদের মাছ খাওয়ার প্রতি অপ্রবৃত্তি বাড়িতে লাগিল ও পরিশেষে ইহারাও মাছ খাওয়া ছাড়িল। দেখিয়া শুনিয়া বাড়ীতে ও পাড়ায় ভয়ানক আন্দোলন চলিতে লাগিল। আমরা অন্য সঙ্গ ও লৌকিকাচার একপ্রকার পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমূর্ত্তি ও সদ্‌-গ্রন্থের সঙ্গ করতঃ শান্তভাবে দিন যাপন করিতে লাগিলাম। কিন্তু বাড়ীর অপরাপর সকলে আমাদিগকে যেন ঘোর অপরাধীর মত দেখিতে লাগি-লেন। এমনকি স্নেহময়ী জননীও তাঁহার কন্যাদের এই পরিবর্ত্তনে অত্যন্ত অসন্তুষ্টা হইলেন। শ্বশুর মহাশয় যখন শুনিলেন যে তাঁহার বিনা আদেশে তাঁহার কন্যাদ্বয় মাছ ছাড়িয়াছে, তিনি সুবিজ্ঞ হইয়াও হঠাৎ প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করতঃ কমলাদিদিকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, "পুনরায় মাছ ব্যবহার কর, নচেৎ এ বাড়ী হইতে চলিয়া যাও।" কমলাদিদিও পিতার প্রথম আদেশ পালন করিতে না পারিয়া অগত্যা দ্বিতীয় আদেশ অবলম্বন-পূর্ব্বক পিত্রালয় পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন তাঁহাকে-এইভাবে একাকী ছাড়িয়া দিতে আমাদের অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল; সুতরাং আমি ও আমার স্ত্রী তাঁহার সাথী হইলাম এবং ধর্ম্মজগতের সম্বন্ধ যে মায়িক রাজ্যের সম্বন্ধ হইতে দৃঢ়তর তাহা এই প্রথম উপলব্ধি করিলাম। একটু অনুধাবন করিতে স্পষ্টই বুঝিলাম যে এ সব কেবল পরম দয়াল নিতাইচাঁদের ভঙ্গী বই আর কিছুই নয়—"এক কার্য্য করিতে করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত।" এই ঘটনাগুলি আমাদের হিতের জন্য সংঘটিত হইতেছে এবং ইহাই যে আমাদের সাধু গুরু সঙ্গ লাভের একমাত্র সোপান, তাহাতে আর তিলমাত্র সন্দেহ রহিল না। তখন আমার ও কমলাদিদির বয়স প্রায় ১৭।১৮ বৎসর হইবে। কমলাদিদির দুইটি শিশু কন্যা সঙ্গে রহিয়াছে; প্রথমে আমাদের গন্তব্য স্থানের কোনই ঠিক হইল না!

তবে শ্রীগুরুকৃপায় মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে এ জগতের নিয়ন্তা একজন, যখন তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, তখন কোনপ্রকারে বিপদের সম্ভাবনা নাই। এক একবার মনে হইতেছে যদি কোন মতে শ্রীবৃন্দাবনে রাধারাণীর রাজ্যে গিয়া পৌছিতে পারি, তবে আর আমাদের কোন ভাবনা থাকিবে না। আমাদের নিকট মাত্র ৬৷৷৹ টাকা ছিল, তাহা হইতে শিশু দুইটীর জন্য কিছু খাদ্য দ্রব্য কিনিয়া লইলাম। বাজার হইতে ফিরিবার সময় হঠাৎ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র পালিত মহাশয়ের সহিত দেখা হওয়ায় তাঁহাকে ঐ সহর পরিত্যাগ করিয়া যাইবার কারণ অতি সংক্ষেপে বলিলাম। আমরা এই বিপদে শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া "হা নিতাই, জয় নিতাই" বলিতে বলিতে সেই বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। আমার কটকস্থ গুরুভাই কৈলাস, উদয়, সাধু, মদন, হৃষীকেশদাদা প্রভৃতি সকলেই বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের সহিত কিছুদূর আসিলেন। কেহ কেহ বা ষ্টেশন পর্য্যন্তও আসিলেন। ইহা হইতে বুঝিলাম যে আমরা সকলে শ্রীরাধারমণ দেবের সংসারের লোক, আমাদের মায়িক সম্বন্ধ কাটিয়া গিয়াছে—আমাদের বলাবল একমাত্র পরম দয়াল নিতাইচাঁদ।

আমরা ষ্টেশনে পৌছিতে না পৌছিতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মনে হইল করুণাময় নিতাইচাঁদ বোধ হয় তাঁহাকে এ সময়ে আমাদের সহায়তা করিতেই পাঠাইয়াছেন। আমার গুরুভাইদের মধ্যেও কেহ কেহ সাধ্যানুসারে আমাকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিলেন। কৃষ্ণবাবু সেই টাকাগুলি লইয়া বাকী টাকা নিজে দিয়া আমাদের কলিকাতা পর্য্যন্ত টিকিট কিনিয়া দিলেন। আমরা কলিকাতা আসিয়া একজন ভক্তের বাসায় রহিলাম। সেখান হইতে নগেনদাদাকে একখানি পত্র এবং আমরা শ্রীবৃন্দাবন যাইব কি না এই মর্ম্মে পুরীতে বাবাজী মহাশয়কেও একখানি পত্র দিয়া উঁহার আদেশের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

দয়াময় প্রভু কেবলমাত্র লিখিলেন, "আপন ইচ্ছায় জীব কোটি বাঞ্ছা করে, কৃষ্ণের যেই ইচ্ছা সেই ফল ধরে।"

ঘটনাক্রমে আমাদের আর বৃন্দাবন যাওয়া হইল না। নগেনদাদা আসিয়া কমলাদিদিকে লইয়া খুলনা তাঁহার মাতুলালয়ে গেলেন। সেখানে গিয়া বিজাতীয় সঙ্গে তাঁহাদের নানা প্রকার অসুবিধা হইতে লাগিল। তিনি সেখানে তিনমাস থাকিয়া সেখান হইতে পুরী পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তা পায় হাঁটিয়া পুরীতে উপস্থিত হইয়া বাবাজী মহাশয়ের নিকট সমস্ত জ্ঞাপন করার পর তিনি বলিলেন—"আমার মতে তোমরা একমাত্র জগন্নাথ দেবের উপর নির্ভর করিয়া পুরীতে চলিয়া আইস।" নগেনদাদা গুরু-বাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক খুলনা গমন করতঃ তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা দুটীকে লইয়া আমাদের কলিকাতার বাসায় আসিলেন। আমি তখন এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া কলিকাতা মেট্রোপলিটান কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছি। নগেনদাদা যখন বলিলেন যে গুরুদেব শীঘ্রই গোদাবরীর দিকে যাইবেন, তখন তাঁহার দর্শনলালসায় আমার প্রাণ ব্যাকুল হইল। আমি কাতরভাবে আমার অভিভাবককে বলায় তিনি পুরী যাওয়ার সম্মতি দিলেন। তখন আমি ও আমার স্ত্রী মাত্র দুইখানি করিয়া কাপড় সঙ্গে লইয়া নগেনদাদার সহিত পুরী রওনা হইলাম। আমরা সকলে বিনা সম্বলে পুরীতে গিয়া ঝাঁজপীটা মঠে উঠিলাম। সে মঠটী নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের বিরক্তাশ্রম; সেখানে স্ত্রীলোকের থাকিবার ব্যবস্থা নাই; কাজেই আমাদিগকে সেস্থান ছাড়িয়া কুণ্ডাই বেণ্ট সাহিতে একটী কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। পাঁচ সাত দিনের মধ্যে আমাদের কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার কথা ছিল। কিন্তু বাবাজী মহাশয়ের সুখময় সঙ্গ ছাড়িয়া কিছুতেই কলিকাতায় ফিরিতে মন চাহিল না। তিনি আমাকে বলিলেন,—"দেখ সুরেন, সংসারে ফিরিয়া যাও ও বাপ ভাইয়ের অনুগত থাকিয়া যথাসাধ্য

নাম মন্ত্র স্মরণ করিও।" নতুবা সমস্ত ভার নিতাইচাঁদের উপর দিয়া তুমি একাকী শ্রীবৃন্দাবন বা নীলাচলে থাকিয়া ভজন কর ; কিন্তু দু'নৌকায় পা দিলে কষ্ট ভোগ হইবে।" কিন্তু হায়! আমার দ্বারা গুরুদেবের এই উভয় আদেশের কোনটাই পালিত হইতে পারিল না, একমাত্র ইঁহার সঙ্গ-সুখ ছাড়া তখন আমার জীবনের অন্য কোনই লক্ষ্য ছিল না, ব্রজের ভজন কি তাহাও জানি না, কেবলমাত্র ইঁহার সঙ্গ ভাল লাগে তাই রহিলাম। আর আমার কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়া হইল না। আমাদের এতগুলি লোকের তখন গ্রাসাচ্ছাদন কি ভাবে চলিত তাহা শ্রীশ্রীগুরুদেবই জানেন। অবশ্য তখন আমরা কোন দিনের জন্য কোন অভাব বোধ করি নাই। এই সময় একদিন নগেনদাদা বাজারে যাইতেছেন দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—"কিছু ভিজে মহাপ্রসাদ আছে, লবণ ও কিছু তেঁতুল আনিতে যাইতেছি।" আমি বলিলাম—"দাদা! মহাপ্রসাদ যদি সুমিষ্ট করিয়া খাইতে হয় তবে আমাদের ফিরিয়া যাওয়াই ভাল।" এই কথা শুনিয়া তিনি একটু লজ্জিত হইলেন। আর বাজারে যাওয়া হইল না, পরম দয়াল প্রভুর কৃপায় মহাপ্রসাদের মহিমা যৎকিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম হওয়ায় বিনা উপকরণে অতি মধুর বোধ হইতে লাগিল। এইরূপভাবে বাবাজী মহাশয়ের সুখময় সঙ্গে তিনমাস কাটিয়া গেল। পরে বাবাজী মহাশয়ের আদেশে আমি একাকী কলিকাতায় আসিয়া কলেজ হইতে নাম উঠাইয়া কটক কলেজে ভর্ত্তি হইলাম। কটকে হৃষীকেশদাদার সহিত এক বাসায় রহিলাম। মনের উদ্দেশ্য কলেজেও পড়িব, মধ্যে মধ্যে বাবাজী মহাশয় এবং তাঁহার সঙ্গীগণের সঙ্গও করিব। হৃষীকেশদাদার সহিত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিয়া ইংরাজীতে আমার রুচি কমিয়া আসিল। অল্পদিনের মধ্যে হৃষীকেশদাদার বৈরাগ্য হওয়ায় তিনি চাকরি ছাড়িয়া পুরীতে চলিয়া গেলেন। এই সময় আমি একাকী

থাকি ও প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যার সময় ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীশ্রীরাসবিহারী মঠে মিলিত হই। কলেজ বন্ধ হইলেই পুরীতে বা অন্য যেখানে বাবাজী মহাশয় থাকেন সেখানে ছুটিয়া যাই। এইরূপে প্রায় বৎসরাবধি কাটিয়া গেল।

হঠাৎ একদিন পুরী হইতে টেলিগ্রাম আসিল—'বাবাজী মহাশয় উন্মাদ হইয়াছেন।' এই সংবাদ পাইবামাত্র মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। কারণ সেই অসাধন চিন্তামণি শান্তিদাতা প্রভু ভিন্ন এ নিরাশ্রয় দীনের যে আপন বলিতে আর কেহই ছিল না। সেই রাত্রের ট্রেনেই আমরা কটকবাসী তাঁহার আশ্রিত বালকগণ পুরীতে রওনা হইলাম। মধ্যে মধ্যে 'হা-নিতাই' ছাড়া আমাদের কাহারও মুখ হইতে অন্য কোন বাক্য নিঃসরণ হইতেছিল না। মনে মনে সেই মঙ্গলময় প্রভুর জন্য শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিকট কত কি প্রার্থনা করিলাম! ভোর হইতে না হইতে ট্রেণ আসিয়া পুরীতে পৌছিলে, আমরা ঝাঁজপিটা মঠে গিয়া দেখিলাম—সেখানে সব যেন হাহাকার করিতেছে। ললিতা-দিদি প্রভৃতিকে স্থানান্তরে রাখা হইয়াছে। বলাইদাদা প্রভৃতি অতি সন্তর্পণে সেখানে চলাফেরা করিতেছেন। আমি যেমন গিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ইঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলাম, অমনি ইনি উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন—"কিরে কলির বিপ্র, এতক্ষণে এলি, তোর যে এখনও মায়া যায় নাই, আমি পাগল হইয়াছি" ইত্যাদি। ইঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন ইঁহার শরীরের আয়তন একটু দীঘল হইয়াছে—রংটীও পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হইয়াছে, সর্ব্বাঙ্গের সৌষ্ঠবও বাড়িয়াছে—এরূপ তেজঃপুঞ্জময় মূর্ত্তি আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, ইঁহাকে দেখিয়া প্রাণ শীতল হইল। ইনি যে কোনরূপ বিকৃতভাবাপন্ন হইয়াছেন এরূপ ধারণা মনে স্থান পাইল না, এই সময় সর্ব্বদাই যেন ইনি ভাবাবেশে নিমগ্ন

হইয়া কেমন আনমনা ও আনন্দময় অবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। দেখিলে বোধ হয় যেন এরাজ্যে নাই। আপনমনে কত ব্রজলীলার কথা বলিতেছেন। সহজে কেহ কিছু খাওয়াইতে পারিতেছে না। এমন কি মহাপ্রসাদ পর্য্যন্তও গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা। একদিন আমি কয়েকখানি আখ একখানি রেকাবে করিয়া লইয়া গিয়াছি। দেখিবামাত্র ইনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরে, কোথা হইতে আনিলি ?" আমি বলিলাম,—"বৃষভানুরাজনন্দিনী তোমার জন্য এই দ্রব্য পাঠাইয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ ঐ আখ চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন,—"তোদের রাজনন্দিনী এখন কোথায় ও কি করিতেছেন ?" আমিও প্রফুল্লচিত্তে ঠিক সময়ানুরূপ উত্তর দিলাম। শুনিয়া বড়ই সুখী হইলেন। এই সময় ইনি যে সমস্ত অলৌকিকী ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যময়ী লীলা খেলা করিলেন তাহা বড়ই মধুর। আমরা অনেক সময় তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি নাই। মধ্যে মধ্যে হাসিয়া হাসিয়া নাচিয়া নাচিয়া হাতে তালি দিয়া বলিতেন,—"যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্বায় পরিণতি, তার শক্তি জীবে দেখাইতে, সেইরূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ় ধন, প্রকট কৈল নিত্যলীলা হইতে।" এই সময় আবেশের ভরে কখন কখন বা নিজ হস্তে গায়ে বিষ্ঠাই লেপন করিতেছেন, কেহ কিছু বলিলে পঞ্চবর্ষীয় বালকের ন্যায় আব্দার করিয়া বলিতেন—"কৈ আমি ত বিষ্ঠা মাখি নাই, এ যে চন্দন !" বাস্তবিকই সুগন্ধি চন্দনের ঘ্রাণে দশদিক্ আমোদিত হইল।

কয়েকদিবস পরে পুলিনদাদা প্রভৃতি ইঁহাকে কলিকাতা লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলে ইনি যাইতে সম্মত হইলেন। পূর্বদিন আমাদিগকে কটক যাইতে অনুমতি করায় আমরা কটক ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু কটক আসিয়া পুনরায় মন অস্থির হইয়া উঠিল। পড়া শুনায় মন লাগিল

না ; এমন কি ঘরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হইল না। বাবাজী মহাশয় কলিকাতা আসিয়া কি ভাবে আছেন ও কি করিতেছেন জানিবার জন্য আমার মনে প্রবল উৎকণ্ঠা হইল। পনের বিশ দিনের মধ্যেই শুনিলাম যে বাবাজী মহাশয় কলিকাতা হইতে পুরীতে একখানি সুদীর্ঘ পত্র পাঠাইয়াছেন ও তাহাতে এ অধমকে ইঁহার নিকট পাঠাইতে আদেশ করিয়াছেন। সংবাদ পাইবামাত্র বইপত্র একটী বাক্সে বন্ধ করিয়া কেবলমাত্র একটী কাপড়ের পুঁটুলি হাতে করিয়া কলিকাতা রওনা হইলাম। পরদিবস ট্রেণ সকালে হাওড়া পৌছিলে আমি ষ্টেশন হইতে হাঁটিয়া বরাহনগর কেদারবাবুর বাগানে আসিলাম। সেখানে আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বসিলাম। হঠাৎ ইঁহার দৃষ্টি আমার কাপড়ের উপর পড়িল। ঐ কাপড়খানিতে কয়েকটা জায়গা সেলাই করা ছিল। তখন ইনি একখানি কাঁচি আনাইয়া তৎক্ষণাৎ সেলাইগুলি কাটিয়া দিলেন ও একটু কাঁদিলেন। লীলাময়ের লীলা বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, কয়েকদিন পরে হারানিধিকে পাইয়া প্রাণে বড়ই শান্তি আসিল। একতিলও আর ইঁহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা হইল না। যখন যে সব লীলা খেলা করিতে লাগিলেন, প্রাণপণে ইঁহার আদেশ অনুসারে দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া ইঁহার লীলার সহায়তা করিতে লাগিলাম। ঐ বাগানে একটী পুষ্করিণী আছে, উহার তিনটী ঘাটকে যথাক্রমে শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীশ্যামকুণ্ড, শ্রীললিতাকুণ্ড নাম রাখিলেন। ইনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীরাধাকুণ্ডের জলে পড়িয়া থাকিতেন ; সাধ্য কি যে কেহ ইঁহাকে ঐ জল হইতে উঠায়। একটী বড় ঘর শ্রীরাধাকৃষ্ণ, পঞ্চতত্ত্ব প্রভৃতি কয়েকখানি বড় বড় অতি মনোহর চিত্রপটে সুসজ্জিত করা হইয়াছে। সেখানে দিন রাত গব্য ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিত। সেই ঘরখানিতে বসিয়া কীর্ত্তন করেন। ঐ ঘরের মেজে প্রত্যহ প্রাতে স্বহস্তে মার্জ্জনা ও ধৌত

করিতেন। আমার কাপড় ছিঁড়িয়া ন্যাতা করতঃ আমি ঘরখানি শুষ্ক করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করি। এইরূপভাবে ক্রমে ক্রমে আমার কাপড় কয়েকখানি শেষ হইয়া অবশেষে একখানি উড়ানি মাত্র সম্বল রহিল। আমি সেইখানিই পরিয়া থাকি। এই সময় ইনি কিন্তু সর্ব্বদাই উলঙ্গ অবস্থায় থাকেন। যদি অনেক মিনতি করিয়া কেহ একখানি ধুতি পরাইয়া যায়, তবে পরক্ষণেই আবার কাহাকেও সেই কাপড়খানি দিয়া দেন। রাত্রে বেশী নিদ্রা হয় না। আহারও অতি কম। গব্যঘৃতের দ্বারাই রান্নাদি হয়। অনেক দুরারোগ্য রোগী ইঁহার নিকট আসিয়া কেবলমাত্র উচ্চৈঃস্বরে নাম ও শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান করতঃ ভাল হইয়া যাইতে লাগিল।

যে সময় রামদাদাকে ভেক দেন, তাহার অব্যবহিত পরেই আমাকে মস্তক মুণ্ডন করিতে আদেশ করেন। উপস্থিত সকলে মনে করিলেন যে বোধ হয় আমারও ভেক হইয়া যাইবে। কিন্তু কৃপাময় প্রভুর অন্যরূপ ইচ্ছা হইল। ইতিপূর্ব্বেই তিনি সাতগাছিয়ানিবাসী কুঞ্জলাল্ গোস্বামীর দ্বারা দুইটী ভাল যজ্ঞোপবীত গ্রন্থি দিয়া রাখিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের উপনয়নের সময় যেরূপ যজ্ঞাদি করা হয়, কুঞ্জ গোঁসাই এর দ্বারা তৎসমস্তই আয়োজন করাইলেন। নিজে এক নূতন পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক একটী যজ্ঞোপবীত গলায় ধারণ করতঃ একজোড়া আসনে উপবেশন পূর্ব্বক নিজ দক্ষিণ পার্শ্বে পৃথক্ আসনে কুঞ্জ গোঁসাইকে বসাইয়া যথাবিধি পূজা আরম্ভ করিলেন। অপূর্ব্ব দৃশ্য! উপস্থিত ভক্তবৃন্দ এই এক নূতন ব্যাপার দর্শনে একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া গেলেন। তৎকালে ইঁহার শরীর হইতে এমন একটী উজ্জ্বলকান্তি বাহির হইতে লাগিল যে, দেখিবামাত্র ঘোর পাষণ্ডেরও মনপ্রাণ বিমুগ্ধ হইয়া যায়। আমার মস্তক মুণ্ডনের পর আমাকে বলিলেন,—"হ্যারে কলির বামুন, যা শীঘ্র গিয়া

শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান করতঃ তোর পৈতাটা কুণ্ডে ফেলিয়া দিয়া আয়, তোর আজ পুনরায় উপনয়ন হইবে।" শ্রবণমাত্র আমি তৎক্ষণাৎ ইঁহার আদেশ পালন করতঃ ফিরিয়া আসিলে আমাকে নিজের বাম পার্শ্বে বসাইয়া নিজে বিধিপূর্ব্বক উপনয়নের মন্ত্রাদি পড়াইতে লাগিলেন। যজ্ঞাদি ক্রিয়া শেষ করতঃ সেই পবিত্র যজ্ঞোপবীতটী আমার গলায় পরাইয়া দিয়ে সামবেদী সন্ধ্যা করাইতে লাগিলেন। আমি সন্ধ্যার মন্ত্রগুলি ইঁহার সঙ্গে সঙ্গে পড়িতেছি, আর যেন আনন্দ-সাগরে ভাসিয়া যাইতেছি। যথাসময়ে কার্য্যাদি শেষ করতঃ ইনি এবং অন্যান্য সকলেই মহাপ্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয়ের কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমার মনে নানারূপ সমালোচনা চলিতে লাগিল। প্রায়ই মনে হয় ইনি কে? সর্ব্বদা ক্রিয়ান্বিত কোন যাজক ব্রাহ্মণগণও পুস্তকের সাহায্য ব্যতিরেকে যে সমস্ত কার্য্য করাইতে সক্ষম হন না, ইনি অনায়াসে চিরাভ্যস্তের ন্যায় সেই সমস্ত কার্য্য মুখে মুখে করাইতেছেন। আবার সামবেদী সন্ধ্যাটী এরূপভাবে করাইলেন যে বোধ হয় প্রত্যহ যাহারা বৈদিক সন্ধ্যা করে, তাহারাও এরূপ পারে কি না সন্দেহ। তাই মনে হয় ইনি কি শ্রীনিতাইচাঁদের কোনও অন্তরঙ্গ পরিকর? না তাঁহার কোনও শক্তিবিশেষ, জীবহিতের জন্য অবতীর্ণ? না অন্য কোনও কিছু? আমি ত কিছুই স্থির নিশ্চয় করিতে সমর্থ হইতেছি না।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে ইনি কুলীনগ্রাম, গুরপ, সাতগাছিয়া ও শ্রীধাম নবদ্বীপ গমন করেন। সঙ্গে ফণী, কৈলাস ও আমি রহিয়াছি। কি ট্রেণে, কি পদব্রজে যখনই কোথাও যাইতে হয় তখনই "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম" এই নাম উচ্চৈঃস্বরে গাহিবার আদেশ। কোন কোন স্থানে পৌছিতে হয়ত আমাদিগকে

আট দশ মাইল পায়ে হাঁটিয়া যাইতে হয় ; কিন্তু শান্তিদাতা প্রভুর কৃপায় কিছুমাত্র শ্রান্তি বা ক্লান্তি বোধ হয় না। ইনি কিন্তু অতি মন্থরগতিতে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া যান। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, এত পথ খালি পায়ে চলা সত্ত্বেও ইঁহার সুকোমল শ্রীচরণ দুখানির কোমলতার বা প্রখর রবিতাপে শ্রীঅঙ্গের শীতলতার বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় না। যে কোন গ্রামে উপস্থিত হইবামাত্র লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। আবার গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধ ইঁহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করে, দেখিয়া শুনিয়া আমাদের মনে হয়, ইনি উহাদের বহুদিনের সুপরিচিত পরম আত্মীয়। অতি অল্পসময় থাকিয়াও যখন যে গ্রাম পরিত্যাগ করেন, সেই গ্রামবাসী বহুলোক বিরস বদনে ও ছল ছল নেত্রে বহুদূর পর্য্যন্ত ইঁহার অনুগমন করিয়া থাকে। যে সময় আমরা গুরপ ছাড়ি তখন একটা গুজব উঠিল যে এই বাবাজী মেসমেরিজম বা কোনও মন্ত্র তন্ত্র জানে, নতুবা আমাদের দেশে ত কত সাধুমহাত্মারা আসিয়া থাকেন, কই বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ এরূপ ভাবে ত কাহারও প্রতি আকৃষ্ট হইতে দেখি নাই!

যখন আমরা সাতগাছিয়া হইতে নৌকায় কালনাভিমুখে যাইতেছিলাম, তখন ইনি আমাকে বলিলেন—"তোতে পিলাপিলি ঘেরিব।" ইঁহার ঐ কথাটি আমার মনে একেবারেই স্থান পাইল না ; কারণ বলবান্ প্রভুর কৃপায় আমাদের পুরী গমনের পর হইতে স্বামি স্ত্রী-সম্বন্ধ ঘুচিয়া গিয়াছিল—আমরা উভয়ে একভাবে ভজন সাধন করিতাম। আমাতে যে আর পুনরায় পুরুষবুদ্ধি আসিবে ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। দয়াময় ত্রিকালজ্ঞ প্রভুকে চিনিতে না পারিয়া আমি একটু উপহাসভরে বলিলাম —"হাঁ! তুমি পাগল, পাগলের কথা আবার ঠিক হয়!" শুনিয়া ইনি একটু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আচ্ছা! এই পাগলের কথা মনে রাখিস্" ইত্যাদি! ক্রমে আমরা কালনা হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপে পৌছিয়া

আমাদের পরম গুরুদেব শ্রীশ্রীগৌরহরি দাস মহান্ত বাবাজী মহাশয়ের আশ্রমে উঠিলাম। বহুদিনের পর গুরুশিষ্যের এই শুভমিলনে উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। দাদা মহাশয় আমাকে বাজারে লইয়া গিয়া নানাবিধ তরিতরকারী ও ফল কিনিয়া দিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঠাকুরের ভোগরাগ হইয়া গেলে দাদামহাশয়ের সেবার পর আমরা সকলে মহাপ্রসাদ পাইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। পরম দয়াল গুরুদেবের সহিত যে কয়েকদিন শ্রীধাম নবদ্বীপে রহিলাম, সে কয়েকদিনই এইরূপ পরমানন্দে কাটিয়া যাইতে লাগিল। একদিবস অতি প্রত্যূষে বাবাজী মহাশয়কে শয্যায় দেখিতে না পাইয়া বাহিরে অনেক অনুসন্ধানের পর দেখি ইনি স্বহস্তে ইঁহার গুরুদেবের পায়খানাটি পরিষ্কার করতঃ ঝাঁটা হাতে বাহির হইতেছেন। ইহাতে আমরা প্রাণে ব্যথা পাইলাম; কারণ এ কার্য্যটি আমাদেরই ছিল। কিন্তু ইনি আমাদের শিক্ষার জন্য গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। এই সময় কখন কখন ধুতি পরিয়া ব্রাহ্মণের বেশে নদীয়ার পথে পথে আনন্দে আবিষ্টভাবে বেড়াইতেন। কখনও বা দুটি নয়ন হইতে অবিরতধারে অশ্রুধারা আপনা আপনি বহিয়া পড়িত। কিছুদিন পরে শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে পুনরায় আমরা বরাহনগর ফিরিয়া আসিলাম।

আমার সেই উপনয়নের পর হইতে শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় মনের অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়। এ সংসারে যে আমার ভাই, ভগিনী, স্ত্রী বা অন্য কেহ আছে এ স্মৃতি একেবারেই আমার ছিল না। একদিন রাত্র প্রায় দুইটার সময় বাবাজী মহাশয় নিদ্রা যাইতেছেন, আমি পাখা করিতেছি, ইনি হঠাৎ চক্ষু মেলিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "কিরে,এখন তোর সংসারের কথা কিছু মনে পড়ে কি?" আমি বলিলাম—"কই কিছুই ত মনে আসে না, বেশ আনন্দে দিন যাইতেছে।"

ইনি আর কিছুই বলিলেন না। আমি মনে মনে ভাবিলাম—"এত সুখ কি জীবের ভাগ্যে হয়!" আহা মরি! তৎকালে ইঁহার সঙ্গে যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ, কি অপ্রাকৃত শান্তিপ্রবাহ, এ সম্বন্ধে আমি আর অধিক কি লিখিব? ইহা লিখিবার বা বুঝাইবার ভাষা নাই। তবে যে ইঁহার সুখময় সঙ্গসুখ অন্ততঃ একদিনও কিঞ্চিৎ অনুভব করিয়াছে, সে জানে যে এইটি কি এক অভিনব বস্তু। পরদিবস সন্ধ্যার ট্রেণে একটি শান্তিকুম্ভে সেই শ্রীরাধাকুণ্ডের জল লইয়া আমাকে পুরী যাইতে আদেশ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন—"যাহার সহিত দেখা হইবে প্রথমে তাহার গায়ে শান্তিজলের ছিটা দিয়া পরে কথা বলিবে!" যে সময় ইঁহার নিকট হইতে রওনা হইব, তখন অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল। আমার সেই পরিধেয় একমাত্র উড়নিখানি ভিজিয়া গিয়াছিল; কোন ভদ্রলোক সেইদিনই দুপুরের সময় বাবাজী মহাশয়কে একখানি কাপড় পরাইয়া দিয়াছিলেন। আমি যাইবার সময় পরমদয়াল প্রভু সেই কাপড়খানি আমাকে দিয়া নিজে উলঙ্গ রহিলেন।

পুরীতে পৌঁছিয়া ইঁহার আদেশ অনুসারে প্রথমে ঝাঁজপীঠা মঠে পৌঁছিলাম। সেখানে ললিতাদিদি প্রভৃতি বাবাজী মহাশয়ের সংবাদ জানিতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। আমাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং প্রথমে বাবাজী মহাশয়ের শ্রীঅঙ্গের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া ইঁহার দৈনিক কার্য্যের বিশেষ বিবরণ আগ্রহ-সহকারে শুনিতে লাগিলেন। পরে আউলিয়া মঠ এবং অন্যান্য স্থান হইয়া সন্ধ্যার সময় নগেনদাদার বাসায় গিয়া সে রাত্র সেইখানেই রহিলাম। আমি যেখানে যেখানে যাইতে লাগিলাম, সকলেই বাবাজী মহাশয়ের কথা অতি আগ্রহসহকারে শুনিতে লাগিল। ইহা হইতে আমার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিল যে পুরীবাসী ইঁহার অনুগত ভক্তবৃন্দের ইনিই প্রাণের প্রাণ ও একমাত্র লক্ষ্যস্থল, ইহাতে

কোনই সন্দেহ নাই। নগেনদাদার বাসায় দুখানি মাত্র মেটে ঘর তাহাতে খড়ের ছাউনি। কয়েকদিন হইতে বৃষ্টি হওয়ায় বড় ঘরখানিতে জল পড়িতেছিল। ছোট ঘরখানিতে নগেনদাদা একাকীই থাকিতেন। বড় ঘরখানি ভিজে থাকায় কমলাদিদিকে বাধ্য হইয়া তাঁহার কন্যা দুটীকে লইয়া সেই ছোটঘরে যাইতে হইয়াছিল। আমি ঐ রাত্রে আমার স্ত্রীর সহিত বড় ঘরখানির একপার্শ্বে গিয়া শয়ন করিলাম। প্রথমে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাবাজী মহাশয়ের তৎকালীন লীলাপ্রসঙ্গ হইতেছিল—পরে ঐ কথা শেষ হইলে শুনিলাম যে আমার স্ত্রী ঐ ঘরেই কয়েক দিন হইতে একাকী থাকে। হঠাৎ ঘরের দরজার দিকে দৃষ্টি পড়ায় দেখিলাম যে উহার অর্গলটী পর্য্যন্ত নাই। তখন আমার চমক ভাঙ্গিল ও ভাবিলাম, "আমি ত গুরুদেবের কৃপায় পরম সুখে আছি। আর এই বালিকা স্ত্রী পিতার অট্টালিকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মের জন্য আমার সহিত আসিয়া আজ এই অবস্থায় পড়িয়া আছে?" তখন উহার প্রতিকারের উপায় চেষ্টা না করিয়া কেবল মাত্র মনে মনে প্রার্থনা করিলাম,—"হে জগন্নাথ দেব, এ তোমার আশ্রয়ে আছে, প্রভু! তুমি ইহাকে রক্ষা করিও।" কিন্তু যতই প্রার্থনা করি না কেন, তখন হইতেই আমার বৈরাগ্যের হ্রাস হইতে লাগিল ও মনে মনে ভাবিলাম,—"আমারা কোন সুখ চাই না, আমি পড়াশুনা করিয়া কিছু উপার্জ্জন করিব ও এই তিনজন (নগেনদাদা, উঁহার স্ত্রী ও আমার স্ত্রী) যাহাতে সুখে ভজন করিতে পারে সেই চেষ্টা করিব।" এইরূপ ভাবে সে রাত্র কাটিয়া গেল, পরদিবস বাবাজী মহাশয়ের আদেশক্রমে দুইটী প্রাচীনা স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা রওনা হইলাম। ইনি পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছিলেন— "উহারা সাক্ষাৎ মায়া, উহাদিগকে মায়াপুরের টিকিট করতঃ ষ্টীমারে উঠাইয়া দিয়া আমার নিকট সোজা চলিয়া আসিবি।" ইঁহার আদেশ

পালন করিয়া ইঁহার নিকট ফিরিয়া আসিলাম। ঐ স্ত্রীলোক দুটিও আর দ্বিরুক্তি করেন নাই। এদিকে বরাহনগর আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক ইঁহার সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্র পুরীতে আমার স্ত্রীর সহিত সে রাত্রে যে সব কথোপকথন হইয়াছিল, সর্বজ্ঞ প্রভু আনুপূর্ব্বিক সমস্তই আবৃত্তি করিলেন। তখন কতকগুলি ভদ্রলোক ইঁহার নিকট বসিয়া থাকায় আমি লজ্জায় অবনতমস্তকে ইঁহার কথাগুলি শুনিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম। পরে এক সময় নির্জ্জনে ইঁহাকে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমার স্ত্রীর সহিত পুরীতে যে সব কথা হইয়াছিল, তুমি এখানে বসিয়া তাহা কিরূপে জানিলে? তুমি কি কোন যাদু জান?" উত্তরে হাসিয়া বলিলেন—"সুরেন! মন যদি স্বচ্ছ হয়, তবে যেদিকে চাহিবে, সব পরিষ্কার দেখা যাইবে।" দুই একদিন পরে একদিন দ্বিপ্রহর রাত্রের সময় আমি যখন ইঁহার পাদসম্বাহন করিতেছিলাম, তখন ইনি আমার মনের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম—"পুনরায় গিয়া কলেজে পড়িতে ইচ্ছা হইতেছে।" তখন আর কিছু না বলিয়া পরদিন প্রাতে কুঞ্জবাবু আসিলে তাঁহাকে বলিলেন—"সুরেনকে কাপড় জামা ইত্যাদি উহার যাহা আবশ্যক কিনিয়া দিবে ও উহার কটক যাইবার খরচ দিবে॥" কুঞ্জবাবু ইঁহার আদেশানুরূপ ব্যবস্থা করিলেন॥ আমিও ইঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া কটক রওনা হইলাম। ইহার দুই তিন দিবস পরে বাবাজী মহাশয় প্রেমদাদাকে পুরী কুঞ্জমঠ ছাড়িয়া শ্রীবৃন্দাবন যাইতে আদেশ করিলেন। ঐ মঠে শ্রীশ্রীরাধারমণ দেবের শ্রীবিগ্রহ ছিল॥ সঙ্গে সঙ্গে নগেনদাদাকে সপরিবারে ও রাধাদাসী মা, তাঁহার মাতা ও মঞ্জরীমাকে সেই মঠে গিয়া শ্রীশ্রীরাধারমণ দেবের সেবা করিতে আদেশ করিলেন। আরও লিখিলেন—"নগেনদাদা যেন ঐ মঠের প্রহরী স্বরূপ থাকেন।" ইঁহার আদেশানুসারে সব সেইরূপ

কার্য্যই হইল। একদিন কাতরপ্রাণে ব্যাকুল হইয়া আমার স্ত্রীর রক্ষার জন্য জগন্নাথদেবকে জানাইয়া আসিয়াছিলাম, আজ বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া উপযুক্ত রক্ষক, ঠাকুরসেবা ও সৎসঙ্গ সমস্তই একসঙ্গে দিলেন দেখিয়া আমি মনে মনে ভাবিলাম, এমন সৌভাগ্য জগতে অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে।

যথাসময়ে বাবাজী মহাশয় পুরীতে ফিরিয়া গেলেন। আমিও সুযোগ পাইলেই ইঁহার কাছে যাইতাম। একবার বাবাজী মহাশয় কলিকাতা হইতে পুরীতে যাইতেছেন, সঙ্গে বহু লোক। হাওড়া ষ্টেশনের গেট খুলিতেই সঙ্গীগণ শশব্যস্তে প্রায় সকলেই প্লাটফর্ম্মে আসিয়াছেন। আমি ও পুলিনদাদা বাবাজী মহাশয়ের পিছনে দাঁড়াইয়া ছিলাম। ভুলক্রমে শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেবের পূজার বাসন সহিত প্রায় দুই মণ ওজনের একটী বোরা পড়িয়াছিল। ট্রেণ ছাড়িবার বেশী বিলম্ব নাই দেখিয়া সেই ভারী বোরাটী ইনি স্বহস্তে অনায়াসে তুলিয়া আমার মাথায় চাপাইয়া দিলেন। আমিও 'জয় নিতাই' বলিয়া সেই বোরাটী লইয়া প্লাটফর্ম্মে আসিলে আমার কয়েকজন গুরু ভাই ধরাধরি করিয়া নামাইলেন। এস্থানে বলা বাহুল্য যে আমার মত ক্ষীণজীবী লোক সহজ অবস্থায় অন্ততঃ বিশ সেরের বেশী বহন করিতে অসমর্থ। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে।

কিছুকাল পরে পুলিনদাদা যখন মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে মঠ স্থাপন করেন, আমি সেখানে থাকিয়া রিপণ কলেজে পড়িতাম। আমার সহোদর ভাইএর শ্বশুর মহাশয় একজন পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে নাম শুনিতে ঐ মঠে আসিতেন। হঠাৎ আমি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ায় তিনি আমাকে ব্যারাকপুরে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের বাসায় লইয়া যান। আমি সুস্থ হইয়া সেখান হইতে পুনরায় কলিকাতা

কলেজে আসিলাম। কয়েকমাস পরে দাদা আমার স্ত্রীকে আনিতে আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে পুরীতে পাঠান। তখন সেখানে বাবাজী মহাশয় ছিলেন। ইনি আমাকে ও আমার স্ত্রীকে শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেবের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া শক্তি সঞ্চার করতঃ পুনরায় দাম্পত্য-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করাইলেন। এতদিন সেই শক্তিমান্ প্রভুর কৃপায় সেই সম্বন্ধ অন্যরূপ হইয়া গিয়াছিল, আমরা উভয়ে একজনকেই স্বামী বুদ্ধি করিয়া আসিতে-ছিলাম। আজ হইতে পুনরায় আমি সেই স্ত্রীর দণ্ড মুণ্ডের মালিক হইলাম। ধন্য প্রভু! তুমি কত খেলাই খেলিলে, কত লীলাই দেখাইলে! কখন কাহাকে যে কি ভাবে রাখ তুমিই জান। যে মাছ ছোঁয়া খাওয়ার জন্য আমাদের শ্বশুরবাড়ী হইতে বাহির হইতে হইয়াছিল, আজ শ্বশুর মহাশয় সেই মৎস্যাদি তামসিক আহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজে একজন পরম ভক্ত হইয়াছেন।

ধন্য তোমার করুণা! জয় তোমার স্বাধীন ইচ্ছার! পাঁচ বৎসর পরে আমার সেই স্ত্রী একটি পুত্র প্রসব করতঃ পরলোক গমন করিলে, আমি পুনরায় দার পরিগ্রহ করিয়াছি ও সেই স্ত্রীরও দুটী পুত্র জন্মিয়াছে। এইরূপে আজ আমি তিনটী পুত্রের (নিতাইদাস, গৌরদাস ও রাধেশ্যাম) পিতা হইয়াছি। একদিন সেই ত্রিকালজ্ঞ প্রভুর কথা (তোতে পিলাপিলি ঘেরিব) হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলাম। আজ সেই কথা কার্য্যে পরিণত হইল।

হে অদোষদরশী অগতির গতি পতিতপাবন প্রভু। আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার কৃপায় যে ভাবেই থাকি না কেন, যেন আপনার শ্রীচরণের প্রতি মতি রাখিয়া অনবরত আপনার দয়ার স্মৃতিটুকু হৃদয়ে জাগরূক থাকে, যেন চিত্তবিক্ষেপ জন্মিয়া অন্য পথে না যাই, যেন মন প্রাণ দিয়া আপনার জনকে ভালবাসিতে পারি, যেন আপনার প্রাণারাম 'নিতাই গৌর রাধে শ্যাম' নামে রুচি থাকে।

দাদামহাশয়

এই ঘটনাটী সম্বন্ধে গোপালদাদা যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই এই স্থানে উদ্ধৃত করা হইল। তিনি লিখিয়াছেন :—

আমার নাম নব গোপাল দে। সম্প্রতি আমার নিবাস হুগলী বাবুগঞ্জ। কলিকাতায় আমার কাটাকাপড়ের দোকান। আমরা সকলেই সাতগাছিয়া নিবাসী শ্রীপাদ কুঞ্জলাল গোস্বামী প্রভুর মন্ত্রশিষ্য ; সুতরাং ঐ সূত্রেই দাদামহাশয় (শ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহাশয়) আমাদিগকে বিশেষ কৃপার চোখে দেখেন। সন ১৩১২ সাল পৌষ মাস। একদিন রাত্রে কার্য্য শেষ করিয়া দোকান বন্ধ করিব, এই সময় শুনিলাম যে বাবাজী মহাশয় কলুটোলায় বাবু কুঞ্জলাল মল্লিক মহাশয়ের বাটীতে শুভাগমন করিয়াছেন। রাত্র হওয়ার দরুণ সে দিন আর আমার যাওয়া হইল না। পর দিবস অতি প্রত্যুষেই ইঁহাকে দর্শন করিবার মানসে কুঞ্জবাবুর বাড়ী গমন করিলাম। ইনি মুখ ধুইতেছিলেন, হঠাৎ আমাকে দেখিবা মাত্রই হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরে! তোর গোঁসাই কোথায়, কেমন আছে ?"

আমি। আজ্ঞে? তিনি আমাদের বাসায় সম্প্রতি আসিয়াছেন এবং ভালই আছেন।

বলিয়া ইঁহার শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে ইনি আশীর্ব্বাদ করতঃ দোকানে যাইতে বলিলেন। আজ্ঞা পাইয়া আমি দোকানে আগমন পূর্ব্বক দোকানের কার্য্য করিতেছি। বেলা অনুমান আটটা এই সময় দেখি যে দাদামহাশয় একখানি লাঠি হাতে করিয়া আমার দোকানের সম্মুখ দিয়া কোথায় গমন করিতেছেন। দেখিবামাত্র আনন্দে আমার হৃদয় ভরিয়া গেল। চকিতের ন্যায় দৌড়িয়া গিয়া ইঁহার কোমর

জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম—“দাদামহাশয়! আপনি এদিকে কোথায় যাইতেছেন?” ইনি আমার দিকে তাকাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন—“কিরে! তুই এদিকে কোথায় যাচ্ছিস?” আমি বলিলাম—“আজ্ঞে! এই যে আমার দোকান! চলুন না দয়া করিয়া একবার পদধূলি দিবেন।” শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“বটে! এই তোর দোকান, আচ্ছা চল্ চল্ তোর দোকানেই যাওয়া যাক।” এই বলিয়া অধমের দোকানে শুভ বিজয় করিলেন। আমি বসিতে দিলাম। ভিতরে বসিয়া প্রথমে গুণ গুণ স্বরে কি গাহিতেছিলেন, হঠাৎ প্রকাশ্যে গান ধরিলেন—

মাধব বহুত মিনতি করু তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিনু,
দয়া জানি না ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ, গুণ লেশ না পাওবি,
যব তুহু করবি বিচার।
তুহু জগন্নাথ জগতে কহায়সি,
জগ বাহির নহ মুঞি ছার॥
কিয়ে মানুষ পশু, পাখী যে জনমিয়ে,
অথবা কীট পতঙ্গে।
করম বিপাকে, গতাগতি পুনঃ পুনঃ,
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর,
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদ-পল্লব, করি অবলম্বন,
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

প্রায় আধ ঘণ্টার উপর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এই পদটী নানারূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া গান করিতে লাগিলেন। দুইটী নয়ন হইতে অবিরত ধারে অশ্রু ঝরিতেছে, দোকানের সম্মুখবর্ত্তী রাস্তায় লোক আর ধরে না। হঠাৎ চমকিত হইয়া নয়ন উন্মীলন করিলেন। বহুলোক-সংঘট্ট দেখিয়া ভাব সম্বরণ পূর্ব্বক গান শেষ করিলেন। গান থামিয়া গেল; কিন্তু আগন্তুক লোকসকল অনিমেষনয়নে তখনও ঐ মহাপুরুষের প্রফুল্লিত মুখকমল পানে তাকাইয়া আছে। কি এক অপ্রাকৃত আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া কেহই যেন ঐ মধুময় সঙ্গ ছাড়িয়া যাইতে সমর্থ হইতেছে না দেখিয়াই বোধ হয় মহাপুরুষ নানারূপ কৌশল করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁরে! আমার একটা জামা গায়ে দিতে বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে, একটা জামা করিয়া দে ত!" শুনিবামাত্র আমি হৃষ্টচিত্তে উঁহার গায়ের মাপ নিতে নিতে বলিলাম—"দাদামহাশয়! একবার আমাদের বাসায় পদার্পণ করিতে হইবে।"

ইঁনি। তোর বাসা এখানে কোথায়?

আমি। আজ্ঞে এই যে নিকটে ৬।১ নং সেণ্ট জেম্‌স্ লেন।

তখন ইনি হাসিতে হাসিতে বাসায় গমন মানসে রওনা হইলেন। আমিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলাম। বাসার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"বাড়ীতে কে কোথায় আছ গো?" শুনিবামাত্র ছেলে মেয়ে প্রভৃতি বাড়ীর সকলেই আসিয়া উঁহার শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ ভিতরে লইয়া গেল। আমি বলিলাম—"দাদামহাশয়! একেবারে উপরের ঘরে অনুগ্রহ করুন।" তাহাই হইল, উপরের ঘরে গিয়া বলিলেন—"এস্থানে বড়ই ঠাণ্ডা, চল ছাদে রৌদ্রে গিয়া বসা যাক্।" সে স্থানে বসিয়া স্নান করিবার অভিপ্রায়

প্রকাশ করিলে জল দেওয়া হইল। স্নান আহ্নিক শেষ করতঃ কিঞ্চিৎ মোহন-ভোগ প্রসাদ গ্রহণ করিতেছেন, এই সময় পুলিনদাদা আসিয়া বলিলেন—"আপনি এস্থানে প্রসাদ পাইতেছেন, আর আমাদের বাড়ীতে যে সকলে অপেক্ষা করিতেছে!" বাবাজী মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"চল তোমাদের বাড়ী যাওয়া যাক্।" আমাকে বলিলেন—"তোদের বাড়ীতে আজ রাত্রে আসিয়া প্রসাদ পাইব" বলিয়া একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পরে আমি গিয়া সদলে দাদামহাশয়কে লইয়া আসিলাম। ইঁহার আদেশে আমার গুরুদেব কুঞ্জলাল গোস্বামী এবং গোবিন্দদাস বাবাজী মহাশয় এই দুইজনে রান্না করিতে লাগিলেন। এদিকে ইনি উপরের ঘরে নামকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। লোকে লোকারণ্য। "গজেন্দ্র গমনে যায়, সকরুণ দিঠে চায়, পদভরে মহী টলমল। এই পদ গান হইতেছে। রাত্র প্রায় বারটা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিয়া কীর্ত্তন সমাপ্তি করিলেন। ভক্তবৃন্দ স্বীয় স্বীয় স্থানে গমনোদ্যত হইলে ইঁনি ইঙ্গিতে আমাকে বলিলেন—দেখ্ প্রসাদ না পাইয়া কাহাকেও যাইতে দিস্ না।" কথা শুনিয়া আমি অতিশয় ভীত ভাবে চুপি চুপি ইঁহার নিকট বলিলাম—"আজ্ঞে! মাত্র বিশ পঁচিশ জনার আন্দাজ যোগাড় হইয়াছে। এস্থলে লোকসংখ্যা প্রায় আশী হইবে, কিরূপে কি হইবে।" শুনিবামাত্র আমাকে ধমকাইয়া বলিলেন—"সে চিন্তা তোর কি রে? যাঁহার প্রসাদ তিনি বুঝিবেন। তুই তোর কাজ কর না।" আদেশের সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ে যেন দ্বিগুণ বিশ্বাস ও শক্তি আসিল। আমি হৃষ্টচিত্তে সকল ভক্তবৃন্দকে আটক করিলাম। মহাপ্রভুর ভোগান্তে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ এবং আমরা সকলে অতি পরিতোষভাবে মহাপ্রসাদ পাইলাম। অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভক্তগণ ইঁহার এই অলৌকিকী শক্তির

কথা লইয়া সমালোচনা করিতে করিতে যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। ইঁহারা অধমের পর্ণকুটীরেই বিশ্রাম করিলেন।

পরদিবস আমরা অনেক রকম যোগাড় করিয়াছি দেখিয়া আমার গুরুদেবকে বলিলেন—"দেখ কুঞ্জ! দশটার মধ্যে ঠাকুরের ভোগ দেওয়া চাই।" ইঁহার সেই আদেশ শ্রবণ করতঃ আমার গুরুদেব কেবল রসা, অন্ন ও ডাইল দিয়া ঠাকুরের ভোগ দিলেন। সকলে যথাসময়ে প্রসাদ পাইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন।

সেদিন মণিলাল দাসের বাড়ী মহোৎসব। বেলা প্রায় দুইটার সময় আমাকে বলিলেন—"তুই মণিলালের বাড়ী গিয়া দেখিয়া আয় ত ভোগের কত বিলম্ব আছে।" আমি গিয়া দেখিলাম—তখনও ভোগ হয় নাই। আমি আসিয়া বলিলে আমাকে সঙ্গে করিয়া মনিলালের বাড়ী গমন করিলেন। বাড়ীর দরজায় গিয়া যেমন 'গৌরহরি বোল' ধ্বনি করিলেন, অমনি সকলে আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ ইঁহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে একবার আমার কাকাগুরু শ্রীপাদ প্যারীলাল গোস্বামী ও তাঁহার স্ত্রী বাবাজী মহাশয়ের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহন করিবার মানসে আমাদের বাসায় আগমন করেন। আমার গুরুদেব ও মা গোস্বামিনীও তখন উপস্থিত ছিলেন। বরাহনগর হইতে ইঁহাকে আনা হইল। যথাসময়ে উঁহাদিগকে মন্ত্র প্রদান করতঃ মহাপ্রসাদাদি গ্রহণপূর্ব্বক সেদিন রাত্রে আমাদের বাড়ীতেই রহিলেন। পরদিবস প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক বসিয়া আছেন, এই সময় জনৈক ভদ্রলোক পনের ষোল বৎসর বয়স্কা একটী মেয়ে সঙ্গে করিয়া আগমন করতঃ প্রথমে আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। আমি যাইয়া দেখি ভদ্রলোকটী অপরিচিত। আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা!

বাবাজী মহাশয় কি এখানে আছেন?" আমি বলিলাম—"আজ্ঞে হ্যাঁ! আসুন।" তখন ভদ্রলোকটী মেয়েটীর হাত ধরিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিলে ইনি জিজ্ঞাসা করিলেন— বাবা! কি জন্য আসা হইয়াছে?"

ভদ্রলোকটী অতি কাতর ভাবে বলিলেন—"বাবা! আমার এই মেয়েটী পাগল হইয়া গিয়াছে, অনেক ডাক্তার কবিরাজ দেখাইলাম, কিছুতেই কিছু হইল না এখন অনন্যোপায় হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি, আপনি কৃপা করিয়া আমায় এই বিপদ হইতে উদ্ধার করুন।"

বাবাজী। বাবা! আমি ত ডাক্তার কবিরাজও নই, ওঝা-বৈদ্যও নই। আমার নিকট কোন ঔষধপত্র বা মন্ত্রতন্ত্রও নাই। থাকার মধ্যে আছে একমাত্র নাম, তাহাতে যদি আপনার বিশ্বাস হয় আমি নাম করিতে পারি।

ভদ্র। বাবা! আমার দৃঢ় ধারণা যে আপনি যাহা করিবেন, তাহাতেই ভাল হইয়া যাইবে।

বাবাজী। বাবা! সে বিশ্বাস যদি হয় তবে কোনই ভয় নাই।

এই বলিয়া নাম আরম্ভ করিলেন। মেয়েটি যখন প্রথম আসিয়াছিল, তখন উহার চলন, বলন, হাত, পা, চক্ষু সমস্তই চঞ্চল। সর্ব্বদা বাম হস্তে মাথার চুল টানিয়া ছিঁড়িতেছিল। যেমন নাম আরম্ভ হইল অমনি অতি শান্তভাবে বসিয়া নাম শুনিতে লাগিল। প্রায় দুই ঘণ্টা সময় নাম হইল, মহাপুরুষের শক্তিপ্রভাবে মেয়েটি স্থিরভাবে রহিল। নাম সমাপ্তির পর সে সলজ্জভাবে বাবাজী মহাশয়কে প্রণাম করিল। কি আশ্চর্য্য! অতদিনের রোগী, ডাক্তার কবিরাজের চিকিৎসায় যাহার কিছুই উপশম হয় নাই, সে আজ দুইঘণ্টার মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সকলেই অবাক। ভদ্রলোকটি করযোড়ে বলিলেন—"বাবা! ইহার সম্বন্ধে আমাকে আর কি করিতে হইবে?"

বাবাজী। আর কিছুই করিবার প্রয়োজন নাই, কেবল মাত্র জগন্নাথ ঘাটে লইয়া গিয়া একশত আটটী ডুব দেওয়াইয়া বাড়ী লইয়া যান।

ভদ্রলোকটী তাহাই করিলেন। সেইদিন হইতেই সেই মেয়েটী সুস্থ ও নীরোগভাবে কাল যাপন করিতে লাগিল। এইরূপ ভাবে তিনদিন কাল এ অধমের কুটীরে অবস্থান পূর্ব্বক আমাদিগকে কৃতার্থ ও অনুগৃহীত করিয়া অন্যত্র গমন করিবার মানসে বাহির হইলেন। কি আশ্চর্য্য! যখন বাড়ীর মধ্যে ছিলেন তখন স্বাবাবিক দেহ; যেমন রাস্তায় বাহির হইলেন, অমনি দেখা গেল যেন আমাদের দরজা হইতে প্রায় দুই হাত উচ্চ এক মহাপুরুষ দাঁড়াইয়া আছেন। বিস্মিতভাবে নিকটে গিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"দাদামহাশয়! আবার কবে আসিবেন? আপনি হয়ত এ অধমদের ভুলিয়া যাইবেন। আমাদের ভক্তি বিশ্বাস বা ভালবাসা থাকিলে কি আপনি ছাড়িয়া যাইতে পারিতেন?" তখন ইনি একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁরে! আমি যখন তোদের বাড়ী আসিয়াছি তখন আর তোদের ভয় নাই। তোরা ত আমার। তোদের ত কথাই নাই, যে একবার আমার হইয়াছে আমি তাহাদিগকে ভুলি নাই বা ভুলিব না, ছাড়ি নাই বা ছাড়িব না। পাগলা! এ যে পরমার্থ সম্বন্ধ, এ কি ছাড়িবার শক্তি আছে? এ যে নিত্য সম্বন্ধ।" এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। এই কয়দিন ইঁহার মধুময় সঙ্গ লাভে আমরা যে কিরূপ আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম তাহা লেখনী দ্বারা লেখা যায় না বা বুঝাইবার ভাষা নাই। যিনি জীবনে ক্ষণকালের জন্যও এই আনন্দের কিঞ্চিৎ উপভোগ করিয়াছেন, তিনিই নিজ নিজ শক্তি অনুসারে কিঞ্চিৎ

অনুভব করিতে পারিয়াছেন বা পারিবেন। আমি অনেক লিখিব মনে করিয়াছিলাম ; কিন্তু লিখিতে গিয়া আর ভাষা পাই না ; কেবল ইঁহার ভালবাসা, সরলতা, নিরভিমানিতা, মাদৃশ জীবের প্রতি অনুগ্রহ এবং অলৌকিকী শক্তির জয় জয়কার হউক—এই প্রার্থনা।

শরণাগত

এই ঘটনাটী সম্বন্ধে শ্রীমান্ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় নিজে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই এইস্থানে উদ্ধৃত করা হইল। তিনি লিখিয়াছেন,—

পরম করুণ শ্রীশ্রীরাধারমণদেবের অপার করুণার কথা আমরা সামান্য মানব এক মুখে কি বলিব ? যদি শত সহস্র মুখ হইত তাহা হইলে বর্ণনা করিয়া সুখ হইত। পতিতের বন্ধু অযাচিত কৃপাকারী, শরণাগত পালক, ভালবাসার মূর্ত্তি, যাঁর পতিত উদ্ধারেই একান্ত সংকল্প, তিনি কিরূপ অযাচিত ভাবে আমাদের ন্যায় অধম পতিতদের প্রতি কৃপা করিয়াছিলেন তাহা আর লিখিয়া কি ব্যক্ত করিব ? সামান্য লেখনী কৃপামৃতের কথা কি লিখিবে ? লিখিতে অক্ষম, যে অনুভব করিয়াছে সেই মনে মনে বুঝিতেছে, তার আর প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই। তবে যাহা লিখিতেছি তাহা তাঁহার কৃপায়। তিনি কাষ্ঠপুত্তলিকার মত যাহা লিখাইতেছেন তাই লিখিতেছি,—

আমার নাম পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়। আমার মাতুলালয় হুগলি জেলার অন্তর্গত অম্বিকা-কাল্না এবং গুপ্তিপাড়ার মধ্যবর্ত্তী সাতগাছিয়া গ্রামে। আমার মাতামহের নাম ৺প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। দিদিমার বাপের বাড়ী সাতগাছিয়ায়। ইনি ৺দামোদর গোস্বামীর কন্যা, আমি তাঁহার সেজ মেয়ের ছেলে। আমার মাতামহের পূর্ব্ব নিবাস চণ্ডিগাছায় ছিল, তিনি মুঙ্গের জামালপুরে চাকরী করিতেন।

হঠাৎ তাঁহার দুইটী উপযুক্ত পুত্রের বিয়োগ হওয়ায় তিনি চাকরী হইতে অবসর লইয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন। কিছুদিন পরে দেশে ফিরিলে আর তাঁহার বিষয়সম্পত্তির উপর মন লাগিল না। তাহা ছাড়া গ্রামটীতে ব্রাহ্মণের বসতি নাই, গঙ্গা অনেক দূর, এই সমস্ত কারণে যে দেশে গঙ্গা এবং ব্রাহ্মণের বসতি আছে, এই রকম স্থানে তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায় হইল।

আমার দুই মামার মৃত্যুর পর আমার জন্ম হয়; কাজেই আমাকে পাইয়া দাদামহাশয়ের পুত্রশোকের কতকটা লাঘব হয়, সেই জন্য আমাকে সর্ব্বদাই কাছে কাছে রাখিতেন।

একবার শ্রীশ্রীমদন গোপালের দোলযাত্রা উপলক্ষে আমরা সকলেই সাতগাছিয়ায় আসি। তখন দিদিমার দুইটী সহোদর ভাই সাতগাছিয়ায় ছিলেন, মেজ ভাই গৌরমোহন গোস্বামী, ছোট ভাই বিপিনবিহারী গোস্বামী। আরও জ্যেঠতুত ভাই খুড়তুত ভাই সব ছিলেন। দাদামহাশয় সাতগাছিয়ায় আসিলে দিদিমার ভাইয়েরা সকলেই সাতগাছিয়ায় বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বিপিনদাদা বলিলেন—"বাড়ুজ্যে মহাশয়, শেষ জীবনটা আমাদের কাছেই কাটান। এখানে গঙ্গা আছেন, আমাদের ঠাকুর ৺মদনগোপাল দর্শন করিবেন, কীর্ত্তন শুনিবেন, মরিলে আমরাই গঙ্গায় দিব, আনন্দে শেষ জীবনটা অতিবাহিত করুন।" দাদা মহাশয় গঙ্গাস্নান এবং ঠাকুরদর্শন করিয়া যেন শোকসন্তপ্ত জীবনে কিঞ্চিৎ তৃপ্তি বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি শ্যালকদ্বয়কে ডাকিয়া বলিলেন—"ওহে ভায়া! তোমাদের এখানেই একটু জায়গা ঠিক করিয়া দাও, শেষ জীবনটা তোমাদের কাছেই কাটাইব।" দিদিমার ছোটভাই বিপিন গোস্বামীর অনেক শিষ্য ছিল এবং তিনি সংকীর্ত্তন করিয়াই জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। কাল্‌নার শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর

বাড়ীর গিরি গোস্বামী প্রভৃতি গোস্বামীদের সহিত ছোট দাদার খুব আন্তরিক ভালবাসা ছিল। তাঁহারা ছোট দাদাকে খুব সম্মান করিতেন। তিনি প্রায়ই সদলবলে কীর্ত্তন করিতে করিতে মহাপ্রভুর আঙ্গিনায় যাইতেন এবং শ্রীশ্রীভগবানদাস বাবাজী মহাশয়ের আখড়ায় ছোটদাদা প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। একদিন শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর (ইনি "জয় নিতাই" নামে পরিচিত) সহিত বাবাজী মহাশয় কাল্‌নায় মহাপ্রভু দর্শন করিতে আসিয়াছেন। বিপিন দাদাও ঐদিন কাল্‌নায় গিয়াছেন। ভগবানদাস বাবাজী মহাশয়ের আখড়ায় প্রথম বাবাজী মহাশয়ের সহিত বিপিনদাদার সাক্ষাৎ হয়। সেইদিন কাল্‌নায় খুব নামকীর্ত্তন হয়। পরদিন প্রাতে বিপিনদাদা 'জয় নিতাই'কে বললেন—চলুন একবার শ্রীমদনগোপাল দর্শন করিয়া আসিবেন। ছোটদাদার মেজ ভগ্নীর বিবাহ দিগনগরে 'জয় নিতাই'দের বাড়ীতেই হয়; সুতরাং 'জয় নিতাই' কোনই আপত্তি করিলেন না। বাবাজী মহাশয় ও 'জয় নিতাই' উভয়েই বিপিনদাদার সহিত সাতগাছিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরাও সকলে আসিয়াছি। ছোটদাদা তাঁহাদের বসিবার জন্য আসন দিলেন। কিন্তু বাবাজী মহাশয় কিছুতেই আসনে বসিলেন না, তিনি মাটিতে বসিলেন। তার পর 'জয় নিতাই' আমার দাদামহাশয় ও দিদিমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। এমন সময় বাবাজী মহাশয় তাঁহাদের উভয়কে প্রণাম করিলে দাদামহাশয় ও দিদিমা বড়ই তৃপ্তিলাভ করিয়া জয় নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই বাবুটী কে?" জয় নিতাই বলিলেন—"ইনি একজন পরম ভক্ত, আমার সহিত কাল্‌নায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভু দর্শন করিতে আসিয়াছেন। দাদামহাশয় ও দিদিমা বলিলেন—ইঁহাকে দেখিয়া আমাদের বোধ হইতেছে ইনি একজন মহাপুরুষ।" তারপর দাদামহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা!

তোমার নাম কি?” “আজ্ঞে! আমার নাম রাজেন্দ্র দাস” ইত্যাদি দুইচারিটী কথাতেই বাবাজী মহাশয় সম্বন্ধের বন্ধনে দাদামহাশয় ও দিদিমাকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। দিদিমাকে মাসিমা, দাদামহাশয়কে মেসো মহাশয়, মাকে সুশীলা দিদি; মায়ের মামা বিপিনদাদাকে মামা বলিয়া আপনার করিয়া লইলেন। এই আমাদের প্রতি প্রথম কৃপার সূত্রপাত হইল।

এই সময়ে কেবলমাত্র তিনি গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, তখনও পরিধানে মত্তি-পেড়ে ধুতি জামা চাদর ইত্যাদি। বৈরাগ্যের বেশ তখনও কিছু ছিল না। সেইদিন হইতে তিনি সাতগাছিয়ায় ‘রাজেন্দ্রবাবু নামে পরিচিত হইলেন। আজ পর্য্যন্ত পুরাতন লোক যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদের নিকট ‘চরণদাস বাবাজী’ বলিলে কেহই চিনিতে পারেন না, ‘রাজেন্দ্রবাবু’ বলিলেই চিনিতে পারেন। সেইদিন বৈকালে মদনগোপালের নাটমন্দিরে খুব কীর্ত্তন হইল। রাত্রে দুই একজন গ্রামস্থ লোক আসিয়া বাবাজী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বিপিনদাদার মেজভাই গৌর গোস্বামী ও কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার দাদামহাশয় প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সকলে বসিয়া নানারূপ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। দুই চারিদিন থাকিয়া বাবাজী মহাশয় শান্তিপুর দর্শনে চলিয়া গেলেন। দ্বিতীয়বারে সদলে আসিয়া সাতগাছিয়ায় আমাদের দর্শন দিলেন। এইবার সঙ্গে মহারথী শ্রীযুক্ত নবদ্বীপদাদা—যাঁহার কথা শুনিলে পাষাণও গলিয়া যায়। এই মহারথীর দ্বারাই আমরা বাবাজী মহাশয়কে ধরিতে পারি। নবদ্বীপদাদা বাবাজী মহাশয়ের অভিন্ন-কলেবর, তাঁহার কীর্ত্তনমাধুর্য্য এবং নৃত্য দেখিলে এমন কোন পাষণ্ড নাই, যাকে আপনা ভুলিয়া বিকাইতে না হইয়াছে। যাঁহারা তাঁহার কৃপা পাইয়াছেন, তাঁহারা এক একজন মহারথী হইয়াছেন। নবদ্বীপদাদার কথা এক মুখে বর্ণনা করিবার নয়। ইনি সদানন্দময় পুরুষ ছিলেন, সর্বদাই

মুখে নাম ছাড়া আর কিছুই ছিল না, বালক-জীবন সর্ব্বদা বালক লইয়া কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার স্বভাবও ঠিক বালকের মতই ছিল যাকে একবার মা, মাসি, দাদা ইত্যাদি সম্বোধন করিয়া ডাকিতেন, সে-ই তাঁহার কাছে বিকাইয়া যাইত। এমন চিত্তাকর্ষক মহাত্মা আর কভু দেখি নাই। যাহাকে একবার মাত্র স্পর্শ করিয়াছেন, তৎদণ্ডেই তাঁহার চিত্তের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এমন শক্তিমান্ পুরুষ হয় নাই আর হবার নয়। এবার প্রায় এক মাস যাবৎ বাবাজী মহাশয় সাতগাছিয়ায় রহিলেন। যে কয়দিন বাবাজী মহাশয় সাতগাছিয়ায় রহিলেন, আনন্দে গ্রামটী টলমল করিতে লাগিল। মদনগোপালের নাটমন্দিরে প্রত্যহই নামকীর্ত্তন হইত। গ্রামের লোকের যেন একটা চমক ভাঙ্গিয়া গেল। সকলেই সাধুবৈষ্ণব সেবার জন্য ভারে-ভারে জিনিষপত্র লইয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিল। আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সাধু দর্শন করিতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। একমাসে গ্রামটীকে নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিলেন। গ্রামটীর অধিকাংশ লোকই শাক্ত। বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধা খুব কম লোকেরই ছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়! বাবাজী মহাশয়ের নৃত্য দেখিয়া কীর্ত্তন শুনিয়া সকলেই কি যেন একটা অমানুষিক শক্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে কখনও এইরূপ ভাবের নৃত্য দেখেন নাই বা এইরূপ সংকীর্ত্তন শ্রবণ করেন নাই; কাজেই তাঁহাদের নিকট অতি মনোরম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। গ্রামের যাঁহারা দলপতি—শ্রীযুক্ত ভগবতী চরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রত্যহই আসিতেন, কেহ কেহ বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে নানা রকম তত্ত্ব কথাবার্ত্তা কহিতেন। গ্রামের ছোট ছোট বালকবৃন্দ বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে কীর্ত্তন করিতে এমন অভ্যস্ত হইল যে, সদা সর্ব্বদা এই গানটী গাহিতে আরম্ভ করিল—"এই হরে কৃষ্ণ নাম আবার

বল, আবার বল হরিনাম আবার বল। (এ নাম শিব জপেন পঞ্চমুখে আবার বল) (এ নাম নারদ জপেন বীণা যন্ত্রে) (এ নাম যতই বল শুনতে ভাল) (এ নাম তোমরা বল আমরা শুনি)।” বালক-কণ্ঠে যেন অমৃতের ধারার ন্যায় গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নামের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—যেন শত শত কোকিলকণ্ঠের মত ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল। গ্রামের লোকের আর বৈষ্ণবের উপর বিদ্বেষ ভাব রহিল না। সকলেই নূতনভাবে হরিনামে মাতোয়ারা হইয়া উঠিলেন। এখন হইতে বাবাজী মহাশয় কাল্‌না কিংবা নবদ্বীপে আসিবার সময় আমাদের দেখা না দিয়া আসিতেন না, সাতগাছিয়ার প্রতি খুবই কৃপাকটাক্ষ পড়িল। আমার দাদামহাশয় ৺প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গ পাইয়া যেন নবজীবন লাভ করিলেন। আমরা তখন উঠিয়া আসিয়া সাতগাছিয়ায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে আছি। নূতন বাড়ী তৈয়ারী প্রায় শেষ হয় হয় হইয়াছে। দাদামহাশয় বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—“বাবা! আবার কবে আসিবে? আমার ইচ্ছা আছে আমার নূতন বাড়ীতে একদিন বৈষ্ণবসেবা করাইব।” বাবাজী মহাশয় বলিলেন—“মেসো মহাশয়! আবার আমি শীঘ্রই আসিব।”

এইরূপে কিছুদিন গেলে আমরা নূতন বাড়ীতে আসিয়াছি। কিন্তু নবদ্বীপদাদা প্রায়ই সাতগাছিয়া আসিতেন। নূতন বাড়ীতে আসিয়া আমার মায়ের একদিন হঠাৎ খুব শরীর খারাপ হইল। তখন তাঁহার অন্তঃসত্বা অবস্থা, এই সময় তাঁহার কুষ্ঠির ফলে মৃত্যুযোগ ছিল। দিদিমা, দাদামহাশয় তাহা জানিতেন। তাঁহারা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। মদনগোপালের চরণামৃত খাওয়ান হইতেছে। গ্রামের গিন্নি-বান্নিরা সকলেই খবর পাইয়া দেখিতে আসিয়াছেন, গ্রামে একটা

সাড়া পড়িয়াছে যে প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যের মেয়েটী বুঝি বাঁচে না, সকলেই এই কথা কানা-ঘুসা করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে একদিন মা অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন, ডাক্তার আসিয়া বলিলেন—"জীবনের আশা খুবই কম, এই অবস্থায় যদি বেশীক্ষণ থাকে তবে শীঘ্রই মারা যাইবে।" বাড়ীর সকলেই মাকে লইয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। মার তখন মোটেই সংজ্ঞা নাই, কেবল শ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে মাত্র। এমন সময় কাল্না হইতে নাম করিতে করিতে নবদ্বীপদাদা আসিয়া একেবারে আমাদের দালানের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। সকলেই ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, খুব কীর্ত্তন হইতে লাগিল। এমন সময় খোল করতালের শব্দে মা একটু চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, চাহিয়াই হাত বাড়াইয়া নবদ্বীপ-দাদার পায়ের ধূলা লইবেন এইরূপ ইচ্ছা দেখা গেল, হাত বাড়াইয়া লইতে না পারিয়া ক্রমশঃ একটু একটু গড়াইতে গড়াইতে নবদ্বীপদাদার পায়ে আসিয়া মস্তক ঠেকাইলেন, তার পর মা দুইহাত দিয়া চরণ জড়াইয়া ধরিলেন। কিছুক্ষণ পরে নবদ্বীপদাদা মাকে জীবনদান দিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে বিপিনদাদার বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

বিপিনদাদার কাছে বলিলেন—"সুশীলাদিদির আজ মৃত্যুযোগ ছিল, তাই একবার দেখতে এলাম।" আমাদের সঙ্গে নবদ্বীপদাদার ব্যবহার যেন নিজ সংসারের লোকের মত ছিল। যখনই আসিতেন তখনই মাকে বলিতেন—"সুশীলাদিদি! ঠাকুরদের ঘোল মুড়ি ভোগ লাগাও। আমাদের অনেকগুলি গাভী ছিল; কাজেই প্রত্যহ ঘোল, ননী হইত। ঘোল, মুড়ি নবদ্বীপদাদার প্রিয় বস্তু, পালঙ শাকের ঘণ্ট, লাউয়ের ডাঁটার রসা ভালবাসিতেন বলিয়া যখনি আমাদের ঐ সকল ব্যঞ্জন রান্না হইত, তখনই নবদ্বীপদাদার কথা মনে পড়িত। এতই আমাদের ভালবাসিতেন। নবদ্বীপদাদা, বিপিনদাদার বাড়ীতে গেলে

কিছুক্ষণ বাদে মায়ের ঘাম হইতে লাগিল। মা বলিতে লাগিলেন—"আমার শরীরের ভিতর দিয়া যেন একটা তাপ বাহির হইয়া গেল, আঃ এতক্ষণে যেন আমার শরীর সুস্থ হইতেছে।" দিদিমা বলিলেন—"একবার গড়াগড়ি দাও ত মা, আজ তোমার নবদ্বীপদাদা তোমাকে বাঁচাইয়া গেলেন।" মা গড়াগড়ি দিয়া উঠিয়া বসিলেন, ক্রমশই শরীর সুস্থ হইতে লাগিল। মায়ের অবস্থা যাঁহারা দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন, তাঁহারা মাকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সকলে বলিতে লাগিলেন—"এ বাবাজীরা মানুষ নয়, এরা কি জানে, মেয়েটা ত মরিয়াই গিয়াছিল। এইরূপ আশ্চর্য্যজনক ঘটনা দেখিয়া মেয়েদের মধ্যে সকলেই তাঁহাদের বাড়ীর কর্ত্তাদের বলিলেন—ওগো এই যে বাবাজীরা এসেছে এরা মানুষ নয়, প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যের মরা মেয়েটাকে বাঁচিয়ে দিল।" আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকারই মনের একটা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল।

গ্রামের লোকের হরিনামে এবং বৈষ্ণবের প্রতি বিশ্বাস ক্রমশঃই দৃঢ় হইতে লাগিল। কিছুদিন যায়—মা বেশ সুস্থ হইয়াছেন, দশমাস দশদিন পূর্ণ হইলে একটী কন্যা প্রসব করিলেন। মেয়েটী দেখিতে মন্দ হইল না, বেশ হৃষ্টপুষ্ট, অবয়বাদিও বেশ সুন্দর হইল। ক্রমশঃই বড় হইতে লাগিল। কিন্তু কথাও ফুটিল না বা হাঁটিতেও পারে না, এমন কি কোন স্থানে হামা দিয়াও যাইতে পারিত না, ঠিক জড় পদার্থের মত হইল। মেয়ে হইল বটে, কিন্তু মেয়ে লইয়া মায়ের মনে এক দণ্ডও শান্তি নাই; সকলেই মাটিতে বুক সমান গর্ত্ত করিয়া দাঁড় করাইয়া দিতে লাগিল। যদি ঐরূপ করিলে দাঁড়াইতে পারে; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, মা বড়ই অশান্তিতে আছেন, কুলীনের মেয়ে যদি ঐরূপ থাকে কেমন করিয়া কি হইবে, এইরূপ ভাবিয়া ভাবিয়া মায়ের দিন যাইতেছে। তৃতীয়বার বাবাজী মহাশয় সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে সাতগাছিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন

—সঙ্গে জয় নিতাই, নবদ্বীপদাদা প্রভৃতি সকলেই আছেন। বিপিনদাদার বাড়ীতে আসিয়াছেন, প্রত্যহই শ্রীশ্রীমদনগোপালের নাট-মন্দিরে কীর্ত্তন হইত। গ্রামের লোকসকল বাবাজী মহাশয়কে রাজেন্দ্রবাবু বলিয়া ডাকিতেন। শ্রীশ্রীমদনগোপালের প্রসাদ প্রত্যহই পাওয়া হয়, কখন কখন লোকে নিমন্ত্রণ করিয়া বৈষ্ণবসেবা করিতে লাগিল, গ্রামের লোক যেন আনন্দে মাতিয়া উঠিল।

হঠাৎ একদিন বাবাজী মহাশয় আমার দাদামহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র তিনি শশব্যস্তে উঠিয়া ইঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক বলিলেন—"এস এস বাবা! এস" বলিয়া আসন দিলেন। বাবাজী মহাশয় বসিয়া বলিলেন—"মাসীমা কোথায়?" তখন দিদিমা আসিয়া বলিলেন—"বাপ এসেছ! বস" বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"মাসীমা! এত ব্যস্ত হইয়াছেন কেন?"

দিদিমা! না বাবা! ব্যস্ত হব কেন, তবে তুমি অনেকদিন পরে এসেছ, তাই একটু জলযোগের ব্যবস্থা করছি।

বাবাজী। মাসীমা! দোকানে লোক পাঠিয়ে কি হবে। ঘরে যাহা আছে তাই দিন, আমি ত কুটুম্ব নহি যে সন্দেশ রসগোল্লা না দিলে হবে না।

দিদিমা। সেকি বাবা! শুধু কুটুম্বদেরই খাওয়াতে হয়, আর তোমাদের কি খাওয়াতে নাই?

এই বলিয়া দোকানে সন্দেশ আনিতে লোক পাঠাইয়া দিলেন। তখন গুপ্তিপাড়ার সন্দেশ প্রসিদ্ধ ছিল। দুঃখের বিষয় শুধু হাতে লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"কোন দোকানে সন্দেশ-রসগোল্লা নাই।" দিদিমার বিশ্বাস হইল না, আবার তিনি নিজে বাড়ীর কাছে একটি দোকান ছিল সেখানে গেলেন; কিন্তু হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন,

মনে মনে বড় দুঃখিত হইয়াছেন—আহা! বাছাকে একটু মিষ্টি দিয়া জল দিতে পারিলাম না!” বাবাজী মহাশয় বলিলেন—“মাসীমা! আপনি দুঃখ করছেন কেন! ঘরে যা আছে তাই দিন।” দিদিমা বলিলেন—“ঘরে ত কিছুই নাই বাবা! কি দিব!” বাবাজী মহাশয় বলিলেন—“কেন আজ ত খুদ ভেজে গুঁড়া করেছেন, আর হরিও সিলেট থেকে কমলার মধু এনেছে তাই দিয়ে লাড়ু ক’রে দিন না।” শুনিয়া দিদিমা একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন, বলিলেন—“বাবা! তুমি আমার ঘরের খবর কেমন করিয়া জানিলে! তুমি কে বাবা! আমাকে বল।”

বাবাজী। মা! আমি আপনার সন্তান।

দিদিমা। বাবা! বিদুরের বাড়ীতে ভগবান ক্ষুদ খাইয়াছিলেন, আর তুমিও ঠিক তাই করিলে, বেশ তোমার যাহা ইচ্ছা হইয়াছে তাই খাও।

দাদামহাশয় ও দিদিমা এ ব্যাপারে বেশ বুঝিতে পারিলেন এঁরা সাধারণ মানুষ নন। দাদামহাশয় ও দিদিমা করযোড়ে বলিলেন—“বাবা! আমাদের দয়া কর, আমরা মহাপাপী, পুত্রশোকে কাতর হইয়া এই সাতগাছিয়ায় গঙ্গা বাস করিব বলিয়া আসিয়াছি। আমাদের কৃপা কর।”

বাবাজী। মেসো মহাশয়! মাসীমা! আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, আপনাদের আমি কি কৃপা করিব? ও কথা বলিবেন না। আমি যে আপনাদের সন্তান, আপনারা ত সাক্ষাৎ দেব দেবী।

দাদামহাশয়, দিদিমা শাক্ত হইলেও উভয়েরই হরিনামের মালা ছিল। বাবাজী মহাশয় জপের প্রণালী শিখাইয়াছিলেন। বাবাজী মহাশয়ের নিকট শিক্ষা পাইয়া সেইমত আচরণ করিতে করিতে এক বৎসরের মধ্যে সজ্ঞানে মদনগোপাল দর্শন করিয়া উভয়ের প্রাণত্যাগ হইল। এরূপ সজ্ঞানে মৃত্যু খুব কম লোকেরই হয়।

বাবাজী মহাশয় যেদিন আমাদের বাড়ী গিয়াছিলেন, সেইদিন

বৈকালে গ্রামের মুরব্বি শ্রীযুক্ত ভগবতী চরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গৌরমোহন গোস্বামী ও অন্যান্য সকলেই বলিলেন—"রাজেন্দ্রবাবু! আজ আমাদের নিতাই গৌর দেখাতে হবে। আপনার মুখে রোজই তাঁহাদের গুণ শুনি, আজ আমাদের দেখাতেই হবে।" বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "তাঁহাদের যদি ইচ্ছা হয় ত দেখা দেবেন বৈ কি! আমি নরাধম, আমার কি ক্ষমতা যে আপনাদের নিতাই গৌর দেখাইব।" যথাসময়ে কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে লোকসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মদনগোপালের নাটমন্দির লোকে ভরিয়া গেল। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কেহই বাকি রহিল না, সকলেই ছুটিয়া আসিতে লাগিল, কুলের কুলবধূ পর্য্যন্ত কীর্ত্তন শুনিতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। এই দিন বাবাজী মহাশয় আর কাহাকেও বাকী রাখিলেন না, প্রেমবন্যায় সকলকেই ভাসাইয়া দিলেন। সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল, বাবাজী মহাশয়ের নৃত্যরঙ্গে মেদিনী টলমল করিতে লাগিল, সকলেই উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। বাবাজী মহাশয় হঠাৎ ভগবতী চরণ মুখোপাধ্যায় ও সারদা চরণ মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অপরূপ দৃশ্য! বাবাজী মহাশয় উভয়ের হাত ধরিবামাত্রই উভয়ে যেন কলের পুতুলের মত নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভগবতী মুখুজ্যে খুব স্থূলকায় পুরুষ, সহজে চলিতেই কষ্ট হইত, তাঁহার এরূপ নৃত্য, একটা আশ্চর্য্যের বিষয়। সকলেই অবাক্ হইয়া গেলেন, বাবাজী মহাশয় 'হরে কৃষ্ণ' বলিয়া হুঙ্কার করিতেছেন। কিছুক্ষণ তাঁহাদের নাচাইয়া ছাড়িয়া দিলেন। যতক্ষণ সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল তাঁহারা ততক্ষণ ঐভাবেই নাচিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ যেন মহাশক্তির আবির্ভাব হইতে লাগিল। কেহ ক্রন্দন, কেহ চীৎকার, কেহ গড়াগড়ি ইত্যাদি নানাপ্রকার ভাব হইতে লাগিল, যেন সাক্ষাৎ

মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইল। যাঁহারা দেখিবেন বলিয়াছিলেন তাঁহারা দর্শন পাইলেন। তাঁহারা চীৎকার করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—আজ আমাদের জীবন সার্থক হইল, আজ যে জিনিষ দর্শন করিলাম তাহা মুখে ব্যক্ত করিবার নয়। আজ আমরা কৃতার্থ হইলাম। সকলেই বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণে আসিয়া লুটাইয়া পড়িতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল গোস্বামীর ভাগ্নী-জামাই হেমবাবু চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন— "আজ আমার জীবন সার্থক যে সাতগাছিয়ার কুঞ্জগোঁসাইয়ের ভাগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলাম। তাই আজ মধুর বৃন্দাবনলীলা আমার দর্শন হইল! এইরূপ এক একজন এক একভাবের লীলা দর্শন করিয়া সমস্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ একেবারে আবিষ্ট অবস্থায় দাঁতে দাঁত লাগিয়া পড়িয়া আছেন। স্ত্রী পুরুষ সকলেই আবিষ্ট, ছোট ছোট বালকদেরও জ্ঞান নাই। সকলেই পড়িয়া আছে। আমার মা নাট-মন্দিরের একটা থামের কাছে আমার ভগিনীকে কোলে করিয়া বসিয়া-ছিলেন। তখন তাঁহারও সংজ্ঞা নাই। বাবাজী মহাশয় চরণে চরণ ছাঁদিয়া হাত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নৃত্য করিতেছেন, হঠাৎ 'হরেকৃষ্ণ' বলিয়া আমার ভগ্নীর দুই হাত ধরিয়া একটা ঝাঁকুনি দিলেন। তারপর তাঁহাকে হাত ধরিয়া নাচাইলেন, কিছুক্ষণ বাদে সে বেশ দাঁড়াইয়া রহিল। সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। যাহাকে শত চেষ্টা করিয়াও দাঁড় করাইতে পারা যায় নাই, একটা জড় পদার্থের মত হাত ধরিয়া তুলিলেই কাঁপিত, মোটেই মাটিতে পা স্পর্শ করিত না, আজ বাবাজী মহাশয়ের কৃপায় তাঁহার চলচ্ছক্তি হইল। এখনও যদি কেহ দেখেন ত বুঝিতে পারিবেন। এই মহাসংকীর্ত্তনের পর বাবাজী মহাশয়ের নিকট অনেকেই চিরদিনের মত বিকাইয়া গেলেন।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আমার মামা, ইঁহার পিতা

মাতামহের সম্পত্তি পাইয়াছিলেন, তাহাতেই ইঁহাদেরও মদনগোপালের সেবার পালা আছে। কাজেই তাঁহাদেরও গোস্বামী খেতাব। ঠাকুরসেবা কুঞ্জ মামা নিজেই করিতেন। সন্ধ্যার সময় আরতি-কীর্ত্তনও করিতেন ; কিন্তু সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করিতে পারিতেন না, লজ্জা বোধ হইত। অনেকেই মামাকে নাচিতে বলিতেন, আজ বাবাজী মহাশয় তাঁহার সে লজ্জা একেবারে ভাঙ্গিয়া দিলেন ; কীর্ত্তন হইলে আর কাহাকেও নাচিবার জন্য অনুরোধ করিতে হইত না। বিপিনদাদার শিষ্য মধু দাদা, উদ্ধব দাদা গৃহত্যাগ করিয়া বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে চলিলেন। হরি জেলে একজন প্রেমিক ভক্ত, বাবাজী মহাশয়কে 'বাবা' বলিয়া ডাকিতেন। এই মহা-সংকীর্ত্তনের পর তিনিও বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণাশ্রিত হইলেন—এই-রূপ অনেকেই কৃপাময়ের কৃপা লাভ করিলেন। আমি আর কত বলিব।

মহাসংকীর্ত্তনের পরদিন অনেক লোক বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিয়াছেন, বাবাজী মহাশয়ের কি ইচ্ছা হইল, তিনি ভিক্ষায় বাহির হইলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে আছি, বাবাজী মহাশয় ও নবদ্বীপদাদা নাম ধরিলেন—"যদি চাও গোকুল-বৃন্দাবন, ভজ নিতাই গৌরাঙ্গচরণ" ইত্যাদি নাম করিতে করিতে সর্ব্বাগ্রে বাবাজী মহাশয় চরণে চরণ ছাঁদিয়া হাত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সে কি অপরূপ দৃশ্য! যে দেখিয়াছে সেই জানে, মুখে বলিয়া বুঝাইবার নয়, অনুভবের জিনিষ। সাতগাছিয়াবাসীর আজ ভাগ্যের সীমা নাই, তাঁহারা পূর্ব্বে কখনও এরূপ নৃত্য দেখেন নাই, আজ তাঁহাদের যে কি আনন্দের দিন তাহা বলিয়া বুঝাইবার নয়—যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই আজ মনে মনে বুঝিতেছেন। বাবাজী মহাশয় নৃত্য করিতে করিতে এত দ্রুত গতিতে চলিতেছেন যে আমরা দৌড়াইয়া ধরিতে পারিতেছি না। গ্রামবাসী বাবাজী মহাশয়ের স্কন্ধে ঝুলি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবাজী মহাশয়ের আজ কাঁধে ঝুলি কেন?" কেহ

বলিলেন—"ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন" এই কথা শুনিবামাত্র নারীগণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন—কি দিবেন কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া যাহার ঘরে যাহা ছিল ছুটিয়া বাবাজী মহাশয়কে ভিক্ষা দিবেন বলিয়া লইয়া আসিতে লাগিলেন। এক মুষ্টি ঝুলিতে দিবামাত্রই বাবাজী মহাশয় অমনি নৃত্য করিতে করিতে অপর বাড়ীতে চলিলেন। ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে বাবাজী মহাশয়ের সে নৃত্য যে দেখিয়াছে সেই আত্মহারা হইয়াছে, সেই তাঁহার সঙ্গে ছুটিয়া আসিয়াছে। বাবাজী মহাশয় ভিক্ষা করতঃ ফিরিয়া ঝুলি মদনগোপালের দরজায় রাখিলেন—এদিকে যাঁহারা ভিক্ষা দিবেন বলিয়া যে সমস্ত জিনিষ বাহির করিয়াছিলেন, এক মুষ্টি বাবাজী মহাশয়ের ঝুলিতে দিয়াছিলেন মাত্র—অবশিষ্ট আনিয়া মদন-গোপলের নাটমন্দিরে রাখিতে লাগিলেন। তখন আমার ছোটদাদা বিপিন গোস্বামীর মদনগোপালের সেবার পালা পড়িয়াছে। বাবাজী মহাশয় মাকে বলিলেন—"সুশীলাদিদি! আজ তোমাকে এই ভিক্ষার দ্রব্য খিচুড়ি রসুই করিতে হইবে।" ঐ কথা শুনিবামাত্র মার মনে মনে খুব আনন্দও হইয়াছে, আবার ভয়ও হইতেছে, কেমন করিয়া অত লোকের রান্না করিবেন—সে বয়সে অত লোকের রান্না করা অসম্ভব। বাবাজী মহাশয় বুঝিতে পারিয়া মাকে বলিলেন—"সুশীলাদিদি! ভয় কি? তোমরা ব্রাহ্মণের মেয়ে, এ সব ত তোমাদেরই কাজ, দাও রসুই চাপাইয়া দাও।" বাবাজী মহাশয়ের মুখে এই সব কথা শুনিবামাত্রই মায়ের মনে একটা শক্তির সঞ্চার হইল, মা অনায়াসে রান্না শেষ করিয়া ফেলিলেন, ভোগ রাগ অন্তে প্রায় দুইশত আড়াই শত লোকে প্রসাদ পাইতে বসিলেন।

আজ সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা। বিপিনদাদা পরিবেশন করিতেছেন, সকলেই যেন অমৃত আস্বাদন করিতেছেন, খিচুড়ি চাহিয়া লইতেছেন। বাস্তবিকই ঐরূপ খিচুড়ি পূর্ব্বে আর কেহ কখনও আস্বাদন

করিয়াছেন কি না সন্দেহ। ভিক্ষায় যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাই রসুই হইয়াছে, উপযুক্ত পরিমাণ মসলা কিংবা একটু ঘৃতও দেওয়া হয় নাই, অথচ ঐরূপ আস্বাদন! সকলেই অবাক হইয়া গেলেন। ভোজনান্তে বাবাজী মহাশয় মাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন—"সুশীলাদিদির হাত সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়াই উচিত।" মা বলিলেন—"আমাকে অত বাড়াইবার মত গুণ কিছুই নাই। এতে কেবল আপনার গুণই প্রকাশ পাইতেছে, আমার কি সাধ্য যে এত লোকের রসুই করি, আপনি আমাকে দিয়া করাইয়া লইলেন তাই আমি করিয়াছি।" মাত্র এক মাসে যে এরূপ কত লীলা করিয়াছেন, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। একমাস পরে বাবাজী মহাশয় পুরীধামে রওনা হইলেন। বাবাজী মহাশয় রওনা হওয়ার কিছুদিন পরে দাদামহাশয় পরলোক গমন করিলেন। দুই মাস পরে বাবাও পরলোক গমন করিলেন, এই কথা বাবাজী মহাশয়ের কর্ণগোচর হইল। এক বৎসর পরে দিদিমাও আমাদের শোকসাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গেলেন। মা একেবারে শোকে অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন, কেবল তাঁহার ভাবনা হইতেছে যে এই নাবালক দুইটিকে কি করিয়া মানুষ করিব! স্বামী এবং পিতা মাতার বিয়োগে মা শোকে এতই জর্জ্জরিত হইয়াছেন যে ক্রমশঃ খাওয়া দাওয়া পর্য্যন্ত ত্যাগ করিলেন। মায়ের মামা গৌর গোস্বামী ও বিপিন গোস্বামী মাকে অনেক বুঝাইতেন, তাঁহাদের কথায় মা জীবনধারণোপযোগী কিছু আহার করিতেন মাত্র। আমি শৈশবেই পিতৃহীন হইয়াছি এই কথা বাবাজী মহাশয়ের কর্ণগোচর হইমাত্র তিনি নবদ্বীপদাদাকে আমাদের খবর লইবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

কিছুদিন পরে বাবাজী মহাশয় সাতগাছিয়ায় আসিয়াই আমাদের দেখিতে আসিলেন। বাবাজী মহাশয়কে দেখিয়াই মা ও আমি কাঁদিয়া

উঠিলাম—আমাকে কোলে তুলিয়া লইলেন ; তাঁহার বুকে উঠিয়া আমার কান্না আরও বাড়িয়া গেল, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। বাবাজী মহাশয় আমাকে কোলে করিয়া পিঠ চাপড়াইতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন—"ভয় কি বাবা ! আমি তোমার আছি।" মাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"ভয় কি আমি আছি, শোকে অধৈর্য্য হইয়া এমন সুন্দর দেহটাকে একেবারে মাটি করিয়াছ ! নাবালক মানুষ করিবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছ কেন ? দুর্ল্লভ মানব জীবন, ভজন কর, আমি কাঁধে ঝুলি করিয়া খাওয়াইব, কে কাকে খেতে দেয়, ভগবানই জীবের জীবন, তিনিই পালনকর্ত্তা। অনিত্য সংসার, কেহই কাহারও সঙ্গে যাইতে পারে না। তবে বৃথা শোক করিয়া এমন সুন্দর কৃষ্ণভজনের দেহটাকে কেন মাটি করিতেছ, নাম কর, ত্রিতাপ জ্বালা দুর হইয়া যাইবে।" বাবাজী মহাশয়কে পাইয়া আমাদের মনে সাহস হইল, শোক তাপ যেন কোথায় পলাইয়া গেল। যে সেই ভালবাসার মূর্ত্তিখানি দেখিয়াছে, সেই জানে, মুখে বলিয়া বোঝান যায় না। যে একবার তাঁহার সেই মধুমাখা কথা শুনিয়াছে, তাহার কর্ণ এখনও সেই মধুর ঝঙ্কার শুনিবার জন্য সর্ব্বদাই উদ্‌বিগ্ন হইয়া আছে। যে শুনিয়াছে সেই গলিয়াছে, এমন হৃদয়কর্ণ-রসায়ন কথা হয় নাই আর হবার নয় ; মানুষ ত দূরের কথা—সে কথা শুনিলে পাষাণও গলিয়া যায়। আমি অতি শৈশবে পিতৃহীন হইলেও পিতৃস্নেহ হইতে বাবাজী মহাশয় আমাকে বঞ্চিত করেন নাই। আমাকে এতই ভালবাসিতেন যে কোন জিনিষ ভাল লাগিলে খাইতে খাইতে আমার মুখে তুলিয়া দিতেন, তাঁহার স্নেহযত্নে আমি যে পিতৃহীন এটা জানিতেই পারি নাই। আমার আব্‌দার অভিযোগ সবই তিনি পিতৃবৎ সহ্য করিতেন। আমার অভিমান হইলেও তাঁহার উপরেই অভিমান করিতাম, রাগ হইলেও তাঁহার উপরই রাগ করিতাম। তিনি আমার

একমাত্র উপাস্য দেবতা। আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, আমি বাবাজী মহাশয়কে ছাড়া আর অন্য দেবতা জানি না। আমাদের উপর তাঁহার এতই করুণা ছিল, যখনই সাতগাছিয়ায় আসিতেন, পৌঁছিবামাত্রই অগ্রে আমাদের খবর দিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিতেন।

আমাদের সান্ত্বনা দিয়া বাবাজী মহাশয় কুঞ্জলাল গোস্বামীর বাড়ীতে গেলেন। বৈকালে একজন লোক আসিয়া খবর দিলেন যে ভগবতী মুখোপাধ্যায় মারা গিয়াছেন। সকলেই হায় হায় করিতে লাগিলেন। তিনি গ্রামের একজন মাথা ছিলেন। বাবাজী মহাশয় তখন আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া আছেন, হঠাৎ মুখ হইতে চাদর খুলিয়া কুঞ্জমামাকে ডাকিলেন। কুঞ্জমামা আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়াছেন, ইঁনি বলিলেন—"কুঞ্জ, আজ তোমাদের দেশের একজন মুরব্বি মারা গেলেন?" কুঞ্জমামা বলিলেন—"আজ্ঞে হাঁ।" তখন ইঁনি তাঁহার জন্য বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে বাবাজী মহাশয় ৺পুরীধাম হইতে রওনা হইয়া নবদ্বীপে আসিবেন স্থির করিয়াছেন। আমি তখন ম্যালেরিয়া জ্বরে একবৎসর ভুগিয়া অস্থিচর্ম্মসার হইয়া গিয়াছি। কাল্নায় মিসনারী হাঁসপাতালের সাহেব ডাক্তার বলিলেন—"আর ঔষধ খাইয়া কিছু হইবে না, অতিরিক্ত ঔষধ খাওয়ান হইয়াছে, এখন জীবন মরণ ভগবানের হাত। আমাদের চিকিৎসায় আর কিছু হবে না।" মা ডাক্তার সাহেবের মুখে ঐ কথা শুনিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। জ্বর কিছুতেই ছাড়ে না—ক্রমে উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইবার ক্ষমতাও গেল, একেবারে অন্তিমকাল উপস্থিত, একদিন রাত্রে প্রাণ যায় যায় হইয়াছে, সেইদিন বাবাজী মহাশয় কলিকাতা হইতে ষ্টীমারে রওনা হইয়া কাল্না দিয়া নবদ্বীপ যাইবেন স্থির করিয়াছেন। সঙ্গে রঘুনন্দন গোস্বামী আছেন। ঘটনাক্রমে গৌর নগরের চড়ায় ষ্টীমার বাধিয়া যে সময়ে কালনায় পৌঁছিবার কথা, তাহার প্রায়

তিন চারঘণ্টা দেরী হইয়া গেল, কাজেই বাবাজী মহাশয়ের কি ইচ্ছা হইল—একবার সাতগাছিয়া হইয়া যাই। ষ্টীমার গুপ্তিপাড়ার ঘাটে লাগিলেই বাবাজী মহাশয় রঘুনন্দন গোস্বামী এবং অন্যান্য সঙ্গিগণ সহ গুপ্তিপাড়ায় নামিলেন। ঘটনাক্রমে ষ্টীমারঘাটের নিকটেই কুঞ্জ মামা ও বিপিনদাদা উভয়ের সহিত বাবাজীমহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়। উঁহারা বাবাজী মহাশয়কে সাতগাছিয়া লইয়া আসিলেন। কুঞ্জমামার বাড়ীতেই থাকার ব্যবস্থা হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আমি পিতৃহীন বলিয়া বরাবরই আমার উপর বাবাজীমহাশয়ের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সাতগাছিয়ায় আসিলে আগেই আমাদের খবর নিতেন এবং লোক পাঠাইয়া দিতেন: দয়ার সাগর, পতিতের বন্ধু, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, বাবাজী মহাশয় ষ্টীমারঘাটেই হরি জেলেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"বাবা! বলতে পার পঞ্চু কেমন আছে? শুনিলাম তার নাকি ভারি অসুখ?" হরি জেলে বলিলেন—"বাবা! সে অনেকদিন থেকে ভুগিতেছে—বাঁচে কিনা সন্দেহ।" তখন ইনি হরি জেলের স্ত্রীকে বলিলেন—"মা! তুমি পঞ্চুদের বাড়ীতে খবর দাও যে আমি এসেছি।"হরি জেলের স্ত্রী আমাদের বাড়ীতে আসিয়া বলিলেন, "মা! বাবাজী মহাশয় এসেছেন, তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন।" আমার কাছেই মা বসিয়া আছেন, আমার শরীর তখন অত্যন্ত খারাপ, প্রাণ যায় যায় হইয়াছে। বাবাজী মহাশয় আসিয়াছে শুনিবামাত্রই যেন হৃদয়ে বল আসিল। আমাদের বাড়ী থেকে কুঞ্জ মামার বাড়ী বেশী দূর নয়, আমাকে মা কোলে করিয়া লইয়া গেলেন। বাবাজী মহাশয় কুঞ্জমামা ও রঘুনন্দন গোস্বামীর সহিত বসিয়া কথা কহিতেছেন এমন সময় মা আমাকে কোল থেকে নামাইয়া দিয়াছেন। আমি আস্তে আস্তে উঠিয়া বাবাজীমহাশয়ের কাছে যাইব বলিয়া দাঁড়াইয়া আছি, শীতকাল বলিয়া দরজা বন্ধ আছে, আমি দরজায় হাত দিবামাত্রই, বাবাজীমহাশয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া আমাকে

কোলে তুলিয়া লইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—“বাবা! কেমন আছ? ভয় কি আমি আছি।” আমি বলিলাম—“আমার শরীর ভাল নাই, আজ একবৎসর ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া প্রাণ যায় যায় হইয়াছে।” বাবাজী মহাশয় বলিলেন, “ভয় কি সেরে যাবে, আমি পুরীতে লইয়া যাইব, হাওয়া পরিবর্ত্তন করিলেই সারিয়া যাইবে।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“হঠাৎ রাত্রে কোথা থেকে এলেন।” বাবাজী মহাশয় বলিলেন—“তোমার অসুখ শুনিলাম। তাই দেখতে এলাম। তাহা না হইলে আজ ভোরে নবদ্বীপ যাইতাম।” আমি মনে করিতে লাগিলাম—“একেই বলে **অযাচিত কৃপা**; আমার মত অধমের প্রতি তাঁহার এত কৃপা! যদি কেহ পতিতের প্রতি অযাচিত কৃপার প্রমান লইতে চান তবে আমিই তার একমাত্র দৃষ্টান্তস্থল। ইহাতেই বেশ বুঝিতে পারিবেন যে আমার ন্যায় সামান্য একটা বালকের জীবনের প্রতি তাঁহার কতদূর লক্ষ্য। আমাকে বাঁচাইবার জন্য পরম করুণ বাবাজী মহাশয় আজ নবদ্বীপ যাওয়া স্থগিত রাখিয়া সাতগাছিয়ায় আসিলেন। তাঁহার দয়ার কথা আমার ন্যায় সামান্য জীব কি বলিবে? সে কথা প্রকাশ করিয়া বলা অসম্ভব। যিনি ব্যথার ব্যথী তিনি ভিন্ন আর কাহারও সাধ্য নাই যে সে কথা বুঝাইয়া দেয়, মুখ ফুটিয়া বলিবার নয়। যিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার ভালবাসা পাইয়াছেন তিনি মনে মনে অনুভব করিয়াছেন, ইঁহার ভালবাসা কেমন। আমরা ভালবাসিতে জানি না; কিন্তু ভালবাসা কাহাকে বলে তাহা অনুভব করিয়াছি। এরূপ সর্ব্বজীবের উপর সমান দয়া এ পর্য্যন্ত দেখি নাই, আর দেখিব বলিয়া মনে হয় না।

আমাকে জীবন দিয়া বাবাজী মহাশয় শ্রীধাম নবদ্বীপ রওনা হইলেন। এই সাতগাছিয়াবাসীর শেষ দর্শন। যাইবার সময় আমাকে ও মাকে

বলিয়া গেলেন—"আমি এসে পুরী নিয়ে যাব, হাওয়া পরিবর্ত্তন করিলেই সমস্ত সেরে যাবে।" আমাদের ভুলাইবার জন্য বাবাজীমহাশয় ঐরূপ স্তোভ বাক্য প্রয়োগ করিলেন। আমরাও মনে করিলাম তবে পুরীতেই যাইতে হইবে। তিনি না বুঝাইলে কে তাঁহাকে বুঝিতে পারে? বাবাজী মহাশয় বলিয়া যাওয়ার পর ক্রমশই আমার শরীর ভাল হইতে লাগিল। মা মনে করিলেন—বাবাজীমহাশয় যখন বলিয়া গিয়াছেন তখন পুরী লইয়া যাইতে হইবে। মা আমাকে লইয়া পুরী রওনা হইলেন। সেখানে ঝাঁজপিটা মঠে আমি থাকিতাম। ললিতা মা আমাকে প্রত্যহই কালাকৃষ্ণদাসের সঙ্গে সমুদ্রে পাঠাইয়া দিতেন। ললিতা মা আদেশ করিলেন—"প্রত্যহ এক অঞ্জলি সমুদ্রের জল খাইবে।" তাঁহার আদেশমত তাহাই করিতে লাগিলাম। কিছুদিনের মধ্যে হল্‌দে চেহারা গিয়া একেবারে কাল হইয়া গেল। প্রায় দুইমাস পরে নবদ্বীপে আসিবার জন্য মনটা বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল, আমি ও মা নবদ্বীপে চলিয়া আসিলাম। নবদ্বীপে পৌছিয়াই প্রথমে বাবাজী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তখন ইঁনি জিজ্ঞাস করিলেন, "বন্দে মাতরম্ ;" আমি বলিলাম—"আজ্ঞে হাঁ।" বাবাজী মহাশয় তখন বড়াল ঘাটের উপর তাঁহার গুরুদেবের আশ্রমেই থাকিতেন। বাবাজী মহাশয় শুইয়া ছিলেন, উঠিয়া বলিলেন—"গোবিন্দ! এদের প্রসাদের ব্যবস্থা করিয়া দাও।' রামদাদাকে বলিলেন—"ওদের কি জিনিস পত্র আছে কাহাকেও দিয়া আনাইবার ব্যবস্থা কর।" আমাদের একটা ঘর ঠিক করিয়া দিলেন। সেই ঘরেই আছি। কিছুদিন পরে বাবাজী মহাশয় নসীবাবুর বৈঠকখানা খরিদ করিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর উৎসবের দিন সেই বৈঠকখানা বাড়ীতে ঠাকুর লইয়া গেলেন (যে ঠাকুর সাতগাছিয়া হইতে আনা হইয়াছিল)। সেদিন মহাসঙ্কীর্ত্তন হইল। বাবাজী মহাশয় কোন কার্য্য করিলেই গোপাল ঘটককে

ডাকিতেন। ঘটক কাকাকে বলিয়া দিলেন—"পঙ্কুকে সেবার কাজ শিখাইয়া দিও।" মালসা ভোগের সময় ঘটক কাকা আমাকেও সঙ্গে লইলেন।

মালসা ভোগ সাজান হইতেছে এমন সময় বাবাজী মহাশয় আসিয়া আমাকে বলিলেন—"বাবা পঙ্কু! তুমি প্রভুদের আসন সাজাও।" আমি তাঁহার মুখপানে চাহিয়া বলিলাম, "আমি ত জানি না, আপনি শিখাইয়া দিন।" বাবাজী মহাশয় আমাকে আদেশ করিলেন—"প্রত্যেক আসনে একখানি বৃন্দাবনী কাপড় ও চাদর দাও, একগাছি মালা চন্দন মাখাইয়া দাও, একটী পৈতা দাও, একটী পান ও সুপারী আর পয়সা দিয়া সাজাও দেখি।" তাঁহার আদেশ পাইয়া আমার কোথা হইতে শক্তি আসিল! যেন বিজ্ঞ, পরিপক্ক লোকের মত সাজাইতে লাগিলাম। ঘটক কাকা, কুঞ্জমামা ও আর আর সকলে বলিলেন—"ঠিক হইয়াছে।" আমি তখন ছেলেমানুষ, সবে মাত্র পৈতা হইয়াছে। আমার সাধ্য যে সেবার কাজ করি? তবে মহাপুরুষের কৃপায় কি না হয়? পঙ্গুও অনায়াসে পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে পারে। তাঁহার অপার করুণার কথা—আমি ক্ষুদ্রজীব, একমুখে কি বলিব! যিনি তাঁহার কৃপা কণামাত্রও পাইয়াছেন, তিনিই মনে মনে বুঝিতেছেন। সেকথা লেখা ত দূরের কথা—প্রকাশ করিয়া বলিবারও ক্ষমতা কাহারও নাই। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর উৎসবের পরদিন প্রাতে বাবাজী মহাশয় বড়াল ঘাটের বাড়ীতে তাঁহার গুরুদেব শ্রীশ্রীগৌরহরিদাস বাবাজী মহাশয়ের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন, পরে বাগান বাড়ীতে আসিয়া বসিলেন। বাগান বাড়ীতে কিছুক্ষণ বসিতে বসিতেই বাড়ী লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। বাবাজী মহাশয় সেইদিন কল্পতরু হইয়াছেন—বাঞ্ছাকল্পতরু নিতাইয়ের কাছে যে যাহা চায়, সেই তাহা পায়—আমার বাবাজী মহাশয়ও ঠিক তাই। কেহ আসিয়া বলিতে

লাগিলেন—আমার উনবস্ত্র নাই, কেহ কাপড়, কেহ বহির্ব্বাস, কেহ বলিতে লাগিল—প্রভু আমাকে দয়া কর, এইরূপ যে যাহা চাহিতে লাগিল বাবাজী মহাশয়ও তাই দিতে আরম্ভ করিলেন। সীতারামকে বলিলেন—"শিঙ্গা বাজাও" আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"বাবা! সীতা-রামকে বৃন্দাবনী কাপড় দাও।" সীতারাম কাপড় চাদর পরিয়া খুব ফুর্ত্তিতে শিঙ্গা বাজাইতে লাগিলেন, আর লোক যেন কোথা হইতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সেদিন যে যাহা বাঞ্ছা করিয়া আসিয়াছেন তাহাই পাইলেন। কাপড় বিতরণের ভার আমাকে দিলন। আমার কাছে যে চায় তাকেই দিই। আবার ঘরের ভিতর গিয়া দেখি যেমন কাপড় তেমনি রহিয়াছে, কাপড় যেন ফুরায় না। এরূপ কখনও দেখি নাই, তাই অবাক হইয়া দৌড়িয়া গিয়া আর কাকে জিজ্ঞাসা করিব? একেবারে বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন—"নিতাইয়ের ভাণ্ডারে কি অভাব হয়? নিতাই আমার অখণ্ড প্রেমের খনি, কলসে কলসে বিতরণ করিলেও ফুরায় না। দাও বাবা! দাও, নিতাইয়ের ভাণ্ডারে কিছুই অভাব নাই।" এই সময় বাবাজী মহাশয় নবদ্বীপের হরিসভায় ভেট উঠাইয়া দিয়া মহাপ্রভুর সেবার বন্দোবস্ত করিলেন। শিতিকণ্ঠ কাকা বলিলেন—"মহাপ্রভুর সেবা কে করিবে? বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"এই বাচ্চাকে দিলাম।" আমাকে বলিলেন —"পঞ্চু! বাবা! তুমি আজ থেকে মহাপ্রভুকে তুলসী চন্দন দিবে।"

বাবাজী মহাশয়ের আদেশ পাইয়া প্রত্যহ তুলসী তুলিতাম, আর চন্দন ঘসিয়া দিতাম, শিতিকণ্ঠ কাকা আমাকে পূজা শিখাইতে লাগিলেন। শিতিকণ্ঠ কাকা গৌরের প্রসাদ প্রত্যহ বাবাজী মহাশয়ের জন্য আমাকে দিয়া পাঠাইতেন। আমাকে মাথায় করিয়া প্রসাদ আনিতে দেখিয়া বাবাজী মহাশয় আনন্দলাভ করিতেন।

একদিন বাবাজী মহাশয় বাগানবাড়ীর বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, আমি কাছে গিয়াছি, তখন শ্রীধর অঙ্গনের শশী অধিকারী আসিয়া বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন। বাবাজী মহাশয় আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—"যাও ত বাবা! শ্রীধর অঙ্গনের মায়ের কাছ থেকে একটু তেল নিয়ে এসো তো?" শশী অধিকারীকে বলিলেন—"যাও দাদা! পঞ্চুকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও।" আমি যাইয়া তেল লইয়া আসিলাম। বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"বাবা! মাথাটায় বেশ করিয়া মাখাও ত দেখি!" আমি তাঁহার আদেশমত তেল মাখাইতেছি, এমন সময় শ্রীখণ্ডের একজন ঠাকুর-সন্তান বাবাজী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। আমাকে বাবাজী মহাশয়ের মাথায় তৈল মৰ্দ্দন করিতে দেখিয়া বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই ছেলেটী কোথায় পেলেন?" বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"এটী আমারই ছেলে। আমার ইচ্ছা আছে একে বিবাহ দিব।" যেমন বাবাজী মহাশয় বিবাহের কথা বলিয়াছেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া বলিয়া উঠিলাম—'না, আমি বিয়ে করবো না।' বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"না বিয়ে করবে না। কেন, বিয়ে করলে কি ধৰ্ম্ম হয় না? যার হয় তার সংসারে থাকিয়াই সব হয়। তোদের আবার ভজন সাধন কি?" তারপর গোঁসাইজীকে বলিলেন—"ওরা খুব ভাল কুলীন উচ্চবংশ, আমার ইচ্ছা আছে এইখানে বাড়ী করে দিব, বিবাহ দিব।" গোঁসাইজী বলিলেন—"বেশ ভাল ভাল।" বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"আমি ছেলেটিকে বড় ভালবাসি, আমার কাছেই রাখিব।" তাঁহার কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার কথা।

উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে
বিকসতি যদি পদ্মং পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে।

প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নি-
র্ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ ॥

কাহার সাধ্য যে সে কথা খণ্ডন করে; অদ্য বাব্দশতান্তে বা—আজ কিংবা শত বৎসর পরেও হইবে। আমরা অভিমানী স্বতন্তরী বলিয়াই তাঁহার বাক্যের মূল্য বুঝি না, আত্মাভিমানেই সর্ব্বদা গর গর, কি করিয়া অনুভব করিব? সে ভালবাসা আমাদের নাই, প্রকৃত মানুষ হইলে থাকিত, বুঝিতাম, অনুভব করিতাম। আমার সংসার, আমাদের নবদ্বীপ বাস করা সমস্তই আশ্চর্য্য ব্যাপার। তিনি আমাদের কেশে ধরিয়া তুলিয়া আনিয়া রাতুলচরণে আশ্রয় দিয়েছেন, তাহা না হইলে আমাদের কি সাধ্য যে নবদ্বীপধামে বাস করি, কত রাজা মহারাজা শ্রীধামে বাস করিবার ইচ্ছা করেন; কিন্তু বাস করিতে পারেন না। মহাপ্রভুর কৃপা না হইলে কেমন করিয়া ধামে বাস হইবে। আমরা পতিত অধম, আমাদের পক্ষে তাঁহার কৃপালাভের আশা বামন হইয়া প্রাংশুলভ্য ফল চাওয়ার মত। একমাত্র পরম করুণ, পতিতপাবন অবতার, অযাচিত কৃপাকারী, পতিতের বন্ধু, শ্রীরাধারমণ আমাদের ভরসা। তিনি ভিন্ন কে আমাদের পতিত বলিয়া কৃপা করিবে? তাঁহাকে ব্যতীত আর কাহাকেও জানি না, পতিত খুঁজিয়া খুঁজিয়া কৃপা করাই যে তাঁহার স্বভাব। এই অধম পতিতদের কৃপা করিয়া নবদ্বীপে রাখিয়াছেন। তিনি আমাকে কাছে রাখিতে বড়ই ভালবাসিতেন, তাই তিনিই রাখিয়াছেন, তাহা না হইলে আমাদের কি সাধ্য যে ধামে বাস করি!

ঐ বৎসর ধূলট উৎসবের সময় হইতেই খুব বৃষ্টি হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে খুব কলেরা আরম্ভ হইল। বড়ালের বাড়ীতে আমরা থাকিতাম। সেখানে হঠাৎ নীলমণিদাসের কলেরা হইল। তাহাতে তিনি গৌরগঙ্গা প্রাপ্ত হইলেন। তাহার পর আবার রাধানাথের মায়ের কলেরা

হইল। বড়ালের বাড়ীতে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা মনে মনে বড়ই ভয় পাইলেন। বাবাজী মহাশয় সকলকেই আপন আপন দেশে যাইতে আদেশ করিলেন। আমাকে বাগানবাড়ীতে থাকিতে আদেশ করিলেন। মাকে দেশে যাইতে বলিলেন। মা বলিলেন—আমি প্রায় তিনমাস অতীত হইল রোগা ছেলে লইয়া দেশ ছেড়ে আসিয়াছি, এখন একলা গেলে লোকে কি বলিবে? সুতরাং পঞ্চু কয়েকদিনের জন্য আমার সঙ্গে চলুক, আমাকে রাখিয়া আবার আসিবে।" বাবাজী মহাশয় আমাকে কিছুতেই যাইতে দিবেন না, শেষে মায়ের উপর রাগ করিয়া বলিলেন, "তোর ছেলে আমার ছেলে নয়, আচ্ছা যা নিয়ে যা।" আমি যাইবার জন্য আদেশ আনিতে গেলে আমাকে বুকে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, বলিলেন— "আমাকে ফেলে যাচ্ছিস, যা, আর দেখা হবে না।" তখন কে জানে যে বাবাজী মহাশয়কে আর দেখিতে পাইব না। মাকে রাখিয়া নবদ্বীপে আসিবার জন্য রওনা হইলাম বটে; কিন্তু মন যেন আর এগোয় না, যে দিকে চাই যেন একটা অমঙ্গলের চিহ্ন দেখি। পৃথিবীতে যেন লোক নাই, নির্জ্জীব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। চারিদিক যেন শূন্যময়, প্রাণ যেন কাতর হইয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। কানের ভিতর যেন করুণ ক্রন্দনের ধ্বনি আসিয়া প্রাণ উতলা করিয়া ফেলিল। রাস্তায় চলিতেছি বটে, যেন লক্ষ্যহীন পাগলের মত। কাল্নায় আসিয়া নবদ্বীপের ষ্টীমারে উঠিলাম। কলেরায় অসংখ্য লোক মারা গিয়েছে। তাহাদের মৃতদেহ রাস্তার উপর এমন ভাবে পড়িয়া আছে, ষ্টিমারে উঠিতে হইলে মাড়াইয়া উঠিতে হয়। অতিকষ্টে নানা অমঙ্গলের মধ্যদিয়ে নবদ্বীপে পৌছিলাম। ষ্টীমার হইতে নামিয়া আর পা চলে না, অতি কষ্টে ভগ্ন প্রাণে বাগানবাড়ীতে পৌছিবা-মাত্রেই দেখি—ললিতা মা বিষণ্ণ মনে বসিয়া আছেন। দেখিয়াই একে-বারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। আমাকে বলিয়াছিলেন 'আর দেখা হবে না'

আমার পোড়া বরাতে তাহাই ঘটিল। শুধু যে আমাকে বলিয়াছিলেন তাহা নহে, এরূপ ইঙ্গিতে অনেককেই বলিয়াছিলেন। তিনি না বুঝাইলে কে বুঝিবে? কীর্ত্তনে বলিতেন—"এবারকার মত আমার ভজন হলো সারা, আমার সাধন হলো সারা।" অপরা মাষ্টারদাদাকে বলিলেন,—"নীলমণির খোলখানি কোথায় গেল? ছেলের জিনিষ বাপে অর্শায়।" মাষ্টারদাদা বলিলেন—"খোলখানি খারাপ হইয়া গিয়াছিল তাই তালা বদলাইতে হইবে।" উপস্থিত যেখানে সমাধি মন্দির, একখানি খাটিয়া পাতিয়া ঠিক ঐ জায়গায় বসিতেন, শুইতেন আর বলিতেন—"এই জায়গাটা আমার বড় ভাল লাগে।" এইরূপ অনেককেই বলিয়াছিলেন; কিন্তু কেহ কিছু বুঝিতে পারেন নাই, তিনি না বুঝাইলে কে বুঝিবে? আমার দুর্ভাগ্যের কথা আর কি বলিব? পিতৃহীন অনাথ বালক বলিয়া আমাকে অযাচিত ভাবে কৃপা করিয়াছিলেন; কিন্তু আজ সে ধনেও বঞ্চিত হইয়া মরা পশু পাখীর মত জীবন ধারণ করিতেছি। এমন মাতৃগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম তাই আজ ভক্তসঙ্গ পাইয়াছি। পতিতপাবন শ্রীরাধারমণের গণ। আপনাদের চরণে আমার আন্তরীক প্রার্থনা—যাঁহার পরশে আপনারা পরশমণি হইয়াছেন, সকলে আমায় এই কৃপা করুন, যেন সেই পরশমণি স্মরণ করিতে করিতে আমার ভবলীলা সাঙ্গ হয়। শীতল বলিয়াই ও রাঙ্গা পায়ে এ অধম আজ আপনাদের শরণাগত হইয়া এই ভিক্ষা করিতেছে। আশা করি আমার শ্রীরাধারমণের গণ আমাকে বঞ্চিত করিবেন না। ইতি—

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাওয়া যাইবে

১। চরিত-সুধা ... ছয় খণ্ড ৭২'০০

২। চরিত-মাধুরী ... ১ম খণ্ড ৮'০০ ২য় খণ্ড (যন্ত্রস্থ), ৩য় খণ্ড ১২'০০, ৪র্থ খণ্ড (যন্ত্রস্থ)

৩। শ্রীগুরু কৃপার দান...১ম খণ্ড ৫০'০০, ২য় খণ্ড ৫০'০০, ৩য় খণ্ড (যন্ত্রস্থ)

৪। সাধক কণ্ঠমালা বোর্ড বাঁধাই ১৫'০০, কাগজ বাঁধাই ১২'০০

৫। প্রেম-সহচরী ... কাগজ বাঁধাই ১০'০০

৬। গৌরাঙ্গ চম্পু পূর্ব্বার্দ্ধ ১৫'০০, শেষার্দ্ধ ১৫'০০

৭। শ্রীমতী ললিতা সখীর জীবন চরিত ... ১ম খণ্ড (যন্ত্রস্থ)

ঐ ... ২য় খণ্ড ৫'০০

৮। শ্রী বিদগ্ধ মাধব নাটকম্ ... ২৫'০০

৯। শ্রীগুরু কথা প্রসঙ্গ ... ১ম খণ্ড ১০'০০

ঐ ... ২য় খণ্ড ১৫'০০

১০। শ্রীপাদের স্মরণিকা ... ১৫'০০

১১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাঁচশত বর্ষ পূর্ত্তি স্মরণিকা ১২'০০

১২। শ্রীশ্রী হরিভক্তি বিলাস ১ম খণ্ড ৪০'০০

ঐ ২য় খণ্ড ৪৫'০০

১৩। শ্রীভাগবতাচার্য্য লীলা প্রসঙ্গ ৫'০০

১৪। দ্বাদশ ভাষণ ১০'০০

১৫। গোপীগীতের পূর্ব্বকথা ও গোপীগীত ১২'০০

১৬। নাম মহিমা ও ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবান ৫'০০

১৭। দাম বন্ধন ও অঘাসুর বধ ৫'০০

১৮। পরমার্থ কথা ১০'০০

১৯। ভাগবত-তত্ত্ব-তরঙ্গিনী (উড়িয়া) তিন খণ্ড ৪৫'০০

২০। Life of love ... বাঁধাই ১০'০০

২১। ঐ অবাঁধাই ৮'০০

২২। ছয় গোস্বামী ও বাবাজী মহারাজ ৩'০০

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

১। শ্রীশ্রী রাধারমণ বাগ, সমাজবাড়ী, নবদ্বীপ, নদীয়া।

২। শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম, বরাহনগর, কলিকাতা-৭০০০৩৫